প্রাকৃতিক কৃষির দর্শন

৩

প্রাকৃতিক কৃষির দর্শন

ভরত মনসাতা

ভাষান্তর : তপন পুরকায়স্থ

প্রাকৃতিক কৃষির দর্শন

ভরত মনসাতা

ভাষান্তর : তপন পুরকায়স্থ

আর্থকেয়ার বুকস

PRAKRITIK KRISHIR DARSHAN
BY BHARAT MANSATA
BENGALI TRANSLATION BY TAPAN PURKAYASTHA

প্রাকৃতিক কৃষির দর্শন
ভরত মনসাতা

ভাষান্তর : তপন পুরকায়স্থ

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ২০১৫

প্রকাশক
আর্থকেয়ার বুকস্
১০ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭১
দূরাভাষ : ৯১ ৩৩ ২২২৯৬৫৫১/২২২৭৬১৯০
Email : earthcarebooks@gmail.com
Wbesite :www.earthcarebooks.com

অক্ষর বিন্যাস : শ্রীমান চক্রবর্ত্তী ও জিতেন নন্দী

প্রচ্ছদ : আত্রেয়ী

মুদ্রক
প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

বিনিময় : ২০০ টাকা

উৎসর্গ

মনি বৌ, টিনা ও জয়দীপকে

মুখবন্ধ

বন্ধুবর ভরত মনসাতার বই The Vision of Natural Farming পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ভরতের সৃজনশীল মেধা ও নিরলস পরিশ্রমের ফসল এই বই। অপূর্ব তার লেখনী। বইটিতে গুজরাতের ভালসাদ জেলার উমেরগ্রাম শহরের কাছে দেহরি গ্রামের বর্ষীয়ান কৃষক শ্রী ভাস্কর সাভে—যিনি দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে জৈব তথা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কল্পবৃক্ষ নামে বিস্ময়কর এক বাগিচা খামার গড়ে তুলেছেন—যাকে ভারতের জৈব চাষের জীবন্ত গান্ধী বলে মনে করা হয়—যিনি জৈবচাষি ও আন্দোলনের বিশ্বজোড়া সংস্থা IFOAM দ্বারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জৈবচাষি বলে স্বীকৃত হয়েছেন—সেই তার বিপুল অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়েছে। ইতিমধ্যেই বইটির দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং বইটি সারা দেশ জুড়ে সাড়া ফেলেছে। (ইন্টারনেটেও তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।) কিন্তু বাংলায় এর কোনো ভাষান্তর হয়নি। দুই বাংলাসহ সাড়া পৃথিবী জুড়ে প্রায় ৩০ কোটি বাঙালি ও তাদের কোটি কোটি চাষিভাই (যাদের গড়পড়তা ৫ শতাংশের বেশি ইংরাজি জানেন না) তাদের অন্তত একটি ক্ষুদ্র অংশের কাছে তাদের নিজের ভাষায় যদি বইটি পৌঁছে দেওয়া যায় তাহলে তারা ও সমগ্র সমাজ উপকৃত হতে পারেন, এই ভাবনা থেকেই বইটি অনুবাদের প্রয়াস।

বইটির পটভূমি

চাষের ভয়ংকর ব্যয়বৃদ্ধিতে ও শস্যানাশে ঋণের দায়ে জড়িয়ে পড়ে ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত সারা দেশে ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৯৩৬ জন চাষি আত্মহত্যা করেছিলেন। অর্থাৎ প্রতি আধঘন্টায় ১ জন চাষি আত্মহত্যা করেছিলেন ।(সেই আত্মহত্যার মিছিল আজও অব্যাহত গতিতে চলেছে।) এতে ভীষণ ব্যথিত হয়ে ভাস্কর ভাই তদানীন্তন জাতীয় কৃষি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং যাকে এদেশের সবুজ বিপ্লবের পিতা বলে মনে করা হয় সেই এম.এস.স্বামীনাথনকে তিনটি খোলা চিঠি লিখেছিলেন এবং তার সাথে পরিশিষ্ট আকারে বেশ কিছু

নথি সংযুক্ত করেছিলেন। নথিসহ চিঠিগুলির কপি পাঠিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ও জাতীয় কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ারকে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-কেও তিনি একটি খোলা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। (লেখাগুলি ভাস্কর সাভের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে ইংরাজিতে লিখেছিলেন ভরত মনসাতা।) এগুলিই ছিল এই বইটি লেখার শুরু। এর আগে ও পরে ভরত প্রায় কুড়ি বছর ধরে বারংবার ভাস্কর সাভের খামার পরিদর্শন করেন। তার সাথে দীর্ঘ কথোপকথনের ও দেশ জুড়ে জৈব চাষ আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নির্যাস নিয়ে ভরত এই বইটি লিখেছেন।

কি আছে এই বইয়ে

বইটির ৮টি অধ্যায় ও পরিশিষ্ট জুড়ে রয়েছে তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের এক বিস্ফোরক সমালোচনা। আছে কিভাবে অহিংসা ও সহযোগীতার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক কৃষি সৃষ্টির সমগ্রতাকে লালন করে; কিভাবে এই দর্শনকে আত্মস্থ করে কৃষক সাধারণ বিষাক্ত, ধ্বংসাত্বক রাসায়নিক চাষের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে ও সারাদেশের জনসাধারণকে মুক্ত করতে পারেন এবং বিনা খরচে অথবা নূন্যতম খরচে বিষহীন, স্বাস্থ্যকর, পর্যাপ্ত ফসল ফলিয়ে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে সমৃদ্ধির পথে যেতে পারেন; কিভাবে খাদ্যসংকট, জলসংকট এবং ভূমিক্ষয় ও ভূ-উষ্ণায়ণের মত ভয়ংকর পারিবেশিক সমস্যাগুলির মোকাবিলা করা যায়; কোন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করলে এদেশের সমস্ত মানুষের বুনিয়াদী চাহিদাগুলি মেটানো সম্ভব এবং কীভাবে কয়েক দশকের মধ্যে ভারত আবার নিজেকে পৃথিবী জুড়ে সমৃদ্ধি ও শান্তির অগ্রদূত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ দিকনির্দেশ।

বিজ্ঞান বনাম লোকবিজ্ঞান

বইটির আর একটি লক্ষ্যনীয় দিক হলো (বিশেষজ্ঞ নির্ভর) বিজ্ঞানের সাথে ঐতিহ্যগত জ্ঞান বা লোকবিজ্ঞানের সংঘাত। ভাস্কর ভাইয়ের ওপর যে মানুষটার অপরিসীম প্রভাব ছিল সেই গান্ধী মনে করতেন যে বিজ্ঞান সমাজের ফসল। এই ফসলের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত সমাজের —কিছু বিশেষজ্ঞের নয়। লক্ষ কোটি মানুষের সমাজ এই নিয়ন্ত্রণ তাদের ওপর ছেড়ে দিলে সমাজকে ভুগতে হবে—যেমন হচ্ছে। কারণ বিশেষজ্ঞরা বন্দী মুদ্রারাক্ষসদের হাতে।

বিশেষজ্ঞ নির্ভর বিজ্ঞানের বিপরীতে দৈনন্দিন জীবনে হাজার সমস্যা মোকাবিলায় শত সহস্র বছর ধরে লক্ষ কোটি ভারতীয় চাষী রেখে গেছেন তিল তিল করে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার বিপুল ভান্ডার। দেশজ সেই ঐতিহ্যশালী লোকবিজ্ঞানের ধারাকে সংহত করে ভাস্কর ভাই প্রবলভাবে উত্থিত করেছেন;

পুনরুচ্চারণ করেছেন উপনিষদের সেই সমগ্রতার বাণী ওম পূর্ণমদাহ...পূর্ণ থেকে আবির্ভূত এই সৃষ্টি ... এর থেকে জাত প্রতিটি সৃষ্টিই পূর্ণ ... পূর্ণ থেকে নিয়ে নাও পূর্ণ, পূর্ণ পূর্ণই থেকে যায়...সব কিছুই চক্রাকারে ঘুরছে — অক্সিজেন, কার্বন, জল, পুষ্টি...সহযোগিতাই প্রকৃতির ধর্ম, বৈচিত্র্যই প্রকৃতির শ্বাস। জীব মরে গেলেই শেষ হয়ে যায় না, তাকে অন্য কেউ গ্রহণ করে...চলতে থাকে পুষ্টির চাকা...প্রাণের ধারা...প্রাণ অবিভাজ্য, অখন্ড, জ্ঞানও তাই।

প্রাকৃতিক কৃষি প্রাণের ও জ্ঞানের এই অখন্ডতা —এই সমগ্রতাকেই ধারন করে, লালন করে।

'খাওয়া একটি কৃষিকাজ'

প্রখ্যাত আমেরিকান অধ্যাপক, সাহিত্যিক ও চাষি ওয়েন্ডেল বেরী বলেন — `Eating is an agricultural act'-- 'খাওয়া একটি কৃষিকাজ'। কথাটি সত্য, কারণ খাওয়ার জন্যই কৃষির সমস্ত কর্মকান্ড। বাঁচতে গেলে সবাইকে খেতে হয়। তাই কৃষির সমস্যা শুধু কৃষকের নয়, সারা দেশ তথা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের। মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া পৃথিবীর প্রধান ও পবিত্রতম কাজ। আর তাই চাষই হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। 'চাষির ছেলে কি চাষা হবে'—এই তাচ্ছিল্য —এই মূঢ়তার অন্ধকার থেকে আমরা যতদিন না মুক্ত হচ্ছি ততদিন গণতন্ত্র, পার্লামেন্ট, আইনের শাসনের নামে যতই বাগাড়ম্বর চলুক না কেন আমাদের মুক্তি নেই। আমাদের স্বাধীনতা শুধুই এক কথার কথা হয়েই রয়ে যাবে। সেই স্ব–অধীনতা, সেই মুক্তির পথ প্রদর্শক এই বই।

শেষ করি জাপানের সাড়া জাগানো বৌদ্ধ চাষি ফুকুওকার একটি উক্তি স্মরণ করে। ফুকুওকা বলেন যে প্রাকৃতিক কৃষির চূড়ান্ত লক্ষ্য শুধুমাত্র ফসল ফলানো নয়, বরং মনুষ্যত্বের সাধনা। প্রাকৃতিক কৃষি মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠার প্রেরণা দেয়। এই বই তাই শুধুমাত্র কৃষকের জন্যই নয়, সর্বসাধারণের জন্য।

পাঠক সাধারণের কাছে আবেদন : বইটা পড়ুন। জীবনের মানে খুঁজে পাবেন। নতুন মানুষ হয়ে উঠবেন।

দুর্গাপুর,
৫ই জানুয়ারী, ২০১৫

তপন পুরকায়স্থ

দ্য ভিশন অফ ন্যাচারাল ফার্মিং–এর বাংলা অনুবাদের ওপর মূল লেখকের প্রাক্‌কথন

ভাস্কর সাভে যাকে ‘প্রাকৃতিক কৃষির গান্ধি’ বলে মনে করা হয় —২০১৫ সালের ২৭শে জানুয়ারীতে তার ৯৩ বছর পূর্ণ হবে। আমি আনন্দিত এই কারণে যে ওই দিনটিকে উদ্‌যাপন করার জন্য এই অসাধারণ অথচ অতি সাধারণ মানুষটি — যিনি ৩টি প্রজন্ম ধরে জৈবচাষীদের অনুপ্রাণিত করেছেন এবং শুধুমাত্র ভারতে নয় সারা পৃথিবী জুড়ে সমাদৃত হয়েছেন — সেই তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমার লেখা ‘দ্য ভিশন অফ ন্যাচারাল ফার্মিং’ বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে।

ইংরাজিতে লেখা মূল বইটির প্রথম প্রকাশ হয় ২০১৪ সালে এবং ইতিমধ্যে এর দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং তৃতীয় সংস্করণের প্রস্তুতি চলছে। অবশ্য ভাস্কর সাভের দীর্ঘদিনের আন্তরিক ইচ্ছা হল বইটি যাতে ভারতীয় চাষিদের কাছে তাদের নিজ নিজ ভাষায় পৌঁছে দেওয়া যায়। বেশ কিছু চাষি বইটি বাংলায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এই বইটি প্রচুর পরিশ্রম ও যত্নের সাথে ভাষান্তর করার জন্য আমি শ্রী তপন পুরকায়স্থকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি নিশ্চিত যে বইটি চাষিদের উপকারে লাগবে এবং অন্য যারা প্রকৃতির সাযুজ্যে কৃষিকে বুঝতে চান তারাও উপকৃত হবেন, কারণ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সাযুজ্যপূর্ণ কৃষি দিয়েই মানুষসহ পৃথিবীর সমস্ত জীবের স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যত সুরক্ষিত হতে পারে। কৃষির এইরকম টেঁকসই ও বাস্তুতান্ত্রিক পথই আমাদের বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এবং আমরা আর তাকে অবহেলা করতে পারি না।

ভারতের জাতীয় কৃষি কমিশনের মতে এদেশে রয়েছে ১০০০০ বছরের কৃষি কাজের ইতিহাস। তার মধ্যে ৯৯৫০ বছর ধরে ভারত রাসায়নিকের ব্যবহার না করেই এই গ্রহের অন্যতম সর্বোচ্চ জনঘনত্বের মানুষদের অন্ন সংস্থান করে এসেছে। কিন্তু গত প্রায় ৫০ বছর ধরে সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তি

বা রাসায়নিক ও যান্ত্রিকীকরণের দ্বারা (দু)এক রকমের চাষের (monoculture) শিল্পীয় (industrial) পথের বিপুল বিস্তার নানা সমস্যার পাপচক্রের জন্ম দিয়েছে। মাটি, জল ও জৈব বৈচিত্র্যের বিপুল অবনমন ও ক্ষয়, ক্রমবর্দ্ধমান যোগানের (inputs) চাহিদা ও চাষের খরচ বৃদ্ধি আজ চাষিদের শোচনীয় দূর্দশা ও ভোক্তাদের (consumers) জন্য বিষাক্ত খাবারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চার বছর ধরে ৬০টি দেশের ৪০০'র বেশি কৃষি বিশেষজ্ঞ ও ১০০০ জন বহু-বিষয়ক সমীক্ষকদের (multi-disciplinary reviewers) দ্বারা প্রস্তুত এবং ভারত সহ ৫৮টি দেশের ও খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), বিশ্বব্যাংক, UNDP, UNEP ইত্যাদিদের প্রতিনিধিদের দ্বারা স্বীকৃত বিশ্ব কৃষি রিপোর্ট (বা IASSTD Report) সরাসরি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে "সচরাচরভাবে স্বীকৃত ব্যবসায়িক পথ এক্ষেত্রে কোনো গ্রহণযোগ্য সমাধান হতে পারে না।'' এই রিপোর্টে বিশ্বকৃষি যেসব সমস্যার মুখোমুখী হয়েছে সেগুলির সমাধানে জরুরী ভিত্তিতে জৈব-বৈচিত্র্যপূর্ণ বাস্তুতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলির প্রসার ঘটানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং পাশাপাশি ক্ষুদ্র পারিবারিক খামারগুলিকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

চাষের জৈব পথ শুধুমাত্র বাস্তুতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশি সুস্থায়ী তাই নয়, জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও তাকে পুনর্সঞ্জীবিত করতে স্বাস্থ্যকর খাবার যোগানোর জন্যও তার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এটা এখন বিস্তৃতভাবে স্বীকৃত যে পূর্ণাঙ্গ জৈব/প্রাকৃতিক উপায় অনুসরণের ফলে মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ ও পুনর্জাগরণ, শক্তি (energy) ও জলের অধিকতর কার্যকারীতা (efficiency) ও আরো বেশি সুষম পুষ্টির জন্য উৎপন্ন ফসলের অধিকতর বৈচিত্র্যের নিশ্চয়তা, আবহওয়ার খাম-খেয়ালীপনার বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া, চাষের খরচ কমে যাওয়া, আমদানীকৃত কৃষিজ ও জীবাশ্ম জ্বালানীর যোগানের অনিশ্চয়তার বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া ও খাদ্য সার্বভৌমত্বের জন্য বর্দ্ধিত আত্ম-নির্ভরশীলতা ইত্যাদি নানাবিধ সুবিধা পাওয়া যায়।

সাধারণ চাষিরা সর্বত্র দেখছেন যে তারা ক্রমাগত এক (গড়ানের) ঢালে গড়িয়ে পড়ছেন। কিন্তু তাদের অনেকেরই জৈবপথ অনুসরণ করার জন্য আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে। তাদের জন্য ভাস্কর সাভের পরামর্শ হল যে তাদের অন্তত ২৫ শতাংশ জমিতে প্রকৃতির সাজুয্যে পূর্ণাঙ্গ জৈব চাষের পথ অনুসরণ করা উচিত। জমির স্বাস্থ্যের যতই পুনরুদ্ধার হবে, উৎপাদনশীলতা ততই সুস্থির ভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং চাষের খরচও ততই কমবে। এই প্রক্রিয়ার

ফলশ্রুতিতে কৃষকের যতই আত্মবিকাশ বাড়তে থাকবে ততই আরো বেশি পরিমাণ জমিকে তারা পুনরুদ্ধার করে প্রাকৃতিক/জৈব উপায়ে চাষ করতে পারবে। আশা করা যায় এই বই তাদের অনুপ্রাণিত ও সাহায্য করতে পারবে।

২০১০ সালের নভেম্বর মাস থেকে ভাস্কর সাভের খামারে একটি প্রাকৃতিক কৃষির শিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। বর্তমানে এখানে প্রাকৃতিক চাষের ওপর একসপ্তাহব্যাপী সূচনামূলক ধারার (introductory course) পাঠ দেওয়া হয় হিন্দী, ইংরাজি, মারাঠি ও গুজরাটি ভাষায়। যারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করতে চান তারা abhijaysave@gmail.com এবং bharatmansata@yahoo.com এই দুটি ঠিকানার যে কোনো একটিতে যোগাযোগ করতে পারেন।

ওয়েন্ডেল বেরী এক অনুভূতিশীল চিন্তক, জৈবচাষি ও লেখক। তিনি বলেন, ‘‘যখন আমরা খাদ্য উৎপাদনের পথ বদলাই, আমরা আমাদের খাদ্য, মূল্যবোধ, আমাদের সমাজকে বদলাই......প্রাকৃতিক কৃষি হল আমাদের অসুস্থ সম্পর্কগুলি নিরাময় করার পথ।’’

গৌরবময় এই বঙ্গভূমি তার কৃষক ও সমগ্র জনগণসহ সকল জীব স্বাস্থ্যে ঝলমল করে উঠুক!

ভরত মনসাতা

ওম পূর্ণমদাহ :
ইন্দ্রজালের মতো সমগ্রতা



১

‘কে পুঁতেছিল বিশাল, প্রাচীন এই বৃক্ষরাজি? কে কর্ষণ করেছিল ভূমি? কেই বা জুগিয়েছিল বীজ, সার, সেচ ও মারীপোকাদের হাত থেকে ফসলের সুরক্ষা?’

চারপাশের ঘন সবুজের মধ্য থেকে ভাস্কর সাভে (উচ্চারণ সা–ভে) আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এই উষ্ণ, পোড়–খাওয়া কৃষকের সাথে সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ — পঁচিশ বছর আগে। তিনি বলে চললেন :

উপনিষদ বলছে[১] —

ওম পূর্ণমদাহ
পূর্ণমিদাম পূর্ণত পূর্ণমদাচ্ছতে
পূর্ণস্য, পূর্ণমদয়া পূর্ণমেয়া বশিষ্যতে

এই সৃষ্টি পূর্ণ ও অখণ্ড
পূর্ণ থেকে আবির্ভাব হয় সৃষ্টির,
প্রতিটি সৃষ্টিই পূর্ণ ও অখণ্ড
পূর্ণ থেকে গ্রহণ করুন পূর্ণ
(শ্রদ্ধার সাথে যতবার আপনার প্রয়োজন)
পূর্ণ পূর্ণই থেকে যায় — ক্ষয়হীন, অখণ্ড।

আমার মনে হল, ‘প্রকৃতিতে বিনা পয়সায় ভোজ পাওয়া যায় না’ —– কথাটা তাহলে এক আধুনিক অতিকথা (modern myth)। শুধুমাত্র শ্রদ্ধাশীল হও আর ‘বিনাপয়সার ভোজ’ পাও!

প্রথম বর্ষণে মাটির সুগন্ধ শীতল বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে, সজীব হয়ে উঠেছে প্রকৃতি। হঠাৎ পাখির কূজনকে বাধা দিয়ে চমকে দেওয়া এক উচ্চকিত শব্দ — ধপ্। উপস্থিত অন্য দুজন সাক্ষাৎকারী চোখ কোঁচকালেন। ভাস্কর সাভে শব্দটাকে পাত্তা দিলেন না। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম ‘ওটা

হল একটা ঝুনো নারকেলের মাটিতে পড়ার শব্দ'।

সাভে বলে চললেন, "আমাদের বনভূমিগুলিতে মানুষের যত্ন ছাড়াই ফলের গাছ —— যেমন বের (জুজুবে), জাম (জামবোলান), আম, বুনো ডুমুর, মহুয়া, তেঁতুল, রাইনি (জংলী সবেদা) —— নিজ নিজ ঋতুতে এমন বিপুল পরিমাণ ফলন দেয় যে ফলের ভারে গাছগুলো নুয়ে পড়ে। প্রতিটি গাছ থেকে বছরের পর বছর ধরে মানুষ সহ সমস্ত জঙ্গলবাসীর বয়ে নিয়ে যাওয়া ফলের পরিমাণ সাধারণত গড়ে এক টনের বেশি। কিন্তু প্রতিটি গাছের চারপাশের মাটি থাকে ক্ষয়হীন, অখণ্ড। সেখানকার মাটিতে কোথাও কোনো হাঁ করা গর্ত নেই! যদি কিছু ঘটে, তাতে মাটি আরও সমৃদ্ধ হয়।

"পাথুরে পর্বতগুলো সহ সমস্ত জায়গায় গাছপালারা কোথা থেকে তাদের জল, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ পায়? যদিও তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের দাঁড়িয়ে থাকার স্থানেই প্রকৃতি তাদের প্রয়োজনীয় রসদ জোগাচ্ছে। কিন্তু চোখে ঠুলি পড়া, অনধিকার হস্তক্ষেপের চুলকানি নিয়ে উদ্ধত, আধুনিক প্রযুক্তি মনে হয় এ বিষয়ে অন্ধ। একটি বৃক্ষ বা উদ্ভিদের কী প্রয়োজন, কতটা প্রয়োজন, কখন প্রয়োজন কৃষি–বিজ্ঞানীরা সে সব নিদান দেন কীসের ভিত্তিতে?'' দেজা ভু! (Déjà vu!) যেখানে এটি সুপরিচিত শব্দ, সেখানে এর আবেদন মোটেই ফুরিয়ে যায়নি। কয়েকবছর আগে জাপানি প্রাকৃতিক চাষি–ঋষি (Natural farmer-sage) ফুকুওকার মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমরা ছিলাম কলকাতা থেকে মুম্বইগামী —— দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি ৩৬ ঘণ্টাব্যাপী ট্রেন যাত্রায় এক অসংরক্ষিত কামরায়।



২ আপ বোম্বে মেলের ভিড়ে ঠাসা এক সু–আলোকিত 'সাধারণ' কামরায় অনেক রাত ও পরের দিন জুড়ে প্রাকৃতিক কৃষি সম্বন্ধে ফুকুওকার এক উচ্চমার্গের প্রস্তাবনা —— 'একটি তৃণখণ্ডে বিপ্লব' (One Straw Revolution) নামের বইটা পড়ে ফেললাম। সন্ধ্যের সময় আমি ওপরের বার্থ–এর অর্ধেকটা পেয়ে গেলাম একটু গড়িয়ে নেবার জন্য, কিন্তু আমার কল্পনা এমন সজীব হয়ে উঠেছিল যে আমি মোটেই ঘুমাতে পারলাম না। গোধূলি লগ্নে আমার চেতনা ও ঘুমঘুম ভাবের মাঝে দিবাস্বপ্ন, স্বপ্ন ও কুয়াশার মতো ভাবনারা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। বইটা কোথায় যেন এক গভীর তারে ঝংকার দিয়ে গেল।

ওই বছরেই ফ্রেন্ডস্ রুরাল সেন্টার[২] দ্বারা 'একটি তৃণখণ্ডে বিপ্লব'–এর ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। অতিশীঘ্রই এদেশে প্রকৃতি–সংবেদী ইংরেজি পাঠকদের মধ্যে তা হয়ে উঠল এক আন্ডারগ্রাউন্ড বেস্ট সেলার। আমি ও আমার স্ত্রী বিনীতা সবে কলকাতায় একটা বইয়ের দোকান খুলেছি। এরপর বেশ কয়েক বছর ধরে অন্য যে কোনো বইয়ের চেয়ে আমরা ওই বইটাই সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বিক্রি করেছি।

এরপর ১৯৮৭ সালে হঠাৎ আচম্বিতে আমি — শহুরে জন্মান এক যুবা — যে তখন ধান ও বুনো ঘাসের মধ্যে ফারাক করতে পারত না — সেই আমি নিজেকে 'পারমাকালচার' বা স্থায়ী কৃষিসংক্রান্ত ১০ দিনের এক নিবিড় কোর্সে অংশগ্রহণ করতে দেখলাম। এটি পরিচালনা করেছিলেন বিল মলিসন নামক এক অস্ট্রেলীয় যিনি 'পারমাকালচার' শব্দটিকে চয়ন করেছিলেন এবং অক্লান্তভাবে এই ধারণাটির প্রসার ঘটিয়েছিলেন।

১৯৮৮ সালে কলকাতার কাছে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্ব–ভারতীতে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে দেশিকোত্তম পুরস্কার গ্রহণ করতে মাসানুবু ফুকুওকা ভারতে এসেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা এক স্মরণীয় শীতের সকালে আমাদের বইয়ের দোকান সংলগ্ন বাগানে বসে তাঁর সাথে আলোচনার সুযোগ পেয়েছিলাম। মাটির ভাঁড়ে সবুজ চায়ে চুমুক দিতে দিতে ধূমায়িত মুখে আমরা এই কৌতূহল উদ্রেককারী বৌদ্ধ কৃষককে ঘিরে বসেছিলাম, যিনি সারা পৃথিবী জুড়ে জৈবচাষের ঢেউ তুলছিলেন। ওই মাসেই ফুকুওকা ও মলিসনের ওপর আমার নিবন্ধ 'পথিকৃৎগণ' (`The Harbingers') প্রকাশিত হয়েছিল 'দ্য ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া' নামক সাময়িকী পত্রে।



ইংরাজিতে 'দ্য ওয়ান স্ট্র রেভলিউশন'–এর প্রথম ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই বইটি বাংলা, মারাঠি, গুজরাতি, মালয়ালম, হিন্দি, তেলেগু ইত্যাদি প্রায় আধ ডজন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। আপাতভাবে ভারত এখনও প্রকৃতির প্রাচীন প্রাজ্ঞতায় পুর্নজাগরিত হওয়ার উর্বরভূমি — ফুকুওকা মহাশয়ের মতে নিশ্চিতভাবেই এদেশ জাপানের চেয়ে বেশি উর্বর।

প্রাকৃতিক কৃষি সম্বন্ধে আমার আগ্রহ উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯৮৯ সালে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'ইকলজিকাল ভিসান'[৪], কর্মী এবং সাধারণ পাঠকদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। বইটিতে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বাস্তুতান্ত্রিক কৃষির ওপর। বইটিতে ভারতের বিভিন্ন জৈব খামারের কথা লেখা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে একটি নিবন্ধ হল 'ভাস্কর সাভের খামারে প্রকৃতি হাসছে।'[৫] এর কিছু পরেই আমরা আমাদের আবাসস্থল বদলে বোম্বে আসি এবং প্রায় নয় বছর ধরে বারবার সাভের খামার পরিদর্শন করি। মহারাষ্ট্র–গুজরাত সীমান্তে বোম্বে থেকে চার ঘণ্টা দুরত্বে উত্তর তটরেখায় অবস্থিত সাভের খামার।

মুম্বইয়ে উইনিন পেরেরার সাথে আমাদের আলাপ হল। স্থায়িত্ব ও বিচার এবং ঐতিহ্যগত ভারতীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিপুল সম্পদের ওপর তাঁর ক্ষুরধার লেখনীগুলির সাথে আমরা পরিচিত হলাম। লেখাগুলি আমার চোখ খুলে দিল। এগুলিতে ভারতে জীব বৈচিত্র্যে ভরা জৈব কৃষির মহৎ ঐতিহ্য[৬] জীবন্ত উদাহরণের মাধ্যমে অসামান্যভাবে পরিবেশিত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে —— সবুজ বিপ্লবের (দু)–এক ধরনের চাষ (monoculture) ও রাসায়নিক কৃষির ব্যাপক প্রসারের প্রাক যুগ পর্যন্ত —— যখন পর্যন্ত এই ঐতিহ্যশালী জ্ঞানের ক্ষয় শুরু (বা ত্বরান্বিত) হয়নি।



"খুব বেশি দিন আগের কথা নয়", ভাস্কর সাভে স্মৃতিচারণ করছিলেন, "কবি ও লেখক বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সুজলম, সুফলম ভূমিকে কাব্যে বন্দনা করেছিলেন। বাস্তবিকই আমাদের দেশ ছিল উর্বর ও সমৃদ্ধশালী। এর সমৃদ্ধ মাটি, প্রচুর সূর্যালোক, ঘন বনাঞ্চল, অপূর্ব জীব বৈচিত্র্য, কৃষি সংক্রান্ত বিপুল কৃৎ–কৌশল ও জ্ঞান ভাণ্ডার —— এসব নিয়ে আমাদের দেশটা ছিল সত্যিই সমৃদ্ধশালী।

গণনার অতীত প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমাদের এই মাটি বাঁচিয়ে রেখেছে পৃথিবীর অন্যতম সর্বাধিক জনঘনত্বের দেশ এই ভারতবর্ষকে এবং তা কোনো রাসায়নিক সার, কীটনাশক, বিদেশি বামন প্রজাতির দানা শস্য অথবা নতুন, চোখ ধাঁধানো জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ ছাড়াই।

শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে বহিরাগত আক্রমণকারীরা এদেশে ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়েছে। তারা অনেক কিছুই নিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের ভূমির

উর্বরতা ছিল অটুট। সেই 'সোনার ডিম দেওয়া পাখিটা' ছিল আমাদেরই সাথে, অক্ষত। বৃটিশরা চলে যাবার পর ১৯৬০–এর দশকের মাঝ থেকে ভারত যে প্রবলভাবে কৃষির রাসায়নিক পথ অনুসরণ করল তাতে সমস্যার পাকচক্রে জড়িয়ে পড়ে মা প্রকৃতি, যিনি তার বরাভয় ও অমূল্যদানে ভরিয়ে রেখেছিলেন আমাদের ভূমিকে, সেই 'স্বর্গীয় পাখিটি' বিকলাঙ্গ হয়ে গেল।

গান্ধী বিশ্বাস করতেন গ্রাম স্বরাজে (অথবা গ্রামীণ স্ব–শাসনে), চোখ বুজে সাভে বলে চললেন, "তাঁর ভাবনার কেন্দ্রে ছিল সুস্থ জীবনের জন্য বুনিয়াদি সমস্ত চাহিদা পূরণে সক্ষম গ্রামীণ স্তরে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতা। এদেশে জৈব চাষের শক্তি সম্বন্ধে তাঁর ছিল পূর্ণ আস্থা। কিন্তু নেহেরুর পছন্দ ছিল শহুরে–শিল্পীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশ্চাত্য মডেল যার থেকে প্রবাহিত হয়েছে (দু)–এক রকমের (monoculture) প্রজাতির রাসায়নিক চাষ।

"আমাদের নিশ্চিতভাবে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে হবে যে শিল্পগুলো শুধুমাত্র প্রকৃতি থেকে পাওয়া কাঁচামালের রূপান্তর ঘটাতে পারে; তারা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। প্রতিদিনের তাজা সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে শুধুমাত্র প্রকৃতিই হতে পারে সত্যিকারের সৃজনশীল; শুধুমাত্র প্রকৃতিই নিজেকে পুনরুৎপাদিত করতে পারে।''

পৃথিবীতে সর্বক্ষণ প্রকৃতির ছয়টি প্রধান উপাদানের সাথে সূর্যালোকের ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার ধারা বয়ে চলেছে। এদের মধ্যে তিনটি হল বায়ু, জল, ও মাটি। এদের সঙ্গে জীবনের তিনটি পর্যায় —— বনস্পতি সৃষ্টি —— উদ্ভিদ জগৎ, জীব সৃষ্টি —— কীটপতঙ্গ ও জীবাণু জগৎ এবং প্রাণী সৃষ্টি —— পশুপাখিদের জগৎ —— এরা ক্রমাগত ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া করে চলেছে, প্রকৃতির এই ছয়টি প্রধান উপাদান একটি গতিশীল ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। একে অপরের সাথে মিশে প্রকৃতি সৃষ্টি করে স্বর্গীয় করুণার এক মহা ঐক্যতান।

"প্রকৃতির এই মৌলিক উপাদানগুলির কোনোটিকে বিপর্যস্ত করার কোনো অধিকার মানুষের নেই। কিন্তু করুণা বা প্রেম নয়, বাণিজ্যের সাথে আধুনিক প্রযুক্তির মিলনের ফলে সর্বস্তরে বিপর্যয় নেমে এসেছে। আমরা মাটি, জল ও হাওয়াকে নষ্ট করে ফেলেছি। আমরা আমাদের বেশিরভাগ বনভূমিকে নির্মূল ও তাদের আশ্রিত জীবদের হত্যা করেছি। আধুনিক চাষিরা তাদের জমিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে মারাত্মক সব বিষ ছড়িয়ে প্রকৃতির জীব সৃষ্টি বা জীবাণু ও কীটপতঙ্গদের ধ্বংস করছে। অথচ এই জীবাণু বা কীটপতঙ্গরা কোনো কিছুর

প্রত্যাশা না করে, উর্বরতার অসংখ্য নিরলসকর্মী হিসেবে মাটির জল ধারণ ক্ষমতা, বাতাস ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি প্রাণদায়িনী গুণাবলী বজায় রাখে, জীবের মৃত্যুর পর সমস্ত জৈব আবর্জনাকে পচিয়ে (বা বিশ্লিষ্ট) করে, মাটির উর্বরাশক্তি বজায় রেখে জীব–ভর (Bio-mass) বৃত্তাকারে আবর্তিত করে উদ্ভিদের পুষ্টি জোগায়। বিষাক্ত রাসায়নিকগুলি জল ও প্রকৃতির প্রাণীসৃষ্টি বা মানুষ সহ সমস্ত পশুপাখিকে বিষিয়ে তোলে।

গান্ধী বলেছিলেন, ''যেখানে শোষণ বা অত্যাচার রয়েছে সেখানে পেষণ বা পুষ্টি থাকতে পারে না।'' বিনোভা ভাবে আরও বলেছিলেন, ''বিজ্ঞানের সাথে করুণার মেলবন্ধনে পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে আসতে পারে। কিন্তু অহিংসা বিবর্জিত বিজ্ঞান শুধুমাত্র ঘটাতে পারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড যার আগুন আমাদের সবাইকে গিলে ফেলে।''

''প্রকৃতির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার চেষ্টাই হল সেই মৌলিক ভুল যা কৃষিবিজ্ঞানীদের উদ্ধত অজ্ঞতাকেই প্রকট করে তোলে। মানুষের দ্বারা নষ্ট না হওয়া প্রকৃতি এমনিতেই অফুরন্ত ফসলে পরিপূর্ণ। যখন ধানের একটা দানা কয়েক মাসের মধ্যে হাজার গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে সেখানে তার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনটাই বা কীসের! যথেষ্ট ও সুস্বাস্থ্যকর ফসলের জন্য যা করা দরকার তা হল প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক শর্তাবলী বজায় রাখা।''

''কৃষিতে এমএসসি বা পিএইচডি করতে গিয়ে একজন ছাত্র যে বছরগুলি ব্যয় করে সেখানে একমাত্র লক্ষ্য হল স্বল্পমেয়াদী এবং যা ক্ষীণদৃষ্টি প্রসূত — সেটি হল অর্থনৈতিক (পুষ্টিগত নয়) উৎপাদনশীলতা। এর জন্য চাষিকে শ–খানেক জিনিস কিনতে বা করতে বলা হয়। কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে কী কী জিনিস চাষির কখনও করা উচিত নয় — যাতে পরবর্তী প্রজন্মগুলি এবং অন্যান্য জীবের জন্য মাটির ক্ষতি না হয় — সে কথা মোটেই ভাবা হয় না। এখন সময় হয়েছে, জনগণ ও সরকারকে উপলব্ধিতে জেগে উঠতে হবে যে কর্পোরেট ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির দ্বারা বিকশিত শিল্প–তাড়িত কৃষি অন্তর্নিহিতভাবে অপরাধমূলক ও আত্মহত্যার শামিল।''



যখন আমি ফুকুওকার 'একটি তৃণখণ্ডে বিপ্লব' পড়ি, তখন 'মাটি ও শরীরের তুলনায়' আমি সচকিত হয়ে উঠেছিলাম। প্রকৃতির মহা–বুদ্ধি (Supra-

intelligence) যা পৃথিবীকে পরিচালনা করে, তা নিশ্চয়ই আমাদের শরীরকেও পরিচালিত করে। বেপরোয়া হস্তক্ষেপে যেমন মাটির স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, তেমনি তা আমাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করতে পারে। ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া প্রচুর লেখালিখি থেকে এখন মনে হয় নিশ্চিত করে বলা যায় যে (Latrogenic diseases) বা চিকিৎসাজনিত হস্তক্ষেপের দ্বারা সৃষ্ট রোগগুলির মহামারির মতো প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের পিছনে আছে কর্পোরেট প্রভাবাধীন স্বাস্থ্য সেবা।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আমি ভাবলাম ... যদি প্রকৃতি এই অত্যুৎকৃষ্ট, বহুমুখী মানবশরীর সৃষ্টি করে থাকে — যা অনেক জটিল অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ ও তন্ত্র নিয়ে একটা সুসংবদ্ধ সমগ্র হিসাবে কাজ করে — তাহলে এটা কি ভাবা যায় যে যখন এই শরীর রোগাক্রান্ত (dis-eased) হয় তা নিজেকে নিরাময় (self-healing) করতে সক্ষম নয়? (Heal) শব্দটির মূলে আছে `whole', তাই healing–এর অর্থ হল পূর্ণাঙ্গতা ফিরে পাওয়া বা পূর্ণাঙ্গতায় ফিরে যাওয়া। পরবর্তী বছরগুলো আমি ও আমার পরিবার এই পথের অনুসন্ধানে রত হলাম।

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা নিশ্চিত হয়েছিলাম যে (অন্তত আমাদের ক্ষেত্রে) রোগ সারাতে সচেতনভাবে যতটা সম্ভব কম হস্তক্ষেপ হল সঠিক নীতি। অন্তত সাধারণ রোগজ্বালার ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র বিশ্রাম নেওয়া, পৌষ্টিক–তন্ত্রকে হালকা রাখা (রান্না করা খাবারের বদলে ফলের ওপর নির্ভর করা), তেষ্টা পেলে পান করা এবং সাকারাত্মক (হ্যাঁ–বাচক) দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা — এগুলি করলেই বিস্ময়কর ফল পাওয়া যায়। এরপর শরীর নিজেকে নিরাময় করতে কতটা সময় নেবে তা নির্ভর করে কতটা জমে থাকা বিষ বের করে দিতে হবে তার ওপর।

এটা অবশ্যই সত্য যে জৈবচাষে সৃষ্ট বিষমুক্ত খাবারের সাথে মানুষের স্বাস্থ্যের এক প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। শরীরে জমে থাকা বিষ বের করে দিতে শরীরের শক্তি (energy) ভাণ্ডারে টান পড়ে, ফলে পুষ্টির অভাব ঘটে। প্রায় দু–দশক আগে ১৫ জুন, ১৯৮৯ ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকায় প্রকাশিত 'আপনার খাদ্যে বিষ' (poison in your food) নামক এক সুগবেষণালব্ধ নিবন্ধ মেলে ধরেছিল যে 'ভারতীয়রা প্রত্যেকদিন যে খাবার খায় তাতে মিশে থাকা বিষাক্ত মারীপোকানাশক রাসায়নিকের মাত্রা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। এর ফলে তাদের হৃদরোগ, মস্তিষ্ক, কিডনি, যকৃতের ক্ষতি ও ক্যানসার ইত্যাদি রোগের সম্মুখীন হতে হয় — এসবই হল আধুনিক রোগসমূহ যার সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হয়েছে ... আরও বেশি উৎপাদন করো, বিক্রি

করো, ভোগ করো ... আরও ... আরও ... এই অনিয়ন্ত্রিত বেপথু শিল্পায়নের ফলে।



১৯৯০–এ ভাস্কর সাভের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতের পরের বছর মহারাষ্ট্রের উত্তর উপকূলে বোরদি নামক এক জায়গায় 'প্রাকৃতিক যাপন ও প্রাকৃতিক চাষ'–এর ওপর এক জাতীয় জমায়েত (national gathering) সংগঠিত করা হয়েছিল,[৭] জায়গাটা ভাস্কর সাভের খামার থেকে মাত্র ১০ কিমি দক্ষিণে। বাসভর্তি লোকজন এসে জায়গাটা ভরিয়ে তুলেছিল।

১৯৮০–র দশকের শেষের দিক থেকে ১৯৯০–এর প্রথম দিকেই আমার কাছে উত্তরোত্তর পরিষ্কার হয়ে উঠছিল যে ক্রমান্বয়ে বাস্তুতান্ত্রিক ক্ষয়, সামাজিক অবিচার, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এবং নতুন নতুন রোগের মহামারী — এগুলি উদ্ভুত হয়েছে শহুরে–শিল্পীয়–উপভোক্তা উন্নয়নের পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক মডেল অবিবেচকের মতো অনুকরণের ফলে।[৮]



১৯৯৩ সালে নর্মদা নদীর ওপর বিশাল সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্পটির মূল্যায়ন করার জন্য ভারত সরকার যোজনা কমিশনের ডঃ জয়ন্তরাও পাতিলের নেতৃত্বে একটি পাঁচ সদস্যের গোষ্ঠী নিযুক্ত করেছিল। যেহেতু পরিকল্পনায় ছিল যে ওই বিশাল জলাধারের এক বিপুল পরিমাণ জল সেচের কাজে ব্যবহার করা হবে, সেই মূল্যায়ন–গোষ্ঠী ভাস্কর সাভেকে লিখেছিল যাতে একজন অভিজ্ঞ চাষি হিসাবে তিনি তাঁর মতামত দেন। সাভে এক বিস্তারিত উত্তর পাঠিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সাথে আমার গুজরাতি ভাষায় আলোচনা হয়। সেই আলোচনার ভিত্তিতে আমি তা ইংরাজিতে লিখেছিলাম। তার কয়েকটি মুখ্য বক্তব্য নিচে উদ্ধৃত হল :

"আমি দীর্ঘ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যয়ের সাথে বলছি যে কার্যকর, সুস্থায়ী কৃষির জন্য (efficient, sustainable agriculture) সেচের প্রয়োজন অত্যন্ত অল্প — আধুনিক কৃষিতে যা ব্যবহার করা হয় তার এক সামান্য ভগ্নাংশ। শস্যের শ্রেষ্ঠ ফলন পাওয়া যায় এমন মাটি থেকে, যাতে থাকে একটা ভেজা/স্যাঁতসেঁতে (damp) বা আর্দ্র (moist) ভাব, যাতে মাটির কণাগুলির মধ্যে বায়ু চলাচল (aeration) বজায় থাকে। ধান

হল এক বিরল ব্যতিক্রম যা এমনকী সেখানেও বৃদ্ধি পেতে পারে, যেখানে জমে থাকা জলে মাটি সংপৃক্ত হয়ে আছে। নাবাল জমিতে বা বন্যা প্রবণ অববাহিকা অঞ্চলে বৃষ্টি-সেবিত ফসল হিসাবে ধানকে বাছা হয়, অন্য সব ফসলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সেচ গাছ ও মাটি উভয়েরই ভীষণ ক্ষতি করে।

"আমার জমিতে সজীব ঝুরু-ঝুরু (Porous) মাটি স্পঞ্জের মতো জল শুষে নেয় এবং সেই জল চুঁইয়ে নিচে নেমে ভূগর্ভে জলস্তর ভরিয়ে তোলে বিশাল পরিমাণে। এইভাবে ভূগর্ভে জল জমার পরিমাণ শুখা মরশুমে সেচের জন্য কুয়ো থেকে জল তোলার পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি। তাই আমার খামার স্থানিক বাস্তুতন্ত্র (local ecology) থেকে মোটেই জলভোক্তা নয় বরং সেই হিসেবে জলসরবরাহকারী!''

"যদি আমাদের কৃষির লক্ষ্য হয় আত্মনির্ভরশীলতা এবং আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করা, তাহলে বৃহৎ সেচ পরিকল্পনার কোনো প্রয়োজন নেই। এদেশে জল সুরক্ষা ও খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় হল প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে, জৈব উপায়ে স্থান উপযোগী ফসল, উদ্ভিদ ও (বিশেষত) গাছের মিশ্র চাষ। এর ফলে যেখানে বৃষ্টিপাত কম হয়, সেখানে বৃষ্টিপাত বাড়বে, মাটির পক্ষে বিপুল পরিমাণে জল শুষে নিয়ে ভূগর্ভে জমা রাখার ক্ষমতাও ফিরে আসবে।''

এছাড়াও, এখন যে বৃষ্টি হলে বন্যা তার পরে খরা — এই ব্যাপারটি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে — তা থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, কারণ এখন বৃষ্টিপাতের অনেকটাই মাটিতে শোষিত হয়ে ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলি ভরিয়ে তোলে না — বরং তা বিপুল পরিমাণে ওপরের স্তরের মাটিকে (top-soil) বয়ে নিয়ে গিয়ে চলার পথে জলাধারগুলিকে বুজিয়ে দিয়ে ধ্বংসলীলা চালিয়ে সাগরে মেশে।

সাভের চিঠিতে আরও বলা হয়েছিল, "দুঃখজনক ভাবে আমরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছি যে ভারতে অধঃপতিত (degraded) হয়নি এমন সব জমির সম্মিলিত জলধারণ ক্ষমতা হল ইতিমধ্যে সমাপ্ত, অসমাপ্ত ও শুধুমাত্র কাগজে-কলমে থেকে যাওয়া (যা কার্যে রূপায়িত হয়নি) বৃহৎ ও মাঝারি সেচপ্রকল্পগুলির সম্মিলিতভাবে জলধারণ ক্ষমতার চেয়েও বহুগুণ বেশি। এই বিকেন্দ্রীভূত ভূর্গভস্থ জলাধারগুলি অধিকতর কার্যকর, কারণ ভূতল জলাধারগুলির মতো বিপুল পরিমাণ বাষ্পীভবনের ফলে জলহ্রাসের সম্ভাবনার হাত থেকে এগুলি সুরক্ষিত।''

আর অবশ্যই বিপুল অর্থব্যয় এবং অর্থনৈতিক, বাস্তুতান্ত্রিক ও মানবিক

সমস্যাবলী — যেগুলি ভূপৃষ্ঠে জলাধার তৈরি ও জল সরবরাহের জন্যে বিপুল কারিগরি প্রকল্পের সাথে যুক্ত —এসমস্ত কিছুই এড়ানো যেত এবং বৃহৎ সেচ প্রকল্পগুলি থেকে সৃষ্ট মাটির লবণাক্তকরণ (Salinization) ও জলমগ্নতার (water logging) যমজ অভিশাপকে (বিশেষত শুখা এলাকায় যেখানে মাটি জল নিষ্কাশন করতে পারে না) বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেত।



১৯৯৪ সালে ভাস্কর ভাই ও অন্য অনেকের সাথে আমি কচ্ছের বিদাদা অঞ্চলে যাই। সেখানে ‘জল সংকট নিবারণ সমিতি’ নামে সংগঠনটি এক জমায়েত সংগঠিত করেছিল। বিশাল শুখা অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে মাত্র ২ বা ৩ ইঞ্চি। গত দশকে অনেকবার এমন ঘটেছে যে সারা বছর ধরে অঞ্চলটি ছিল বৃষ্টিহীন। সমিতি জানিয়েছিল যে আটটি গ্রাম পরিত্যক্ত হয়েছে এবং প্রায় ৩০০টি গ্রামের মানুষ তীব্র জলকষ্টের ফলে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

কিন্তু এমনটা সব সময় ছিল না। বৃদ্ধ কৃষকরা জানালেন যে মাত্র অর্ধশতক আগে দক্ষিণ কচ্ছে বহু গাছপালা ছিল। সংলগ্ন অঞ্চলে ভূগর্ভে জল পাওয়া যেত মাত্র ৪০ ফুট গভীরে। জঙ্গলে ছিল চিতার দল। এক সময় ৩৫ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমিতে ধানের চাষ হত। বৃষ্টিপাত ছিল আজকের চেয়ে অনেক বেশি।

স্থানীয় বেশ কিছু বৃদ্ধ মানুষের সাথে আমাদের আলাপ হল যারা বিশেষভাবেই সজাগ যে বৃষ্টিহীনতার কারণ মরুভূমির প্রসার নয় বরং বনভূমির উচ্ছেদ এবং মাটির অনাদর। যেমন ফুকুওকা বলেন, “বৃষ্টি আকাশ থেকে পড়ে না, তা ওঠে মাটি থেকে।”

এমনকী এখনও গ্রামের বয়স্করা বললেন, প্রতিবছর বর্ষার সময় সমুদ্র থেকে ঘন কালো মেঘের কুণ্ডলী মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়, কিন্তু বৃষ্টি দেওয়ার জন্য কচ্ছের ওপর থামে না। ঘাসপাতাহীন শুখা মাটি থেকে ওপরে ওঠা শুকনো, গরম বাতাস বৃষ্টি ঘনীভূত হওয়ার জন্য উপযোগী নয়। এছাড়াও এই শুকনো বাতাসে গাছ–গাছালি থেকে পাওয়া জৈব–কণার বড়ো অভাব। এই জৈব–কণাগুলির চারপাশে বৃষ্টির ফোঁটা ঘনীভূত হয়, ঘনত্বে বাড়ে এবং মাটিতে পড়ে। কচ্ছের বিদাদায় জনসাধারণের মধ্যে খোলামেলা আলোচনার উদ্দেশ্যে ছিল কঠিন পরিস্থিতি থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসা যায় তার উপায় খোঁজা, এটি উপলব্ধ হল যে যতটুকু জল পাওয়া যায় তাই

দিয়েই সর্বাপেক্ষা অনুকূল মাত্রায় (optimum) সবুজায়ন করতে হবে এই আশা নিয়ে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে।



১৯৯০ সালে প্রাকৃতিক যাপন ও প্রাকৃতিক কৃষির ওপর বরদিতে জমায়েতের প্রায় বছর খানেক পর আমার কিছু বন্ধু ও আমি জমি খুঁজতে শুরু করেছিলাম, [৯] আমাদের সংখ্যা বেড়ে গেল। আমরা প্রায় দু–ডজন বন্ধু মিলে অর্থ যোগাড় করে সহ্যদ্রি–র পাদদেশে ৬৪ একর ঢেউ খেলানো জমি কিনলাম। জায়গাটা বম্বে থেকে একশো কিলোমিটার দূরে। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল জৈব চাষ ও বনভূমির পুনর্জাগরণ। (বেশির ভাগ জমিতে বনচ্ছেদ হয়েছিল মাত্র ৩ বা ৪ বছর আগে। কিন্তু তাদের পুনর্জাগরণের বিশেষ সম্ভাবনার প্রকাশও ছিল। আমরা এও স্বপ্ন দেখেছিলাম যে সময়ে ভিশান একরস্ (vision Acres) নামে এক বাস্তুতান্ত্রিক সমাজ স্থাপন করা সম্ভব হবে। অবশ্য পরবর্তীকালে জায়গাটার নামকরণ করা হয় বনবাড়ি। 'বন' মানে জঙ্গল, 'বাড়ি' মানে ছোটো বসতি।



বনবাড়িতে 'পান্না বাটি হ্রদ'।

জমির সাথে আমার নিকটতর সম্পর্কের সেই শুরু। গত ১৬ বছর ধরে বনবাড়ি পরিণত হয়েছে দীর্ঘ বৃক্ষের এক ঘন, সবুজ বনে যেখানে রয়েছে

ঐতিহ্যগতভাবে প্রয়োজনীয় গাছপালা ও ৩০টিরও বেশি খাদ্য প্রজাতিসহ জীব বৈচিত্র্যের এক অপূর্ব সমাহার। ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার পূরণ বৃদ্ধি পেয়েছে বিপুলভাবে। এর ফলে আমাদের নিম্নস্রোতে দুটি গ্রাম বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছে। স্থানিক মাল-মশলা ও মাটি দিয়ে স্বল্প খরচে ঝরনাখাতের উপচে পড়া বৃষ্টির জল ভূতল জলাধারে বেঁধে রাখার কাজও সফল হয়েছে। আর কয়েকবছর আগে ভাস্করভাই জায়গাটা পরিদর্শন করার পর স্থানীয় একটি আদিবাসী পরিবার — বিশেষ করে বুয়া, আমরিভাই ও দৌলতের সাহায্যে খাদ্য-ফসল ফলানোর প্রচেষ্টায় ফল ফলতে শুরু করেছে।[১০]

গত দু-দশক ধরে আমি বার বার ভাস্কর সাভের খামারে ফিরে গিয়েছি। প্রতিবারই আমি নতুন কিছু শিখেছি। ১৯৯০-এর দশকে সাভে ও তাঁর কৃষিকাজের পদ্ধতির ওপর আমার আধডজন লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যদের দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় আরও অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। আমি এই বইটি লিখতে শুরু করেছিলাম। অনেকগুলি অধ্যায়ে বইটির লেখা সম্পূর্ণ না হওয়াটা আমাদের বন্ধুদের কাছে হাসির খোরাক হয়ে উঠেছিল।

ফুকুওকা আবার ভারতে এলেন এবং তারপর তৃতীয়বার। ১৯৯৭ সালের ৯ই অক্টোবর তিনি কল্পবৃক্ষে ভাস্কর সাভের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তার সাথে অনুবাদের জন্য ছিলেন একজন কমবয়সি জাপানি মহিলা। ফুকুওকা মহাশয় বেশ বুড়ো হয়েছেন এবং তাঁর পক্ষে হাঁটা তখন কিছুটা কষ্টসাধ্য। তিনি এবং ভাস্কর সাভে একটা গরুর গাড়িতে বসলেন। গাড়িটা তাঁকে নিয়ে চলল বাগিচা খামার ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য। আমার পকেট টেপ-রেকর্ডারটা ঝোলানো ছিল তাঁদের মাঝখানে। আমরা কয়েক ডজন মানুষ পায়ে হেঁটে তাঁদের অনুসরণ করছিলাম।

সোজা কথায়, ফুকুওকা ভীষণ খুশি হলেন। তাঁর স্মিত হাসির মধ্যে ফুটে উঠছিল বিস্ময় — তা দিয়ে তিনি যেন বলতে চাইছিলেন, "অপূর্ব"! আমরা যখন আবার আমাদের সাক্ষাতের জায়গায় জড়ো হলাম তাঁর কথা শোনার জন্য, সকলের মধ্যেই ছিল এক দারুণ কৌতূহল। তিনি হাসলেন এবং চারপাশে অঙ্গভঙ্গি করলেন — যেন তাঁর চারপাশটা সবটাই বলে দিচ্ছে। তারপর তিনি শুরু করলেন আর যুবতী মহিলা ভাষান্তর করতে লাগলেন, "আমি সারা পৃথিবী জুড়ে বহু খামার দেখেছি। এটাই শ্রেষ্ঠ। এটা এমনকী আমার নিজের খামারের চেয়েও ভালো।"

২০০০ সালটা ছিল ভাস্কর সাভের খামার সংলগ্ন বিস্তৃত ও অপূর্ব তটরেখা অঞ্চল জুড়ে এক সমস্যা সঙ্কুল বছর। মাত্র ৬ কিমি দূরে উমের গ্রামে



ফুকুওকা, সাভে এবং দোভাষী কল্পবৃক্ষে বলদে টানা গাড়িতে বসে।

গুজরাত সরকার একটি বন্দর তৈরির প্রস্তাব রাখে। এর ফলে চারপাশের সমৃদ্ধ, উর্বরভূমিতে গড়ে ওঠা খামার ফলের বাগান, অনেক আবাসিক স্কুল সহ বিশাল সংখ্যক কঠোর পরিশ্রমী সমৃদ্ধ জেলে সমাজের জীবন–জীবিকা, বন্দর ও তা থেকে সৃষ্ট দূষণের কবলে বিপন্ন ও সম্পূর্ণ ধ্বংস হবার উপক্রম হল। প্রধান যে পণ্য এই বন্দর সরবরাহ করবে বলে ঠিক হয়েছিল তা হল আমদানিকৃত কয়লা — যা যাবে মহারাষ্ট্রের উত্তর উপকূলে দাহানু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে।

সমগ্র অঞ্চলটি এই বিশাল ধ্বংসাত্মক প্রকল্পটির প্রতিরোধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। লেঃ কর্নেল রঘুনাথ সাভে, ভাস্কর সাভের দাদার ছেলে। তিনি ভারতীয় সেনাকে সসম্মানে ৩৩ বছর সেবা করার পর সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করে বাড়ি ফিরেছেন। জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলন দ্বারা উপকূল অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য সদ্য গঠিত হয়েছে ‘কিনারা বাঁচাও

সংঘর্ষ সমিতি'। অঞ্চলের বাসিন্দারা এই সমিতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য রঘুনাথ সাভেকে অনুরোধ করলেন।

আন্দোলনের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে জনতা তাদের অঞ্চলে সরকারকে এই ভ্রান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাকে এগিয়ে যাওয়া থেকে রুখতে বদ্ধ পরিকর। ৭ এপ্রিল ২০০০ গভীর রাতে গুজরাত পুলিশ কোনোরকম গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই প্রতাপ সাভেকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে গেল। এই জনপ্রিয় সর্বজন শ্রদ্ধেয় অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল নৈশ অভিযানের অফিসারের সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে বাড়ি থেকে হেঁটে বের হলেন, কিন্তু আর কোনোদিন তিনি পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে আসেননি।

পরের রাতে প্রতাপ সাভের পরিবারের কাছে পুলিশের থেকে একটি ফোন আসে। তাদের জানানো হয় তিনি ভালো নেই এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিবারের অনেক সদস্য হাসপাতালে ছুটে যান। সেখানে তারা জানতে পারেন যে তাঁকে ছোটো শহর ভাপিতে অন্য একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে গিয়ে তারা জানেন যে তিনি কোমায় আচ্ছন্ন। তাঁকে সেখান থেকে মুম্বইয়ে হিন্দুজা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তিনি আর কোমা থেকে বেড়িয়ে আসতে পারেননি। ২০ এপ্রিল ২০০০–এ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জনগণ নিশ্চিত জানত যে তিনি পুলিশের নিষ্ঠুর অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। জনগণ রাগে ফুঁসছিল। কিন্তু তাদের ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণে স্ব–শৃঙ্খলা থাকায় ও প্রকৃতিগতভাবে তারা শান্তিপ্রিয় বলে নির্বিচারে ভাঙচুর, পুলিশ স্টেশনে আগুন লাগানো বা রাজ্য সরকারি অফিসগুলিতে আক্রমণ ইত্যাদি থেকে বিরত থেকেছে। অবশ্যই প্রস্তাবিত বন্দরটি আর গড়ে ওঠেনি।

দেহরি গ্রামে, মোড়ে স্থাপিত হয়েছে কর্নেল প্রতাপ রঘুনাথ সাভের পাথরে খোদিত আবক্ষমূর্তি যা অঞ্চল জুড়ে ভূমির স্বাস্থ্য ও জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষায় তাঁর চরম আত্মত্যাগের কথা অবিরাম স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু দশবছর পর বিভিন্ন সংবাদ সূত্র থেকে মনে হচ্ছে, বিভিন্ন শক্তিসমূহ সময়ের অপেক্ষায় আছে যাতে তারা নিরাপদে বন্দর প্রকল্পটিকে পুনরায় লাগু করতে পারে। আপাতভাবে সারা দেশ জুড়ে বিবেচনায় বা পুনর্বিবেচনায় আছে ৩০০টি নতুন বন্দর।



লেফটন্যান্ট কর্নেল প্রতাপ রঘুনাথ সাভে ফুকুওকাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন, ফুকুওকার পেছনে সাভে। প্রতাপ সাভের বাঁদিকে ডঃ জয়েন্ত পাটিল।



২০০৫ সালের মে মাসে আমি গুজরাত জৈবচাষ–পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলাম।[১১] এটি ছিল রাজ্য জুড়ে এক পদযাত্রা। এই যাত্রা শুরু হয়েছিল কচ্ছের দেশলপুরের কাছে ভীষণ শুখা অঞ্চল বান্ধাইয়ের উমিয়া মাতা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে। প্রায় হাজার খানেক লোক এই যাত্রায় সামিল হয়েছিল, যা এই জনবিরল অঞ্চলে বেশ ভালো একটা সংখ্যা। আমার আগেই ভাস্কর সাভে পৌঁছে গিয়েছিলেন। প্রখর গ্রীষ্মে তাপমাত্রা যখন ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপর, তখন তাঁর নাছোড় উৎসাহ ও প্রাণশক্তি তার অর্ধেক বয়সি যে কাউকে লজ্জা দিতে পারত। প্রথম দিনেই তো আমি কাতর হয়ে পড়েছি। কিন্তু ৮৩ বছরের ভাস্করভাই সংশয়হীন যে তিনি উত্তরের কচ্ছ থেকে শুরু করে, সৌরাষ্ট্রে সাময়িক বিরতির পর সমগ্র যাত্রাপথ অতিক্রম করে দক্ষিণ গুজরাতের সুরাট জেলার ভাত গ্রামে যাত্রা শেষ করবেন।

আমি দেখলাম ভাস্কর সাভের কথোপকথন ও বক্তৃতা স্থানীয় চাষিদের

মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। তিনি যেখানেই যাচ্ছিলেন সর্বত্র তাঁর চারপাশে লোকজন ভিড় করছিল। পরে ভাস্কর সাভে আমাকে বলেছিলেন, "এই মানুষগুলো জানে যে তাদের জৈবচাষে ফিরতে হবে, নয়তো শীঘ্রই চাষবাস ছেড়ে দিতে হবে। অনেকে ইতিমধ্যেই রাসায়নিক ছেড়ে দিয়েছে। তারা স্রেফ বিপুল জলের চাহিদা ও চাষের বিপুল খরচ মেটাতে অক্ষম।''

পরের দিন সকালে আমি ভাস্কর সাভেকে দেখলাম একটি গাছের নিচে বেঞ্চে বসে লেখায় ব্যস্ত আছেন। রাসায়নিক চাষ ও জৈব চাষের মধ্যে কী ফারাক তা তিনি লিখছিলেন (গুজরাতি ভাষায়)। পরে সন্ধ্যায় যখন তাঁকে ধরলাম, দেখলাম তিনি ৩৬টি ফারাক লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি ভাবলাম এর কতকগুলি একসাথে সমন্বয় করা যায়। সেগুলির সারাংশ করে আমি তা করলাম এবং ১৮টি প্রধান ফারাককে অনুবাদ করলাম।
সেগুলি নিম্নরূপ :

১) রাসায়নিক চাষ জীবনের জাল (web of life) ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়, জৈবসার তার পূর্ণতাকে (wholeness) লালন করে।

২) রাসায়নিক চাষ নির্ভর করে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর, জৈব চাষ নির্ভর করে সজীব মাটির ওপর।

৩) রাসায়নিক চাষিরা তাদের জমিকে দেখে এক মৃত মাধ্যম হিসাবে; জৈবচাষিরা জানে যে তাদের জমি প্রাণে ভরপুর।

৪) রাসায়নিক চাষ মাটি, জল ও বায়ুকে দূষিত করে, জৈবচাষ তাদের শোধন ও পুনরুজ্জীবিত করে।

৫) রাসায়নিক চাষ বিপুল মাত্রায় জল ব্যবহার করে এবং মাটির নিচের ঝরনাগুলিকে (acquifiers) শুকিয়ে দেয়। জৈব চাষে সেচ লাগে অনেক কম এবং এই চাষ ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডারকে পূর্ণ করে।

৬) রাসায়নিক চাষ (দু)একরকম প্রজাতির চাষ (monoculture) এবং এই চাষ জৈব বৈচিত্র্য ধ্বংস করে, জৈব পদ্ধতিতে বহুরকম প্রজাতির চাষ (polyculture) হয় এবং তা বৈচিত্র্যকে লালন করে।

৭) রাসায়নিক চাষে উৎপাদন হয় বিষাক্ত খাবার, জৈবচাষে সৃষ্টি হয় পুষ্টিকর (wholesome) খাবার।

৮) রাসায়নিক চাষের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত এবং এর ভবিষ্যত অন্ধকার; জৈবচাষের রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস আর এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

৯) রাসায়নিক চাষ হল এক বিদেশি, আমদানি করা প্রযুক্তি; জৈবচাষ বিবর্তিত হয় দেশজভাবে।

১০) রাসায়নিক চাষের প্রসার ঘটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের

দ্বারা সরবরাহ করা ভুল তথ্যাবলীর মাধ্যমে; জৈবচাষ শেখে প্রকৃতি ও চাষির অভিজ্ঞতা থেকে।

১১) রাসায়নিক চাষের ফলে লাভবান হন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা; জৈবচাষে লাভ পায় কৃষকরা, পরিবেশ ও গোটা সমাজ।

১২) রাসায়নিক চাষে কৃষকের ও গ্রামের আত্মনির্ভরশীলতা (এবং আত্মমর্যাদা) লুণ্ঠিত হয়, জৈবচাষ তা ফিরিয়ে দেয় ও শক্তিশালী করে।

১৩) রাসায়নিক চাষে চাষি দেউলিয়া হয় ও কষ্ট ভোগ করে; জৈবচাষ কৃষককে ঋণ ও দুঃখ থেকে মুক্তি দেয়।

১৪) রাসায়নিক চাষ হিংসাত্মক পরিবর্তন নিয়ে আসে; জৈবচাষ হল অহিংস, এটি প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলির দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে (synergistic) বিবর্তিত হয়।

১৫) রাসায়নিক চাষ হল ফাঁপা সবুজ বিপ্লব; জৈবচাষ হল সত্যিকারের সবুজ বিপ্লব।

১৬) রাসায়নিক চাষ হল স্থূলভাবে বস্তুবাদী, যাতে কোনো আদর্শের ভাব নেই; জৈবচাষের শিকড় প্রোথিত আধ্যাত্মিকতা ও সত্যের অনুসরণে।

১৭) রাসায়নিক চাষ হল আত্মহত্যার পথ, এটি হল জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে যাত্রা। জৈবচাষের পথ হল পুনরুজ্জীবনের পথ।

১৮) রাসায়নিক চাষ হল বাণিজ্য ও নিপীড়নের বাহন, জৈবচাষ হল সংস্কৃতি ও সহবিবর্তনের (co-evolution) পথ।

জৈবচাষ-পদযাত্রার দ্বিতীয় পর্বে গান্ধীর সৌরাষ্ট্রে সবরকান্থা জেলার (যেখানে জলের পরিস্থিতি কচ্ছর থেকে কিছুটা ভালো) অনেরা-তে বিশ্বমঙ্গলম স্কুলে (সার্বজনীন মঙ্গল) জড়ো হয়েছিল প্রায় ৪০০ জন। অধিবেশনের শুরুতে স্থানীয় ব্যবস্থাপকরা ভাস্কর সাভেকে তাঁর আশীর্বচন বা উদ্বোধনী বক্তৃতায় —— আশীর্বাদ ও প্রেরণা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন ...।

সাভে ঘোষণা করলেন, ‘‘গত দু-দশক ধরে আমি এই অঞ্চলে চার বা পাঁচবার এসেছি এবং আমার মনে হয় যে এখানকার ৬০ শতাংশের বেশি চাষি এখন জৈবচাষকে কার্যকর অথবা একমাত্র কার্যকর পথ বলে মনে করে ...।’’

‘‘পরের দশকের মধ্যে কৃষিপথের (way of farming) এবং চাষি ও চাষি পরিবারের ভবিষ্যতের রূপান্তর সাধনের লক্ষ্যে আমাদের কাজ করা উচিত। তাই আমি কামনা করি আগামী দশবছর অতিক্রান্ত হবার আগে আমাদের রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের দোকান ও কারখানাগুলিতে তালা পড়ে যাক। বিষমুক্ত হোক আমাদের মাটি।’’



২০০৬ সালে ভারতীয় খবরের কাগজগুলির পাতা জুড়ে থাকত বিদর্ভ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ভারতের অন্যান্য অংশের চাষিদের আত্মহত্যার খবর। এমনকী পাঞ্জাব, যে রাজ্যটি ছিল তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লবের' অগ্রদূত — সেখান থেকেও আসত আত্মহত্যার খবর। চাষের প্রশ্নে এই রাজ্যটি অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল। এই দশক জুড়ে সারা দেশে সরকারি হিসাব অনুযায়ী কৃষকের আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষের ওপর।

২০০৬ সালে গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে — অনেকদিন পর — আমি ভাস্কর সাভের সাথে দেখা করি। তিনি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর বেদনার কথা প্রকাশ করেন। "আমাদের মতো বিশাল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কৃষিপ্রধান ও বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের দেশে এ এক ভীষণ লজ্জার ব্যাপার। আমরা সারা বিশ্বের কাছে এক উজ্জ্বল উদাহরণ হতে পারতাম ..."

"যারা ভারতে কৃষিনীতিগুলি রূপায়ণ করেছে তারা দেশের কৃষকদের বিপথে পরিচালিত করার অপরাধে অপরাধী। আমি শুনেছি যে ভারতের 'সবুজ বিপ্লবের' জনক স্বামীনাথনকে জাতীয় কৃষি কমিশনের প্রধান হিসাবে দেশের কৃষিনীতির খসড়া প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।"

আমি ভাস্কর সাভেকে প্রস্তাব দিলাম যাতে তিনি জাতীয় কৃষি কমিশনকে একটা খোলা চিঠি লেখেন এবং আমি জানালাম যে তাঁর সাথে গুজরাতি ভাষায় আলোচনার ভিত্তিতে তাঁর চিঠিটার ইংরেজি ভাষান্তর করে দেব। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন। পরে তাঁর সাথে বেশ কয়েকবার সাক্ষাতের ফলশ্রুতিতে খোলা চিঠিটি লিখিত হয় এবং ২৯ জুলাই ২০০৬ তারিখে জাতীয় কৃষি কমিশনের কাছে পাঠানো হয় (পরিশিষ্ট দেখুন)। চিঠির সাথে জোড়া হয়েছিল ৬টি ক্রোড়পত্র (annexure) । চিঠিটির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীকে, কৃষি মন্ত্রীকে, জাতীয় পরামর্শদাতা কাউন্সিলকে ও গণমাধ্যমগুলিতে। এই নথিপত্রগুলি আরও অনেকের কাছে ই-মেল করে পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা আবার আরও অনেককে পাঠিয়েছিলেন, যার ফলে এক বিস্তৃত ঢেউয়ের মতো তা ছড়িয়ে পড়েছিল।

সরকারি কৃষি-নীতির এক ভয়ংকর সমালোচনায় ভরা এই আট পৃষ্ঠার বিশদ চিঠিতে জরুরি ভিত্তিতে কৃষির মৌলিক পরিবর্তনের এক বাঙ্ময় আর্জি জানানো হয়েছিল। "আমি প্রত্যয়ের সাথে বলছি যে শুধুমাত্র প্রকৃতির

সাথে সাযুজ্যপূর্ণ মিশ্র জৈবচাষের মাধ্যমে ভারত সকলের জন্য সুস্থায়ীভাবে (sustainably) প্রচুর স্বাস্থ্যকর (wholesome) খাদ্য জোগাতে পারে এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্যকর মর্যাদাপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য সমস্ত রকম বুনিয়াদি চাহিদা পূরণে সক্ষম।''

স্বামীনাথন উত্তরে লিখলেন, "আমি দীর্ঘকাল ধরে আপনার কাজকে সম্মান জানিয়ে এসেছি এবং আপনার বিশদ প্রস্তাব, মূল্যবান মন্তব্য ও সুপারিশগুলির জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, আমাদের চূড়ান্ত রিপোর্টে সেগুলি বিবেচনায় রাখব।''

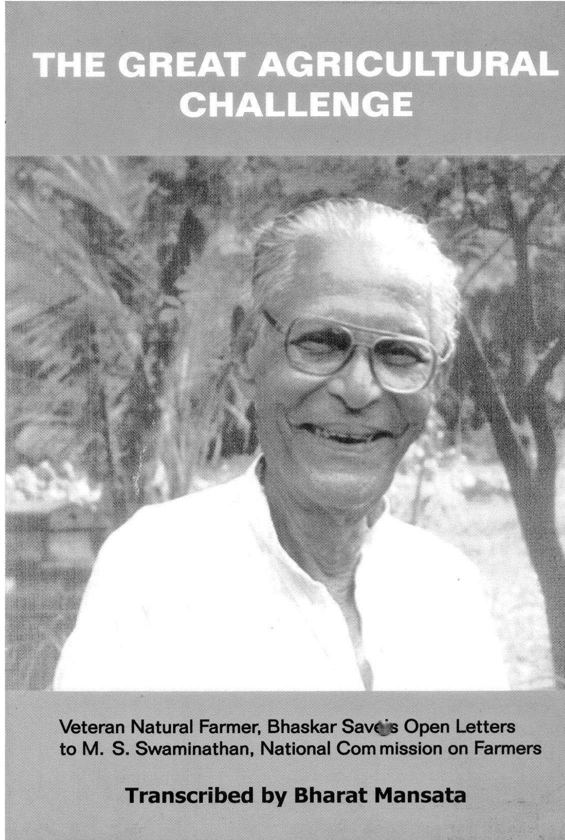
এর উত্তরে সাভে আরও মন্তব্য সহ দ্বিতীয় একটি খোলা চিঠি পাঠালেন ১৬ আগস্ট ২০০৬ তারিখে। তিনি জানালেন, যদি কোনো সংশয় বা বিরুদ্ধ মত থাকে তাহলে সে সম্বন্ধে তিনি আরও পরিষ্কার করে বলতে রাজি। কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি ৯ অক্টোবর ২০০৬-এ তাঁর তৃতীয় চিঠিটি পাঠালেন। এই চিঠিতে তিনি তাঁর প্রস্তাব বা পরামর্শগুলির সারাংশ লিখে পাঠালেন। এ প্রসঙ্গে আরও একটি নতুন চিঠি পাঠানো হল প্রধানমন্ত্রীকে।

সাভে সেই চিঠিতে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই বিশাল দেশে আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এমন সব সরকারি কৃষি দপ্তরে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোনো খামার আছে কি যা স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের জল, শক্তি (energy) ও উর্বরতার মোদ্দাভোক্তা না হয়ে স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রে এগুলির (জল, শক্তি ও উর্বরতা) মোদ্দা জোগান দেয়? কিন্তু যেখানে প্রকৃতিতে বাধাহীন দেওয়া-নেওয়া বা সহযোগিতা রয়েছে, সেখানে এমনটাই সম্ভব। বাস্তুতান্ত্রিক হিসাব রক্ষার (ecological audit) সমস্ত রকম পদ্ধতি অবলম্বন করে যাচাই করলে দেখা যাবে যে পরিবেশের স্বাস্থ্যের ওপর আমার খামারের শুধু ইতিবাচক (positive) প্রভাব রয়েছে। অর্থনৈতিকভাবেও 'আধুনিক' কৃষকদের চেয়ে আমি বহুগুণ উপার্জন করি।''

ক্রোড়পত্র সহ ভাস্কর সাভের খোলা চিঠি সাইবার স্পেসে বিস্তৃতভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতে সেগুলি অন্তত ৬টি ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং বহু কৃষকের প্রশংসা অর্জন করেছে। বহু কৃষক সংগঠন ভাস্কর সাভের মতামতকে সমর্থন জানিয়ে জাতীয় কৃষি কমিশনকে চিঠি লিখেছে। ক্রোড়পত্র সহ এই সমস্ত চিঠিপত্র ও আরও দুটি মূল্যবান দলিল 'দ্য গ্রেট এগ্রিকালচারাল চ্যালেঞ্জ' নামে একটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির প্রকাশক আর্থকেয়ার বুকস্।

২০১০ সালে এই বিশিষ্ট, উষ্ণ কৃষক — যার বয়স এখন ৮৮ বছর

—— পেলেন বিশ্বজোড়া বিশাল স্বীকৃতি। দি ইন্টারন্যাশানাল ফেডারেশন অফ অর্গানিক এগ্রিকালচারাল মুভমেন্ট —— জৈবচাষি ও তাদের আন্দোলনের বিশ্বজোড়া ছাতা সংগঠন ‘ওয়ান ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ফর লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট’ —— এই বিরল সম্মানে সাভেকে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত নিল।



২০১০ সালে `IFOAM in Action'-এর জুলাই সংখ্যায় —— যেটি জনসমক্ষে এই পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছিল —— বিবৃতি দিল, “ভাস্কর সাভে জৈবচাষের জীবন্ত গান্ধী বলে পরিচিত ... অর্ধেক শতাব্দী ধরে জৈব পদ্ধতিতে চাষ করছেন। তিনি তিন প্রজন্ম ধরে ক্ষুদ্র জৈবচাষিদের অনুপ্রাণিত করেছেন।’’

লেখাটিতে মন্তব্য করা হয় যে সাভের খামার ‘কল্পবৃক্ষ’ একটি খাদ্য-

বন (food forest) এবং এটিকে বাস্তুতন্ত্রে জল, শক্তি (energy) ও উর্বরতা প্রদানকারী (ভোক্তা নয়) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই খামার আবার কার্যকর রূপে ন্যূনতম খরচে কার্বন অপসারণ (sequestration) করে থাকে, যা দেখিয়ে দেয় যে জৈবচাষ আবহাওয়া বদল আটকাতে যথেষ্ট কার্যকর।

মাটির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য বাইরে থেকে জোগানের (input) প্রয়োজন কমানো এবং পুরোপুরি বাদ দেওয়ার (eliminating) পাশাপাশি উচ্চহারে উৎপাদন করার সক্ষমতা হল খাদ্য সুরক্ষা বৃদ্ধি করার এক মডেল। আর তার গাছ–ফসলের (tree-cropping) পদ্ধতি পোড়ো জমিকে পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে সুস্থায়ী ও লাভজনকভাবে বহু মানুষের রুটিরুজির সংস্থান সৃষ্টিতে বৈপ্লবিক ভাবে সম্ভাবনাময় বলে প্রশংসিত হয়েছে।

এই লেখাটিতে মার্কাস আরবেঞ্জ–কে (যিনি IFOAM–এর বিচারকমণ্ডলীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন — যারা পুরস্কার দেওয়ার জন্য নির্বাচিত করেছিল সাভেকে) উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছে, “তিনি বিশ্ব জুড়ে জৈব আন্দোলনে অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব”।

টীকা এবং উল্লেখিত গ্রন্থাদি

১। এই সংস্কৃত উদ্ধৃতিটি ইশাভস্যপনিষদ থেকে গৃহীত হয়েছে।
২। এই প্রথম ভারতীয় সংস্করণটি প্রকাশনার পিছনে ডঃ প্রতাপ আগরওয়াল, বসন্ত পালসিকর এবং সুজিত পট্টোয়ার্ধন বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তখন ফ্রেন্ডস্ রুরাল সেন্টার (বাসুলিয়া ও হাসেঙ্গাবাদে) ছিল প্রাণ–চঞ্চল এবং বিখ্যাত শিক্ষাবিদরা যেমন মারজরি সাইক্স (যিনি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধি—উভয়ের সাথেই কাজ করেছেন), লরী বেঞ্জামিন, টাইটাস পরিবার ও অন্যান্যরা এই সংস্থাকে সচল রেখেছিলেন।

পরবর্তীকালে আদার ইন্ডিয়া প্রেস দ্বারা 'এক তৃণখণ্ডে বিপ্লব' (One Straw Revolution) প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯২ সালে। (এবং পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল ২০ বার।) এতে মুখবন্ধ লিখেছিলেন প্রতাপ আগরওয়াল। সেখানে তিনি প্রাকৃতিক কৃষিকে নাম দিয়েছিলেন 'ঋষি ক্ষেতি' যে শব্দ–বন্ধটি আক্ষরিক ভাবে অনুবাদ করলে দাঁড়ায় ঋষির দ্বারা অনুসরণ করা (কিছু–না–করা) কৃষি।
৩। রবীন ফ্রানসিস, তদানীন্তন সম্পাদক, ইন্টারন্যাশানাল পার্মাকালচার জার্নাল এবং এম.সি. পেরেরা বিল মলিসিনকে কোর্সটি পরিচালনায় সাহায্য করেন। এই কোর্সের শেষে একটি পার্মাকালচার খামার প্রদর্শনের জন্য জাহিবাবাদের কাছে পস্তাপুরে ডেকান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির জমিতে এক ভূমি পরিকল্পনার (ground plan) নকশা প্রস্তুত করা হয়। পরে ডঃ ভেংকট, নরসিনহা ও অন্যান্যরা এই পরিকল্পনা লাগু করে তা লালন করেন।
৪। এটি ক্লাসিক বুকস্/আর্থকেয়ার বুকস্ ও ডি.আর.সি..এস.সি. (ডেভেলপম্যান্ট রিসার্চ কম্যুনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার), কোলকাতা দ্বারা যৌথভাবে প্রকাশিত হয়। আমার বহুদিনের বন্ধু অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী —তখন তিনি ছিলেন অরভিলে 'ভিলেজ অ্যাকশন গ্রুপে'র সাথে —তিনি ছিলেন 'বাস্তুতান্ত্রিক চাষ' এই বিভাগটির পরামর্শদাতা। মূল্যবান নথিপত্র (literature) পাওয়া গিয়েছিল বার্নাড ডেক্লার্কের কাছ থেকে, যিনি অরভিলে ৯৫ সালে এক জাতীয় জমায়েতের মাধ্যমে ARISE (Agricultural Renewal of India for a Sustainable Environment) নামক উদ্যোগের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। `Ecological Vision`- এর এক পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় DRSCS দ্বারা ২০০২সালে।
৫।গুজরাটি ভাষায় মূল লেখাটি লিখেছিলেন মহেন্দ্র ভাট, এবং কপিল সাহ, ১৯৮৭ সালে। এটি মানবীয় টেকনোলজী ফোরামের 'সজীব ক্ষেতি'তে

প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এটি সংক্ষিপ্ত রূপে অনুদিত হয়েছিল আমার দ্বারা যার সাথে পরিশিষ্ট হিসাবে ছিল ১৯৮৮ সালে ভাস্কর সাভের খামারে আমার প্রথম পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা।

৬। See `Tending the Earth`, Winin Pereira's Seminal treatise on `Traditional, Sustainable Agriculture inIndia,' The Earthcare Books, 1993, Reprinted in 2007.

৭। 'প্রকৃতি' নামে বোম্বের একটি এন.জি.ও এটি সংগঠিত করেন। এতে 'প্রাকৃতিক কৃষি' বিভাগটির পরিচালনা করেন শ্রী কৃষান মেটা ও 'প্রাকৃতিক যাপন ও স্বাস্থ্য' —এই অংশটির পরিচালনা করেন ডঃ বিজয়া ভেঙ্কট।

৮। আমি উইনিন পেরেরার লেখাগুলি পড়ে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম। বিশেষ করে তার `From Western Science to Liberation Tecnology`, Earthcare Books, 1993 reprinted 2006; এবং `The Otherside of History` এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি লেখা যা `Asking the Earth`-এর অন্তর্ভূক্ত। শেষোক্ত বইটি উইনিন জেরমী সীব্রুকের সাথে যৌথভাবে লিখেছিলেন যা প্রকাশিত হয়েছিল আদার ইণ্ডিয়া প্রেস দ্বারা। আর্থকেয়ার বুকস্ দ্বারা প্রকাশিত এই দুইজন লেখকের 'গ্লোবাল প্যারাসাইটিস্' ৫০০ বছর ধরে পাশ্চাত্ত অর্থনৈতিক আগ্রাসনবাদী সংস্কৃতির এক ভয়ংকর সমালোচনায় মুখর।

৯। দু'বছর ধরে কয়েক ডজন জায়গা ঘুরে আমাদের তিনজন —রামানন্দ কৌটা, ডি শেষাদ্রী এবং আমি মনোমুগ্ধকর এক বর্ষণ মুখরিত দিনে এই জায়গাটা আবিস্কার করি —শেষে এই জায়গাটা আমরা আরো বেশ কয়েকজন মিলে কিনে ফেলি। ডঃ বিজয়া ভেঙ্কট আমাদের দলের এক প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা আমাদের খুব উৎসাহিত ও সাহায্য করেছিলেন।

১০। শুরুতে আমরা প্রধানত (জঙ্গলের একটুকরো জমি পরিস্কার করে নিয়ে) বর্ষার ধান, বজরা, শাকসব্জী, তিল ইত্যাদি ফলাতাম। এর সাথে সাথে আমরা নতুন তৈরি করা পথের পাশে এবং জঙ্গল পরিস্কার করা অঞ্চলগুলির সীমানা ধরে খাদ্য ফসলের গাছ পুঁততাম যে গাছগুলিতে সেচের প্রয়োজন হয় খুবই কম অথবা শূন্য। গাছগুলি জাম, সজনে, মহুয়া, কাজু, আম, আতা ইত্যাদি। আমাদের জল চাষের প্রচেষ্টা একটু সফল হবার পর আমরা সেচ সেবিত শাক–সব্জীর চাষ শুরু করলাম এবং নির্ধারিত খন্ড জমিতে ফলগাছের চাষ শুরু করলাম, আমরা ভাস্কর ভাইয়ের কাছে অনুপ্রাণিত হয়ে সৌর মন্ডল সৃষ্টিতে লেগে গেলাম। একটি অঞ্চলে গোল করে কলা, নারকেল ও পেঁপের চারা লাগালাম। তাদের মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের

শাক–সব্জী, শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদ, ফুল ও গুল্মের চাষ করলাম।

১১। এটি অখিল গুজরাট সজীব ক্ষেতি সমাজ (বা গুজরাট জৈব চাষিদের সমাজ) দ্বারা ‘যতন’ ও অন্যান্য স্থানীয় গোষ্ঠীদের সহায়তায় সংগঠিত হয়েছিল।

অন্নপূর্ণা
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্য



২

"প্রাকৃতিক চাষের ওপর রয়েছে মা অন্নপূর্ণা — সকল জীবের অন্নদাত্রী দেবীর আশীর্বাদ'', ভাস্কর সাভে, প্রাচীন প্রাজ্ঞ সেই মানুষটি তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ শান্ত প্রত্যয়ের সাথে একথা বলে চলেছেন। মহারাষ্ট্র–গুজরাত সীমান্তের কয়েক কিলোমিটার উত্তরে সাগরপারের গ্রাম দেহরিতে তিনি অসীম মমতা দিয়ে লালন করেছেন এক অপূর্ব ফলের বাগান ও জৈব খামার।

এখানে দীর্ঘ নারকেল গাছগুলির প্রত্যেকটি এক শতাব্দী ধরে প্রতি বছরে ৩৫০টি বড়ো নারকেল দেয়।[১] একটি সবেদা গাছ আরও বেশি বছর বাঁচে। এই গাছ আদি বৃক্ষরোপণ থেকে অন্তত নয়টি প্রজন্ম ধরে তার ফল দেয়। প্রতিটি গাছ তার জীবৎকালে ৬০ টন সুমিষ্ট পুষ্টি জোগায়।[২] এই রকম প্রয়োজনীয় গাছের হাজার হাজার প্রজাতি এদেশের বিচিত্র পরিবেশ–পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিয়ে বেড়ে ওঠে। প্রকৃতি যেখানে বদান্যতায় এমন মহানুভব সেখানে আমাদের লোকজন কেন খাদ্যাভাবে অথবা কোনো বুনিয়াদি চাহিদার অভাবে ভুগবে? — ভাস্কর সাভে এই প্রশ্ন তুলেছেন।

কল্পবৃক্ষ

১৪ একর জুড়ে সাভের সবুজ বাগিচা–খামার কল্পবৃক্ষের প্রবেশদ্বারে উজ্জ্বল নীল ও সাদা সাইনবোর্ডে লেখা "সু–স্বাগতম'' — মঙ্গলময় আহ্বানের জন্য ভারতের ঐতিহ্যগত অভিবাদন। ভিতরে প্রবেশ করেই যে কেউ অনুভব করবে জায়গাটার বিশেষত্ব। এ যেন এক স্নিগ্ধ মলম যার আলতো ছোঁয়ায় আমাদের সময়ের অস্থিরতা ও দুঃসহ ক্লান্তি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

প্রবেশদ্বার থেকে প্রায় কুড়ি পা দূরে একটি বোর্ডে সাইন বলছে 'সহযোগিতাই প্রকৃতির মৌলিক নিয়ম' — প্রাকৃতিক কৃষির দর্শন ও প্রয়োগের এক সহজ ও সংক্ষিপ্ত সূচনা। খামারের আরও ভিতরে রয়েছে অন্যান্য অসংখ্য সাইন, সেগুলিতে লেখা সংক্ষিপ্ত চিন্তা–উসকে দেওয়া সূত্র বা জ্ঞানগর্ভ[৩] বাণীগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই তীক্ষ্ণ প্রবাদগুলিতে

রয়েছে প্রকৃতি, কৃষি, স্বাস্থ্য ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের নির্যাস যা অসাধারণ খাদ্য ফলানো ছাড়াও ভাস্করভাই সংগ্রহ করেছেন বহুবছর ধরে।।

আপনি যদি এই কৃষককে জিজ্ঞাসা করেন, কোথা থেকে তিনি এই প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি শিখলেন, তিনি হয়তো অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলবেন, “আমার খামারই আমার বিশ্ববিদ্যালয়”, তাঁর খামার আজ বহু মানুষের কাছে হয়ে উঠেছে এক পবিত্র বিশ্ববিদ্যালয়। কারণ প্রতি শনিবার বিকালে (দর্শনার্থীদের দিন) অসংখ্য মানুষ এখানে আসেন।[৪] সারা দেশ থেকে আসা মানুষজনের মধ্যে থাকেন কৃষক, কৃষি–বিজ্ঞানী, ছাত্র–ছাত্রী, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, শহরের মানুষজন, আবার কখনও বা দূর দেশ থেকে আসা ভ্রমণার্থী —— যারা ভাস্কর সাভের কাজ প্রসঙ্গে পড়েছে বা শুনেছে।



প্রথম সূত্র সাইন, “সহযোগিতাই প্রকৃতির মৌলিক নিয়ম।”

কল্পবৃক্ষ আমাদের আকৃষ্ট হতে বাধ্য করে, কারণ উচ্চ–উৎপাদনে এটি রাসায়নিক ব্যবহারকারী যে কোনো আধুনিক খামারকে অনায়াসে পিছনে ফেলে দেয়। যে কোনো সময়ে তা সহজেই দেখা যায়। প্রতিটি গাছ যে সংখ্যক নারকেল দেয়, সম্ভবত তা সারা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। যেখানে প্রতিটি গাছের গড় উৎপাদন বছরে প্রায় ৩৫০টি, কয়েকটি গাছের প্রতি বছরে ৪০০টিরও বেশি। সবেদা গাছগুলির (যাদের বেশিরভাগই পোঁতা হয়েছিল ৪০ বছরের আগে) ফলন তেমনি প্রচুর। প্রতিটি গাছ বছরে গড়ে প্রায় ৩০০ কেজি সুস্বাদু ফল দেয়।



এছাড়া বাগিচায় রয়েছে অসংখ্য কলা, পেঁপে, সুপুরি গাছ এবং কিছু খেজুর, সজনে, আম, কাঁঠাল, তাল, আতা, জাম, পেয়ারা, ডালিম, লেবু, মহুয়া, তেঁতুল, নিম, পোমেলো ইত্যাদি ফলের গাছ। এছাড়াও রয়েছে কিছু বাঁশঝাড় সহ বিভিন্ন ছোটো গুল্ম। যেমন ক্রোটন, কারিপাতা, তুলসি এবং লতানো গাছ যেমন গোল মরিচ, পানপাতা, প্যাশান ফ্রুট ইত্যাদি।

দু–একর জমিতে নবাবি কলমের এক লম্বা, সুস্বাদু ও উচ্চফলনশীল দেশজ প্রজাতির ধান, বেশ কয়েক ধরনের ডাল, শীতের গম ও কিছু সবজি এবং কন্দও চাষ হয় ঋতুর আবর্তন অনুযায়ী। এই স্ব–পোষিত কৃষকের নিজ পরিবার ও কখনও সখনও অতিথিদের জন্য এই উৎপাদন যথেষ্ট। (বর্তমানে এই পরিবারে দুজন নাতি–নাতনি সহ সদস্য সংখ্যা ৭, ভাস্কর সাভের দুই বড়ো নাতনি বিবাহিত এবং তাঁরা প্রত্যেকেই পরিবারে একটি করে পুতি দিয়েছেন।) বেশির ভাগ বছরেই চাল উদ্বৃত্ত হয়, যা দেওয়া হয় আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের, যারা এই চালের সুগন্ধ ও গুণের প্রশংসা করে।[৬]

ভাস্কর সাভের খামারে বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদরাজি ঘন গাছপালার এক সাযুজ্যপূর্ণ মিশ্র জনগোষ্ঠীর মতো সহাবস্থান করে। খামারে কোথাও দেখবেন না যে এক টুকরো জমি বাতাস, বৃষ্টি ও রোদের বাড়ি খাওয়ার জন্য উন্মুক্ত হয়ে আছে। সবেদা গাছগুলির নিচে ঘন ছায়ায় ঢাকা মাটির উপরে আছে স্পঞ্জের কার্পেটের মতো পাতার আচ্ছাদন। যেখানে সূর্যের আলো প্রবেশ করে সেখানে গজিয়ে ওঠে বিভিন্ন আগাছা।



কল্পবৃক্ষ : যে গাছ ইচ্ছা পূরণ করে

নারকেল গাছ (কোকোস নুসিফেরা) হল সৌভাগ্যের প্রতীক। এই গাছ ভারতে এক পবিত্র গাছ হিসাবে শ্রদ্ধা পায়, যা ইচ্ছা পূরণ করে। দেবদেবীদের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগের উদ্বোধন করা হয় নারকেল ফাটিয়ে। ভারতীয় লোক কাহিনিতে এই গাছকে কেন্দ্র করে রয়েছে অনেক কল্পকথা, যেগুলি এই গাছের সাথে যুক্ত মহৎ সাংস্কৃতিক মূল্যকে প্রকাশ করে।

নারকেল গাছের প্রতিটি অংশই মূল্যবান। ঝুনো নারকেলের শাঁস অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য। এটিকে একটি সম্পূর্ণ (perfect) খাবার বলা হয়।[৫] নারকেল কোড়া ব্যবহৃত হয় নানারকম মিষ্টি তৈরি ও তরকারি সহ অন্যান্য রন্ধন প্রণালীতে। কচি নারকেল বা ডাবের স্বচ্ছ জল সুস্বাদু, স্নিগ্ধ ও প্রাণ সঞ্জীবনী টনিকের মতো, যার সমৃদ্ধ খনিজ শরীরে সহজে শোষিত হয়। এই জল শরীর থেকে বিষ বের করে দেওয়ার ক্ষেত্রে দারুণ কার্যকর। এটি খালি পেটে পান করা সবচেয়ে ভালো। পেটের অসুখ হলে এটি সবচেয়ে ভালো পথ্য।

নারকেলের শুকনো শাঁসে রয়েছে প্রচুর তেল যা সাধারণত রান্নায় ব্যবহার করা হয়। আবার তা সাবান, চুলের তেল, প্রসাধনী ও শ্যাম্পু প্রস্তুতেও ব্যবহৃত হয়। নারকেল ছোবড়া থেকে দড়ি, মাদুর, ঝুড়ি ও ব্রাশ তৈরি করা হয়। কিন্তু আরও বেশি ব্যবহৃত হয় গ্রামীণ কুটিরে ছাদ তৈরিতে যা জল নিরোধক ও সস্তাও বটে। যখন গাছটি মারা যায় তার কাণ্ডের কাঠ থেকে তৈরি হয় বাড়ির আসবাব। আর তার মূল মাটির অসংখ্য পোকামাকড়দের পুষ্টি জোগায় এবং মাটির পুষ্টি-চক্রকে চলমান রাখে।

ঘন এই আচ্ছাদন মাটির অনু–জলবায়ু (micro-climate) সৃষ্টিতে এক চমৎকার নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। ভাস্কর সাভে মনে করেন, এটা কৃষি কাজের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। "গ্রীষ্মের এক তপ্ত দিনে, গাছপালার ছায়া অথবা পাতার আচ্ছাদন ভূপৃষ্ঠে ঠান্ডা ও স্যাঁতসেঁতে ভাব (damp) বজায় রাখে। শীতের শীতল রাতগুলিতে মাটির এই আচ্ছাদন সারাদিন ধরে পাওয়া মাটির উষ্ণতা কম্বলের মতো ধরে রাখে। ঘন গাছপাতার ছাতার নিচে আর্দ্রতাও থাকে অনেক বেশি, ফলে বাষ্পীভবনও হয় অনেক কম। স্বভাবতই সেচের প্রয়োজনও অনেকাংশে কমে যায়। এরকম একটা পরিবেশে মাটির পোকামাকড় ও অসংখ্য জীবাণু দ্রুত বেড়ে ওঠে।



সবেদা গাছের ছায়ায় শুকনো পাতার আচ্ছাদন; যেখানে মাটিতে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে সেখানে আগাছার (সজীব আচ্ছাদন) জন্ম হয়।

প্রকৃতির খননকারী এবং পুষ্টি নির্মাতারা

এক শতাব্দী আগে চার্লস ডারউইন কোনো কারণ ছাড়া একথা ঘোষণা করেননি যে পৃথিবীর ইতিহাসে কেঁচো যে ভূমিকা পালন করে তা অন্য কোনো জীব পালন করে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে।[৭] ভাস্কর সাভে দৃঢ়তার সাথে বলেন, "একজন কৃষক যিনি কেঁচো ও মাটিতে বাস করা অন্যান্য ক্ষুদ্র জীবদের বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে সমৃদ্ধির পথে ফিরে এসেছেন।"

অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে, বেশি গরম ও বেশি শীত থেকে সুরক্ষিত, জীবভরের

(bio-mass) প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ, ভালো বায়ু চলাচল করে এমন মাটি হল কেঁচোর বৃদ্ধির পক্ষে আদর্শ, এই অক্লান্ত কর্মীরা মাটি সহ ঝুরঝুরে বর্জ্য পাতার মতো জৈব পদার্থ খেয়ে হজম করে আর প্রতি ২৪ ঘন্টায় তাদের শরীরের ওজনের দেড়গুণ সমৃদ্ধ কম্পোস্ট সার সৃষ্টি করে যার মধ্যে উচ্চমাত্রায় উদ্ভিদের সমস্ত রকম পুষ্টির উপাদান রয়েছে।

ভর্মি–কম্পোস্ট বা কেঁচোসার হল উর্বরতার ভাণ্ডার। সংলগ্ন অন্য আদি–মাটির (parent soil) তুলনায় কেঁচোর মলে থাকে দ্বিগুণ ম্যাগনেসিয়াম, ৫ গুণ নাইট্রোজেন, ৭ গুণ ফসফরাস ও ১১ গুণ পটাশ।[৮] এছাড়া আশপাশের অন্য মাটির তুলনায়, বিশেষত যেখানে রাসায়নিকের ব্যবহার করা হয়েছে, তার চেয়ে কেঁচোর মলে ব্যাকটেরিয়ার জনসংখ্যা থাকে প্রায় ১০০ গুণ বেশি।[১০]



গাছের পাতার আচ্ছাদনের নীচ থেকে কেঁচোর মল–সার।

ভাস্কর ভাইয়ের হিসাবে প্রতি একর জমিতে প্রতি বছর কেঁচোরা অন্তত ছয় টন পুষ্টিকর কার্স্টিং (মল) সার দেয়।[১০] আর এটি হল উঁচু মানের জৈব সার যা চাষিরা পয়সার অভাবে কিনতে পারে না — এই কেঁচো সারে অধিক সংখ্যক উপকারী ব্যাকটেরিয়া ও অ্যাকটিনো মাইসিটিস ছাড়াও রয়েছে বহু রকমের উৎসেচক। প্রথম বৃষ্টির পরে বিশেষত সোঁদা মাটি থেকে যে সুগন্ধ বের হয় তা আসলে সূক্ষ্ম জীবাণু, অ্যাকটিনো মাইসিটিসদের শরীর থেকে নির্গত হয়। ঠিক এই সময়েই অসংখ্য কেঁচো তাদের রেশম–গুটি থেকে বেরিয়ে আসে।

কেঁচোরা কুরে কুরে মাটি খায় এবং তা করতে গিয়ে তারা নিপুণভাবে মাটিকে খনন করে, ফলে মাটি হয় ঝুরু ঝুরু (porous)। এর ফলে মাটিতে

বায়ু ও ভাসমান জলকণা ধারণ করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। মাটির এই গুণগুলি গাছের শিকড়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেঁচোর মল–বর্জ্যে (castings) খুব ভালো বায়ু চলাচল করে। এগুলি খুব ভালো জল শোষণ করে, আবার অতিরিক্ত জলও বের করে দিতে পারে। এরা একটি সুস্থির সমষ্টির (stable aggregate) সৃষ্টি করে যাতে মাটি–কণাগুলি একে অপরকে ঘনসংবদ্ধভাবে আঁকড়ে থাকে আর ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ করে।[১১]

মাটিতে বাস করা আরও অনেক জীব যেমন পিঁপড়ে, উই ও বহু প্রজাতির জীবাণু অনুরূপভাবে মাটির ভৌত প্রস্তুতিতে (Physical Conditioning) এবং উদ্ভিদের পুষ্টিচক্রকে সাহায্য করে। কল্পবৃক্ষের মতো প্রাকৃতিক খামারের প্রতি বর্গফুট মাটিতে রয়েছে এরকম অসংখ্য সহযোগী জীব। (দেখুন : কেঁচো ও সজীব মাটি, পৃষ্ঠা ৪৮)

অবশ্য পোকাদের সেনাবাহিনীকে দিয়ে তিনি তাঁর জন্য কাজ করাতে পারেন —— এমন কোনো দাবি ভাস্কর সাভে করলেন না। তিনি বললেন, ‘‘এটা হয় প্রাকৃতিক ভাবে’’, ‘‘সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল এটা ঘটতে দেওয়া। তার জন্য যা দরকার তা হল —— রাসায়নিক সার বা কীটনাশক, অতিরিক্ত খনন বা খুব বেশি সেচ ইত্যাদি ক্ষীণ–দৃষ্টি সঞ্জাত প্রযুক্তি ব্যবহার থেকে বিরত থাকা।’’

আধুনিক কৃষির ব্যবহারিক প্রয়োগ মাটির জৈব জীবনের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। রাসায়নিকের বিষের প্রভাবে বহু রকমের খননকারী জীব মারা যায় অথবা ট্রাক্টরের ভারী ওজনের নিচে পিষে যায়। এর ফলে মাটির জলধারণ ক্ষমতা কমে গিয়ে ও মাটিতে বায়ু চলাচলের অভাব ঘটে মাটি শক্ত ও জমাট হয়ে গেছে। এই সমস্যা আরও ঘনীভূত হয় জল নিষ্কাশনের অভাবে ভূতল লবণাক্তকরণের জন্য।

মাটির প্রাকৃতিক উর্বরতা ধ্বংস করে, আমরা কার্যত আরও বেশি করে বাহ্যিক জোগান (external input) ও আমাদের জন্য বেশি শ্রমের কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করি, অথচ এগুলির ফল হয় নিম্নমানের এবং এগুলি সবদিক থেকেই বেশি খরচ সাপেক্ষ। ভাস্কর সাভে জোরের সঙ্গে বলেন, ‘‘সজীব মাটি হল এক জৈব ঐক্য (organic unity) আর তাই জীবনের বিস্তৃত জালকে (Web of life) তার সমগ্রতায় রক্ষা ও লালন করতে হবে। প্রাকৃতিক কৃষিই সেই পথ।’’

আগাছা : বুনো বন্ধুরা

“প্রকৃতিতে প্রতিটি দীন (humble) জীব ও উদ্ভিদ বাস্তুতন্ত্রের কর্মকাণ্ডে তার ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি জীবই খাদ্য–শৃঙ্খলের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোনো প্রজাতির নিষ্কাশিত বর্জ্য পদার্থ হল অন্য কোনো প্রজাতির খাদ্য। মৃত্যুর পরেও প্রতিটি জীব, খসে পড়া পাতা অথবা শুকনো ঘাসের পাতা (blade) পিছনে ফেলে রেখে যায় পুষ্টি–চক্রে তার অবদান, যাতে নবজীবন প্রসার লাভ করে।’’ তাই ভাস্কর ভাইয়ের আর্জি হল — যদি সত্যিই আমরা বাস্তুতন্ত্রের সাযুজ্য ফিরে পেতে চাই, তাহলে প্রথম নীতিটি যা আমাদের অবশ্যই পালন করতে শিখতে হবে তা হল “বাঁচো এবং বাঁচতে দাও’’।

“যেহেতু প্রকৃতির বিধানে প্রতিটি উদ্ভিদকে তার সাথে মাটি ও মাটিতে বাস করা জীবদের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কিছু নির্ধারিত কাজ করে যেতে হয়, যাদের আমরা অবাঞ্ছিত আগাছা বলে মনে করি তাদের উপড়ে ফেলার আগে আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভাবতে হবে। বিশেষ করে রাসায়নিক ছিটানো ও ভারী ট্রাক্টরের ব্যবহার ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপগুলি সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করতে হবে।’’ কল্পবৃক্ষে অপ্রয়োজনীয় কাজে কোনো শ্রমই নষ্ট হয় না, এমনকী হাতে করে আগাছা উচ্ছেদের কাজও। যদি কখনও এই আগাছাগুলি নতুন চারাদের ঢেকে দিয়ে তাদের সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত করে, সেগুলি ছেঁটে ফেলে মাটির ওপর আচ্ছাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে। যান্ত্রিক খননের চেয়ে হাতে করে আগাছা উচ্ছেদে মাটির জৈবজীবন কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবুও তা না করলেই ভালো। অন্যদিকে আগাছা ভূতল থেকে বেশি বৃদ্ধি পেলে তাকে উচ্ছেদ না করে, মূলগুলির ক্ষতি না করে, যদি তা কেটে মাটিতে ফেলে রাখা হয়, তা ‘আচ্ছাদনের’ মতো কাজ করে যা থেকে মাটি অসংখ্য উপায়ে উপকৃত হয়।

মাটির ওপরে আচ্ছাদন থাকলে বাতাস ও বৃষ্টির দ্বারা মাটির ক্ষয় কম হয়, মাটি জমাট ও শক্ত হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচে, বাষ্পীভবন হয় কম এবং সেচের প্রয়োজনও কমে যায়। এই আচ্ছাদনের ফলে মাটিতে বায়ু চলাচল হয় বেশি, জলকণাও বেশি শোষিত হয় এবং মাটি হয় তাপ ও শীত নিরোধক। আচ্ছাদন কেঁচো ও জীবানুদের খাদ্য সরবরাহ করে যাতে ফসলের জন্য নাইট্রোজেন–সমৃদ্ধ কম্পোস্ট দিতে পারে। এছাড়া যেহেতু আগাছাদের মূলগুলি মাটিতে থেকে যায়, সেগুলি মাটিকে বেঁধে রাখার কাজ চালিয়ে যায় এবং ভূতলের আচ্ছাদনের মতো মাটিতে মিশে গিয়ে খাদ্য

হিসাবে মাটিতে বাস করা জীবদের সেবা করে।

ভাস্করভাই উল্লেখ করলেন যে গাছ ফসলের আধুনিক উৎপাদনে আগাছা–দের প্রতি এক ভয়ংকর বিরূপ ধারণা বর্তমানে রয়েছে। তার উৎস রয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অতীতে। শীতলতর বা নাতিশীতোষ্ণ (temperate) আবহাওয়ায় মাটিতে ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যা থাকে অনেক কম এবং তাদের সক্রিয়তাও হয় অনেক কম। ফলে সেখানে মাটিতে উদ্ভিদের অবশেষের (residual matter) পচন ঘটে অনেক ধীর গতিতে। একারণেই সময়ের নিয়মিত ব্যবধানে (periodically) মাটিতে জৈববস্তুর এক তন্তুজ আসনের পূর্ণ সৃষ্টিতে আগাছা ও পাতার আচ্ছাদনের অপরিসীম গুরুত্বকে বেশিরভাগ ইংরেজ বুঝতে অক্ষম ছিল। তারা এটা বুঝতে অক্ষম ছিল যে আমাদের মতো গরম ও বিপুল বৃষ্টির দেশে ভূমিক্ষয় রোধে আগাছা ও পাতার আচ্ছাদনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

যেসব ঔপনিবেশিক (ব্রিটিশ) বনকর্মীদের ভারতে পাঠানো হত, তাদের বৃক্ষরোপণের এমন এক ধরনের প্রবণতা ছিল যাতে তারা সেগুন ইত্যাদি (দু)এক রকমের (monocultural) গাছ সারিবদ্ধভাবে রোপণ করত। এভাবেই বৃক্ষ–ভূমিখণ্ডগুলিকে (treeplots) পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত করে রাখার এক বিদেশি ধারণার উদ্ভব হল। ভুলবশত মনে করা হল, আগাছাগুলি তাদের অর্থনৈতিক ফসলগুলির (economic crops) প্রতিযোগী।[১২]

আগাছাদের বেশিরভাগ ‘পুষ্টি’, বস্তুত সমস্ত উদ্ভিদেরই বেশিরভাগ পুষ্টি আসে বাতাস ও জলীয় বাষ্প থেকে। মাটি থেকে পাওয়া খনিজগুলি হল গাছের সমস্ত ওজনের মাত্র ৫%।[১৩] এগুলির জন্য কোনো প্রতিযোগিতার সমস্যা হয় না। কারণ প্রকৃতি এমন নির্বোধ নয় যে সে এমন আগাছার প্রজাতি নির্বাচন করবে যাতে সেই আগাছার জন্য যে মাটি বাছা হয়েছে, তাতে সেই মাটি তার খনিজের চাহিদা মেটাতে পারে না, আর যেহেতু আগাছারা (গাছের) তুলনায় খর্বাকৃতি, তাদের মূলগুলিও তুলনামূলকভাবে অগভীর এবং তারা স্বল্পজীবী। তারা দীর্ঘকায় গভীরতর মূলের দীর্ঘজীবী গাছেদের বৃদ্ধিতে কোনো বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। (দেখুন : আগাছারা মাটির আদি সন্তানসন্ততি, পৃষ্ঠা ৫১)

কল্পবৃক্ষে পাওয়া যায় এমন কিছু তথাকথিত আগাছা, যেমন কৌচা, ধঞ্চে, ইক্কডু ইত্যাদিরা শুঁটি (leguminous) জাতীয় উদ্ভিদ। (শেষের দুটি সেসবানিয়া পরিবারের উদ্ভিদ প্রজাতির।) অন্যান্য শুঁটি জাতীয় গুল্ম ও গাছেদের সাথে এগুলি নাইট্রোজেন জোগানের এজেন্ট। এদের মূলের

গোঠে (nodule) কোটি–কোটি বিশেষ ধরনের রাইজোবিয়া (এক ধরনের ব্যাক্টেরিয়া) থাকে, যারা বাতাসের নাইট্রোজেন 'ফিক্স' করে মাটিতে চালান দেয়। একারণেই ঐতিহ্যগত জমি–ফসল আবর্তন ব্যবস্থায় (field-crop rotation system) প্রায় সব সময় দুটি 'নাইট্রোজেন ভোগী' (nitrogen consuming) দানা ফসলের মধ্যবর্তী ফসল হিসাবে 'নাইট্রোজেন সরবরাহকারী' কোনো শুঁটি (leguminous) ডালকে অন্তর্ভুক্ত করা হত।

ভাস্কর সাভে বললেন, "এমনকী যদি কিছু আগাছা বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ফসলকে ঢেকে ফেলার উপক্রম হয়, আগাছা নিয়ন্ত্রণের আধুনিক পদ্ধতিগুলি নিছক পাগলামি।' যতই হোক আমাদের মাথার চুল যদি খুব বাড়ে, আমরা মোটেই চুল উপড়ে ফেলি না, আবার তার ওপর বিষও ছেটাই না। আগাছার ক্ষেত্রেও তাই। এক্ষেত্রে সুস্থতর উপায় হল যেখানে প্রয়োজন সেখানে তাদের ছেঁটে ফেলে নিয়ন্ত্রণ করা।''

বহুতল, বহুকাজ (Multistorey, Multifunction)

বাগিচা অঞ্চলে (orchard area) মাটিকে ঢেকে রাখা আগাছারা গাছপালার নিম্নতম তল (lowest storey) সৃষ্টি করে। এর ওপরে আছে কারিপাতা ও ক্রোটনের মতো অসংখ্য গুল্ম। বাগিচার রাস্তার ধার জুড়ে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ক্রোটন। নানাবিধ গোল ও ডোরা দাগে ভরা ক্রোটন প্রজাতির মূলগুলি তুলনামূলকভাবে অগভীর। এই গুল্ম জল মাপার যন্ত্রের (water meter) মতো কাজ করে। মাটিতে আর্দ্রতা (বা জলকণা) কমে এলে এই গুল্মের পাতারা ঝিমিয়ে পড়ে।

কারিপাতা গুল্মগুলি বিভিন্ন প্রজাতির ফসলভূক পতঙ্গদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। পাশাপাশি এই পাতা সারা ভারত জুড়ে রান্নায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। শুধুমাত্র এই অপ্রধান ফসল থেকে ভাস্কর সাভে প্রতি মাসে ন্যূনতম ২৫০০ টাকা রোজগার করেন, যাতে খরচ হল শূন্য (এমনকী পাতা তোলা ও আঁটিতে বাঁধবার কাজটি ক্রেতারাই করে)।

বাগিচার এখানে সেখানে যে কেউ দেখতে পাবে লতানো গাছ কোনো কিছু অবলম্বন করে ওপরে উঠেছে। যেমন গোলমরিচ বা পানপাতার লতা সর্পিল মালার মতো সুপুরি গাছ জড়িয়ে আছে অথবা আবেগ ফল (passion fruit) –এর লতা গোলাকার বাঁক খেয়ে ফাঁকা মাটিতে এগিয়ে চলেছে, এগুলি থেকে অতিরিক্ত কিছু বোনাস পাওয়া যায়।

মধু হল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান উৎপাদন, যার রয়েছে উচ্চমূল্যের

ঔষধি গুণ। এই বাগিচায় মৌমাছি প্রতি বছরে অনেক কিলো মধু দিত। তা



একটি বহুতল ব্যবস্থায় বৃক্ষ, লতা, ছোট গাছ
ও গুল্মরাজি সুসংহতভাবে সহাবস্থান করে।

পাওয়া যেত বিনা খরচে ও মনুষ্যশ্রম ছাড়াই। এই ছোট্ট কর্মচঞ্চল প্রাণীরা বাগিচায় পরাগ মিলনের দেখভাল করে যা ফল ফলানোর জন্য প্রয়োজন।[১৪] দূর্ভাগ্যজনকভাবে এদের সংখ্যা সারা পৃথিবী জুড়ে ভীষণভাবে কমে গেছে। আশপাশের অঞ্চলের চাষিদের দ্বারা ছেটানো বিষাক্ত রাসায়নিকের পাশাপাশি নিকটবর্তী শিল্পগুলির ও পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দূষণ সাভে–র খামারে মৌমাছির সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ বলে সন্দেহ করা হয়।

নারকেল নার্সারির জন্য ও ধানের খেতের জন্য ২ একর বাদ দিলে অবশিষ্ট ১২ একর জমিতে ফলের বাগিচা ধারাবাহিকভাবে বছরের ১৫০০০ কেজি ফল দিয়ে এসেছে। (গত ১৫–২০ বছর ধরে এই অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে শিল্পায়নের অগ্রগতির ফলে এই উৎপাদন কমেছে), পুষ্টিগত মূল্যে এই ফল পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও ভারতের অন্য অনেক অংশে বিষাক্ত রাসায়নিকের নিবিড় ব্যবহারে উৎপাদিত সম ওজনের খাদ্যের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট।

ভাস্কর সাভে স্মরণ করালেন, মায়ের বুক থেকে স্বাস্থ্যকর (wholesome) দুধ পান করার জন্মগত অধিকার রয়েছে সমস্ত শিশুর। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমাদের লালসা ভরা আধুনিক চাষ, লাগামহীন শিল্পায়ন ও ভোগবাদী সংস্কৃতি মা বসুন্ধরার জীবন–রক্ত (life-blood) ও মাংস ভক্ষণ করছে। তাহলে আমরা তার কাছ থেকে ক্রমাগত পুষ্টি পাওয়ার আশা করি কীভাবে?



সাভের খামারে মৌমাছির বাক্স



কেঁচো ও সজীব মাটি

ছোট্ট কেঁচো হল প্রকৃতির লাঙল আর তার মল হল একাধারে উর্বরতার ভাণ্ডার, অনু-বাঁধ (micro-dam) এবং বায়ু-ঘর (aeration chamber)। শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে এগুলি সৃষ্টি করতে গেলে অবশ্যম্ভাবীভাবে যে ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে প্রাকৃতিক এইসব কর্মকাণ্ডে তাদের ছিটেফোঁটাও থাকে না।

সাভে বলেন, “যদি রাসায়নিকের ব্যবহার, কর্ষণ (tillage) ও আগাছা নাশ করা — ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং মাটিকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে গাছ-পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় তাহলে দু-বছরের মধ্যেই প্রতি একরে ৩০০,০০০ থেকে ৪০০,০০০ কেঁচোর আবির্ভাব হবে। ভূমিক্ষয়, কৃষি-রাসায়নিক, ভারী কর্ষণ ও অতিরিক্ত সেচের দ্বারা মাটির ভীষণ ক্ষতি না হয়ে থাকলে, কথাটি সমস্তরকম মাটির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

রান্নাঘরের আবর্জনা, পাতা ও খড়ের আচ্ছাদন ইত্যাদির মতো জৈবসার ব্যবহারে কেঁচোর বৃদ্ধি ঘটে আরও তাড়াতাড়ি। মাঝে মধ্যে জল দিলে তা মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু অতিরিক্ত সেচ দেওয়া হলে এবং জল নির্গমনের বা বেরিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া (drainage) যদি দুর্বল হয়, তাহলে মাটিতে জল জমে থাকে যা মাটি থেকে বাতাস বের করে দিয়ে পোকামাকড়দের শ্বাসের ব্যাঘাত ঘটায় ও তাদের বৃদ্ধিতে বাধা দেয়, ফলে মাটির স্বাস্থ্যহানি হয়।

“স্থানিক, দেশজ কেঁচোই কোনো খামারে সবচেয়ে ভালো খাপ খাওয়াতে পারে। কারণ তারা সেখানকার আবহাওয়া ও মাটির অবস্থার সঙ্গে সহাবস্থান করে, খাপ খাওয়াতে অভ্যস্ত। বিদেশি প্রজাতি দ্বারা

প্রস্তুত কেঁচোসার অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং যেহেতু তাদের দূরবর্তী কোনো জায়গায় নির্বাচন করে (selectively breed) সৃষ্টি করা হয়, সেহেতু অন্য কোনো জায়গায় তাদের গুটি থেকে কতগুলি কেঁচো বেরিয়ে আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই এবং তাদের সংখ্যা কতটা বৃদ্ধি পাবে অথবা অচেনা মাটিতে সেই অঞ্চলের পোকামাকড়দের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেতে ও কাজ করতে তারা কতটা সক্ষম হবে তারও কোনো স্থিরতা নেই।''

যদি কেউ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যে তার খামারে ইতিমধ্যেই কীটনাশকের ব্যবহারে বেশিরভাগ কেঁচো মারা গেছে, সেক্ষেত্রে ভাস্কর সাভের পরামর্শ হল স্থানীয় কোনো বটগাছ বা তেঁতুল গাছের গোড়া থেকে কিছুটা মাটি এনে তা আপনার খামারে ফেলুন আর সেখানে কেঁচো চাষ করুন। বৃষ্টির শুরুতে সেই মাটিতে তাদের গুটি থেকে প্রচুর সংখ্যক কেঁচো বের হবে।

খনিজ পুষ্টি সরবরাহের থেকেও আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা কেঁচো করে তা হল তার খনন কাজ। এই কাজ সবচেয়ে বেশি হয় বর্ষার মাসগুলোতে যখন মাটি জলে সম্পৃক্ত থাকে। বিশেষ করে এই ঋতুতে কেঁচো বাতাস থেকে অক্সিজেন পাওয়ার জন্য প্রতিদিন বহুবার মাটির ওপরে উঠে আসে। (তারা শরীর দিয়ে অক্সিজেন শোষণ করে) এবং তারা ভূতলে তাদের বর্জ্য (castings) ছেড়ে যায়। যখন কেঁচো মাটির ওপরে ওঠে, প্রতিবারই এটি মাটিতে সুরঙ্গের মতো এক গর্ত তৈরি করে। কেঁচো গোলাকারে ঘুরে 'ড্রিল' করে না, বরং লম্বালম্বিভাবে গুঁতিয়ে বা 'পাঞ্চ' করে ওপরে ওঠে। এর ফলে মাটিতে থাকা অসংখ্য জীবন্ত মূলতন্ত্রগুলির কোনো ক্ষতি হয় না।

ভাস্কর সাভে আরও বললেন, "কেঁচো তার বর্জ্য নিষ্কাশন করে তার লেজের শেষাংশ দিয়ে, তাই মাটির ওপরে বর্জ্য নিষ্কাশন করতে হলে তাকে তার শরীরটাকে সম্পূর্ণভাবে মাটির ওপরে তুলতে হয়। শিকারী পাখিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য সে সতর্কতার সাথে শরীরটাকে নিয়ে আধ ইঞ্চি মাটির ওপরে ওঠে, তারপর শরীরটাকে গোল করে বাঁকিয়ে সংলগ্ন মাটিতে আবার গুঁতিয়ে 'পাঞ্চ' করে আর একটি গর্ত করে পিছনে ফেরার রাস্তা তৈরি করে। বাতাসের স্পর্শে আসার সময় কেঁচো সারা শরীর দিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ করে; লেজের দিক দিয়ে সে আবার মাটিতে প্রবেশ করার আগে ভূতলে বর্জ্য ছেড়ে যায়।

যদি ধরা যায় একটি কেঁচো প্রতি ২৪ ঘন্টায় ১০ বার ওঠা এবং ১০ বার নামায় ২০টি সুড়ঙ্গ তৈরি করে, তাহলে ১ একরে ৪০০০০০ কেঁচো এবং ৩ মাসের বর্ষায় ৭২ কোটি ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করে। তাহলে এইরকমভাবে লালিত খামারে মাটির খনন (tillage) নিয়ে চাষির ভাবনার কি কোনো কারণ আছে?

কেঁচোরা যখন মাটি খোঁড়ে, তারা সারাক্ষণ শ্লেষ্মায় (mucus) ধুয়ে যায়। এই শ্লেষ্মা তাদের কঠোরতম মাটিতে প্রবেশ করতে বা চলাচল করতে সাহায্য করে। ক্রমাগত ঘর্ষণে এই শ্লেষ্মা সুড়ঙ্গের দেওয়ালে সিমেন্টের মতো মাটিকে শক্ত করে ধরে রাখে এবং ভূমিক্ষয় রোধ করে। গ্রীসের ধ্রুপদি যুগে অ্যারিস্টটল কেঁচোকে মাটির অন্ত্র (guts) বলে অভিহিত করেছিলেন। কারণ চলার পথে এটি মাটির কণাগুলি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কণাতে পরিণত করে। এই ক্ষুদ্র কণাগুলি কেঁচোর অন্ত্রের রসে জারিত হয়ে ঘন, সংবদ্ধ, স্থায়ী কণা–সমষ্টিতে পরিণত হয়।

কেঁচোর বর্জ্য (castings) কেকের টুকরোর মতো (crumbs) গঠনের ফলে বেশি জলকণা ধারণ করতে পারে এবং কেঁচো দ্বারা খননের ফলে গর্ত দিয়ে অতিরিক্ত জল নিষ্কাশিত হতে পারে এবং চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভূগর্ভের জলধারাগুলিকে (acquifiers) ভরিয়ে তোলে। বিভিন্ন পরীক্ষায় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে কেঁচোযুক্ত ভারী কাদামাটি কেঁচোহীন মাটির থেকে প্রায় ৬ গুণ দ্রুত জল নিষ্কাশন করতে পারে। বিপরীতে, হালকা বেলে মাটিতে যেখানে জল সরাসরি মাটির নিম্নতর স্তরে (subsoil) পৌঁছাতে পারে সেখানে কেঁচোর বর্জ্য জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।[১৫]

সেচ সেবিত গাছের জমিতে, কেঁচোরা সারা বছর সক্রিয় থাকে। খুব সকালে যখন বড়ো বড়ো ফোঁটায় শিশির পড়ে এবং আলোও ভালো ভাবে ফোটে না (মাটির পোকারা উজ্জ্বল আলো পছন্দ করে না), তখন কখনও সখনও তাদের দেখা যায়। শুধুমাত্র বৃষ্টিসেবিত খামারগুলিতে কেঁচোরা বর্ষার শেষে ধীরে ধীরে মাটির গভীরে প্রবেশ করে, যে স্তরে জলকণা থাকে বেশি। এখানে তারা মাসের পর মাস ঘুমিয়ে (dormant) থাকে। কঙ্কন উপকূলে তারা উঠে আসতে শুরু করে মার্চ নাগাদ, যখন বাতাসের আর্দ্রতা বাড়তে থাকে এবং ঠান্ডার পর্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে।[১৬]

ভারতে প্রায় ৩৫০ প্রজাতির কেঁচো পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের কেঁচো বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া ও মাটির সাথে খাপ খাওয়ানোয় অভ্যস্ত। একই জমিতে এমন সব কেঁচো থাকে যারা ভূপৃষ্ঠের উপরিতলের মাটিতে (top soil) থাকতে পছন্দ করে। আবার এমন খননকারী প্রজাতি আছে যারা মাটির ৩ মিটার বা তার বেশি নিচে প্রবেশ করে।

এছাড়া কেঁচো হল মাটির বহুরকম সাহায্যকারী জীবগুলির মাত্র একটি। শুখা অঞ্চলে পিঁপড়ে, উই (সাদা পিঁপড়ে) বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেখানে কেঁচোরা আর্দ্র পরিবেশ পছন্দ করে। পোকারা অন্যান্য পোকা ও জীবাণুর প্রভাব নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করতে বা বেঁচে থাকতে পারে না। বাণিজ্যিক জৈব-প্রযুক্তি তার ক্ষুদ্র দৃষ্টিকোণের জন্য অন্য প্রজাতিগুলি থেকে কোনো একটা বিশেষ প্রজাতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিতে সমস্ত জীব ও ভূত (elements) মিলে সৃষ্টি করে এক আন্ত-সম্পর্কিত সমগ্র (inter-related whole).

আগাছারা মাটির আদি সন্তান-সন্ততি

আগাছারা হল অসংখ্য দেশি উদ্ভিদ যারা মানুষের দ্বারা রোপিত না হয়ে, আপনিই উপ্ত হয় ও বেড়ে ওঠে। ভাস্কর সাভে তাদের বলেন মাটির আদি সন্তান-সন্ততি। অভিযোজিত (adopted) 'পালিত সন্তানরা' হল সেই শস্যগুলি যেগুলি চাষি বপন করে।

সাভে বলেন, "স্বাস্থ্যবান মাটির গর্ভ এত বড়ো হয়, যা সূচনা করা (introduced) শস্য প্রজাতিকে তার লালন ক্ষেত্রে ভালবাসার সাথে গ্রহণ করতে পারে। সেটা সম্ভব হয় যদি মানুষের দ্বারা নির্বাচিত উদ্ভিদগুলি এই মাটি ও আবহাওয়ার পক্ষে বিশেষভাবে অনুপযোগী না হয়। কিন্তু যেহেতু আগাছাগুলি প্রকৃতির পছন্দসই প্রজাতি এবং তারা আরও প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত ও (বীজ) উপ্ত, তারাই সেইসব উদ্ভিদ যারা বিদ্যমান (existing) পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে সবচেয়ে বেশি অভ্যস্ত। একজন চাষি তাকে অবাঞ্ছিত মনে করতে পারে, কিন্তু তারা বহু প্রাণবন্ত উপায়ে মাটির উপকার করে এবং গাছ-ফসলের বৃদ্ধিতে উপকারী ভূমিকা পালন করে —— যতক্ষণ না তারা তাদের ছায়ায় ঢেকে ফেলে সূর্যরশ্মি থেকে বঞ্চিত করে!

প্রাকৃতিক ক্রান্তীয় অরণ্যের ঘন সবুজের মাঝে পাওয়া যায় এমন সব বিস্ময়কর বৈচিত্র্যপূর্ণ সকল উদ্ভিদ এক অর্থে 'আগাছা', কারণ তাদের কোনো মানুষ পোঁতে না, তারা আপনিই (বীজ) উপ্ত হয়ে বেড়ে ওঠে। তবুও সেটি একটি উচ্চ–উৎপাদনশীল স্বাস্থ্যকর বাস্তুতন্ত্র যেখানে সমস্ত রকমের গাছপালা একে অপরের উপস্থিতিতে উপকৃত হয়ে নিজ নিজ স্বকীয় অবস্থান বজায় রেখে একক গোষ্ঠী হিসেবে সহাবস্থান করে।

ভারতের মতো একটি দেশে বৈচিত্র্যপূর্ণ আগাছাগুলি বর্ষার প্রথম আগমনে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ফাঁকা মাটিকে ঢেকে ফেলে।[১৭] বর্ষা যতই এগোয় অবিশ্রান্ত বর্ষণে আগাছাগুলি হাতুড়ির মতো আঘাত করা বৃষ্টির ফোঁটাগুলিকে গ্রহণ করে মাটিকে রক্ষা করে; আবার তাদের মূলগুলিও মাটিকে আঁকড়ে থেকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। এই আগাছাগুলি না থাকলে আমাদের ক্রান্তীয় পরিবেশ পরিস্থিতিতে, বিশেষত ঢালু জমিতে ভূমিক্ষয় ভয়ংকর হয়ে উঠত। তাই ভাস্করভাই বলেন, "এ আমাদের এক নির্বোধের মতো অজ্ঞতা যে আমরা বুঝতে পারি না আগাছাগুলি আমাদের কত বড়ো আশীর্বাদ।''

আগাছাগুলির মূল যতই মাটির গভীরে প্রবেশ করে ততই মাটির ভিতরে বাতাস চলাচলের পথ প্রশস্ত করে। এর ফলে মাটির জলকণা শোষণ ও ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আগাছাগুলি মাটিকে ছায়ায় ঢেকে রেখে বাষ্পীভবন হ্রাস করে, মাটির জীবগুলির (বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধির) উপযোগী পরিবেশ বজায় রেখে মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। আর যখন আগাছাগুলি মারা যায়, কেঁচো, পিঁপড়ে ও পচনক্রিয়া ঘটানো (decomposer) ব্যাক্টেরিয়া তাদের শুকনো পাতা ও মূলগুলি খায় এবং তাদের ভিতরের খনিজ পুষ্টিগুলিকে মাটিতে ফিরিয়ে দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের উদ্ভিদের ও দীর্ঘায়ু গাছদের সেবা করে।

এছাড়া আগাছারা আরও হরেকরকম বিশেষ ধরনের কাজকর্ম করে। মাটির অবস্থা বদলের সাথে সাথে প্রাকৃতিক ভাবেই বিভিন্ন ধরনের আগাছার পরিবর্তন ঘটে। যেখানে অন্য কোনো উদ্ভিদ জন্মায় না, সেখানে কিছু আগাছা দারুণ পথিকৃতের মতো ক্রমাগত মাটির উন্নতি সাধন করে। কিছু আগাছা শুটিজাতীয় (leguminous) , তারা নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। আবার কিছু আগাছা আছে, যাদের ওপর

বসা কীটপতঙ্গগুলির বংশবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে এই পতঙ্গগুলি গাছপালার যে ক্ষতি করতে পারত তার থেকে গাছপালারা রক্ষা পায়।

"প্রকৃতিতে উদ্ভিদের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর এবং প্রাকৃতিক খামার বা জঙ্গলের বিশ্ববিদ্যালয়ে জানার কোনো শেষ নেই।" ভাস্কর সাভে বলে চলেন, "আমি কল্পবৃক্ষে বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন ঋতুতে শত শত প্রজাতির আবির্ভাব দেখেছি। এদের মধ্যে এমন উদ্ভিদ আছে, যারা ঔষধি গাছ বলে পরিচিত। যেমন ১৯৯২ সালে আমার বাগিচায় বিরাট সংখ্যক পুনর্নভা (satodi) গুল্ম দেখা গিয়েছিল। এই উদ্ভিদগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি উপকারী। পুনর্নভা শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল 'পুনরুজ্জীবন'।

যদিও আগাছারা সাধারণভাবে কৃষকের বন্ধু, কোনো কোনো অপ্রাকৃত পরিস্থিতিতে তাদের কিছু প্রজাতি ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।[১৮] এই আগাছারা যদি শস্য–গাছেদের চেয়ে বেশি বেড়ে ওঠে, শস্য–গাছেরা রোদ পায় না, যা শস্যের ক্ষতি করে। অবশ্য এক্ষেত্রেও আগাছারা আরও একটি মৌলিক সমস্যা সমাধান করে যা হল ভূমিক্ষয় রোধ। তারা ক্রমাগত চাষিকে সংকেত দেয় যে সে উক্ত পরিস্থিতিতে এক ভুল শস্য নির্বাচন করেছে অথবা তার বৃদ্ধিতে ভুল প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছে যাতে মাটি ও তার জীবেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আগাছার সীমাহীন বৃদ্ধিকে রুখতে গেলে এবং এ সমস্যার মূল থেকে সমাধান করতে গেলে একমাত্র বিবেচনার কাজ হল মিশ্রচাষ (mixed farming) ও ফসল আবর্তনের (crop rotation) পথ গ্রহণ করা, সাথে সাথে রাসায়নিক ও গভীর খনন (deep tillage) পরিত্যাগ করা। মাটির স্বাস্থ্য ফিরে এলে সমস্যা সৃষ্টিকারী আগাছারা নিজেরাই বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে তাদের দ্বারা শস্য ঢেকে দেওয়ার প্রবণতা থেকে যায়। সেক্ষেত্রে তাদের মোকাবিলার পথ হল সময়ে সময়ে তাদের ছেঁটে ফেলে (ফুল ফোটার আগে) তা দিয়ে শস্যের নিচে মাটির ওপরে ৩–৪ ইঞ্চি পুরু এক আচ্ছাদন দেওয়া। যেহেতু এই পুরু আস্তরণের নিচে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করতে পারে না, আগাছাগুলির বীজের কোনো অংকুরোদ্গম হয় না, ফলে কার্যকর ভাবে আগাছা বৃদ্ধি রোধ সম্ভব হয়।

বিষয় : ফসলের মাঠে আগাছা ও তাদের সীমাহীন বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ

ভাস্কর সাভে ব্যাখ্যা করে বললেন — ফসল আগাছা উভয়েরই বীজে কিছুটা খাদ্য সঞ্চিত থাকে যা অংকুরোদ্‌গম এবং প্রাথমিক বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। ধান, গম ইত্যাদি ফসলের বীজ সাধারণত আগাছাগুলির বীজের থেকে অনেক বড়ো এবং তাদের মধ্যে অনেকটা বেশি খাদ্য সঞ্চিত থাকে। বেশিরভাগ আগাছার বীজ বেশ ছোটো। তাদের বীজ থেকে সম্পূর্ণভাবে ফল বেরিয়ে আসতে লাগে সাধারণত ৮–১০ দিন। ধান বা গমেরও ফল বের হয় তিন চার দিনে এবং তারা তাদের বীজে জমানো খাদ্য ব্যবহার করতে পারে আরো দশদিন ধরে। এই সময়কাল জুড়ে তারা মাটি থেকে কোনো পুষ্টি গ্রহণ করে না। ফলে (ঠিক সময়ে পোঁতা হলে) এই ফসলের গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে অনায়াসে আগাছাদের মাথা ছাড়িয়ে যায়। শুধুমাত্র গাছগুলির বীজের শরীরে সঞ্চিত খাদ্য ব্যবহৃত হয়ে যাওয়ার পরই গাছগুলি মাটি থেকে রস আহরণ করতে শুরু করে। যে মাটিতে আমরা গাছ বপন করি তা যদি স্বাস্থ্যবান ও উর্বর হয় এবং অম্ল না হয়, তাহলে ফসলের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে অপ্রতিহতভাবে এবং আশপাশের আগাছাগুলিকে বৃদ্ধিতে ছাড়িয়ে গিয়ে তাদের ছায়ায় ঢেকে রেখে সূর্যরশ্মি থেকে বঞ্চিত রেখে তাদের বৃদ্ধিকে রুদ্ধ করে।

ফলে শস্য ও আগাছাদের মধ্যে সূর্যরশ্মি গ্রহণের জন্য কিছু প্রতিযোগিতা থাকতে পারে, কিন্তু তা মাটি থেকে পুষ্টি সংগ্রহের ক্ষেত্রে নয়। ভাস্কর সাভে বলেন, "যদি ফসল আগাছাকে লম্বায় ছাড়িয়ে যায়, তাদের ছায়া আগাছাগুলিকে দমিয়ে দেয়, ফলে তারা পরে আর সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না। স্বাস্থ্যবান, সজীব ও অম্লতাহীন মাটিতে স্বাভাবিকভাবেই এটা হয়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা বহু প্রজন্ম ধরে চাষ করে আসছে। কিন্তু যেহেতু তাদের মাটি ছিল স্বাস্থ্যবান, তারা আগাছাদের থেকে কখনও কোনো গভীর সমস্যার সন্মুখীন হয়নি, এমনকী কয়েক দশক আগে পর্যন্ত। তাই বীজগুলি কতদূর অন্তর পুঁততে হবে তা নিয়ে একটা বুড়ো আঙুলের নিয়ম (thumb rule) আছে, সেটি হল, যদি আপনার মাটি গুণমানে কম বা দুর্বল হয়, তাহলে বীজের সংখ্যা বাড়ান। অন্যভাবে বললে, বীজ বুনুন একে অপরের

কাছাকাছি। এই কৌশলের ফলে শস্যের (গাছের) ছায়া আগাছাগুলির ওপর পড়ে আগাছার বৃদ্ধি রুদ্ধ করে। অবশ্য যদি আপনার মাটি যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান হয়, তাহলে কম সংখ্যক বীজ বুনুন, অর্থাৎ বীজেদের মধ্যে দূরত্ব বেশি রাখুন। যখন চাষিরা জৈবচাষে ফিরে যায় তাদের মাটির স্বাস্থ্য ধারাবাহিকভাবে উন্নত হয়। অনুরূপভাবে ফসলের বৃদ্ধি হয় আরও ভালো। আবার সাথে সাথে আগাছার বৃদ্ধিও কমে যায়। ফলে ২–৩ বছরের মধ্যে আগাছার নিয়ন্ত্রণ হয় এবং তাদের কৃত্রিমভাবে নাশ করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য আচ্ছাদনের সঠিক পদ্ধতি

কেটে ফেলা আগাছাগুলি যাতে পুনরায় জেগে উঠতে না পারে, তার জন্য আচ্ছাদন খুবই কার্যকর, অবশ্য যদি তা যথেষ্ট পুরু হয় যাতে করে আচ্ছাদনের ভিতরে রোদ প্রবেশ করতে না পারে। উদাহরণস্বরূপ যদি ১০০ বর্গফুট এক জমি থেকে আগাছা কাটা হয় তাহলে তা থেকে ১০০ বর্গ ফুট জুড়ে পুরু আস্তরণ দেওয়া সম্ভব নয়। আগাছার বৃদ্ধির ঘনত্বর ওপর তা নির্ভর করে। সেই পুরু আস্তরণ হয়তো দেওয়া সম্ভব হবে ৪০ বর্গফুট অথবা হয়তো ১০ বর্গফুট জমিতে। যদি সূর্যরশ্মি হালকা আচ্ছাদনের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে (তিন ইঞ্চির কম পুরু), তাহলে আগাছাগুলি পুনরায় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। আবার আচ্ছাদন হালকা হলে কাটা আগাছাগুলি মাটির প্রত্যক্ষ সংযোগে আসতে পারে না, মাটিকে সরাসরি ছুঁতে পারে না, যাতে করে মাটির জীবগুলি তাদের পচানোর কাজটা করতে পারে না। এরকম অবস্থায় আগাছাগুলি মাটির সাথে সংযুক্ত হয়ে হিউমাস বা উদ্ভিজ্জ সারে পরিণত হতে পারে না, বরং তারা বাতাসে শুকিয়ে গিয়ে আর কোনো কাজে লাগে না।

তাই যদি ১০০ বর্গফুটে বেড়ে ওঠা আগাছা কেটে দিয়ে ২৫ বর্গফুট অঞ্চলে ফসলে ৩–৪ ইঞ্চি পুরু আচ্ছাদন দেওয়া যায়, তাহলে কৃষকের এই মাপটাই ব্যবহার করা উচিত, যদি না বাইরে থেকে অতিরিক্ত জীবভর (bio-mass) সরবরাহ করা যায়। এর পর বাকি ৭৫ বর্গফুট অঞ্চলে বৃদ্ধি পাওয়া নতুন আগাছা সিকি ভাগ অঞ্চলে আচ্ছাদনের মতো ব্যবহার করে ধাপে ধাপে ৪–৫টি পর্যায়ে আচ্ছাদন পদ্ধতিতে ঢেকে রেখে সফলভাবে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এই আচ্ছাদনগুলি

সম্পূর্ণ পচতে বেশ কয়েকমাস লেগে যেতে পারে। কিন্তু তা থেকে যে কম্পোস্ট তৈরি হয় ফসলের পক্ষে তা খুবই উপযোগী। ফলে যাকে শত্রু বলে মনে হত, তা এখন বন্ধুরূপে সেবার কাজে লাগে। কিন্তু আগাছা কেটে আচ্ছাদনের কাজে লাগানোর ব্যাপারটা অবশ্যই আগাছায় ফুল ধরা ও তাদের পরাগ মিলনের পূর্বেই করতে হবে। এক্ষেত্রে যদি চাষি বেশি দেরি করে ফেলে তাহলে আচ্ছাদনে পরাগমিলন হয়ে যাওয়া বীজ থেকে যায় এবং আচ্ছাদিত অঞ্চলে সেই আগাছার জোরালো পুনরুত্থান ঘটে।

গাছের ছায়ায় ঢেকে রেখে আগাছার নিয়ন্ত্রণ

দাভরো বলে এক আগাছা আছে যাকে কৃষকরা বিপজ্জনক বলে মনে করে। ভাস্কর সাভে বলেন যে একে নিয়ন্ত্রণ করতে এমন ফসল বুনতে হবে যা মাটিকে ঘন ছায়ায় ঢেকে দেয়। দাভরো গাছটির শিকড় এমন গভীরে যায় যে তাকে ওপর থেকে কেটে সরিয়ে দিলেও তার থেকে সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে ৪ ফুট/৪ ফুট অথবা ৫ ফুট/৫ ফুট গভীরে যাওয়া মূলের গাছ যেমন কলা গাছ লাগাতে হবে —যে গাছ অনেক ওপরে উঠে আরও বড়ো অঞ্চল জুড়ে ছাওয়া দিতে পারে। এই গাছগুলি যখন কিছুটা বেড়ে উঠেছে তখন তাদের জন্য দিতে হবে অনেকটা গোবর সার। এরপর কলার যে পাতাগুলি বেরিয়ে আসে সেগুলির ছাতা এত বড়ো হয় যে আশেপাশের গাছগুলিকে ছুঁয়ে যায় ও অনেকটা অঞ্চল জুড়ে ছাওয়ায় ঢেকে রেখে দাভরো আগাছাগুলিকে দমিয়ে রেখে, শেষে একেবারে ধ্বংস করে ফেলে।

টীকা এবং উল্লেখিত গ্রন্থাদি

১। এগুলি পশ্চিম উপকূলের লম্বা' নারকেল গাছ যেগুলি ১০০ থেকে ১২৫ বছর বাঁচে।

২। এগুলি উমের গ্রামের দক্ষিণে সিলভাসা অঞ্চলের ৬০০ বছরের পুরোন সবেদা গাছ যেগুলি টিকে আছে পর্তুগীজদের আগমনের সময় থেকে! সবেদা গাছেরা তাদের জীবৎকালে ৬০ টন ফল দেয়। সবেদা গাছেরা ২০০ বছর ধরে বছরে গড়ে ৩০০ কেজি করে ফল দেয়। এই হিসাব অনুযায়ী সবেদা গাছের ফলন এই রকম ধরা হয়েছে। পরিমাণটি সম্ভবত আরো বেশি।

৩। এই জ্ঞানগর্ভ সূত্রগুলি প্রধানত লেখা হয় গুজরাতি, মারাঠি বা হিন্দী ভাষায় — যে তিনটি ভাষা ভাস্কর সাভে বলতে পারেন — প্রথম দুটিতে তিনি আরো বেশি স্বচ্ছন্দে বলেন।

৪। ভ্রমণার্থীদের শুধুমাত্র শনিবারের অপরাহ্নে (২ টো) আসতে অনুরোধ করা হয় যখন ভাস্করভাই (বা তার দুই ছেলে নরেশ বা সুরেশ) তাদের খামার ঘুরিয়ে দেখান এখানে কিভাবে কৃষিকাজ করা হয় তা ব্যাখ্যা করেন। নিকটবর্তী রেল স্টেশন হল উমেরগ্রাম যা মুম্বাই গুজরাত রাস্তায় ঠিক মহারাষ্ট্র থেকে গুজরাতে প্রবেশ করার পরে–ই পাওয়া যায়। মুম্বাই থেকে এর দূরত্ব ট্রেনে তিন ঘন্টা। ডাকযোগে চিঠি পাঠানোর ঠিকানা হল : ভাস্কর সাভে, কল্পবৃক্ষ, কোস্টাল হাইওয়ে, দেহরি গ্রামের নিকট, ভায়া উমেরগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন, জেলা — ভালসাদ, গুজরাত, ফোন : (০২৬০) ২৫৬২১২৬

৫। ডঃ বিজয়া ভেঙ্কট, 'দ্য কারনেল অফ হেলথ' দ্য পাইয়োনিয়ার, ১২–০৭–৯৬

৬। খামারের নগদ রোজগারটা আসে প্রধানত সবেদা ফল ও নারকেল চারা বিক্রী থেকে, আর ঝুনো নারকেল, সুপারী, কলা, পেঁপে, কারিপাতা, এ্যালো এবং কিছু জ্বালানী কাঠ ইত্যাদি বিক্রী করে কিছুটা রোজগার হয়। কিছু ঝুনো নারকেলের শ্বাস খামারেই পেষণ করে খাঁটি, উচ্চমানের ভোজ্য নারকেল তেল তৈরি করা হয়, এখন যার বাজারে বিরাট চাহিদা। ব্যয় নূন্যতম। খামারের বাৎসরিক নেট রোজগার হল ৭ লক্ষ টাকা। আর এটা অনেক পশ্চিমী (প্রধানত য়ুরোপীয়) জৈব খাবার ত্রেতাদের অনেক বেশি রপ্তানি দামের লোভনীয় প্রস্তাবকে উপেক্ষা করেই।

৭। `The Formation of Vegetable Mould through the Action of Worms', by Charles Darwin, Faber and Faber, 1927.

৮। প্রফেসর সুলতান ইসমাইল লিখিত `Compositing through Earth-

worms', 1993, (শ্রী এ.এম.এস মুরুগাপ্পা চেট্টিয়ার রিসার্চ সেন্টার, মাদ্রাজ)। কেঁচো মলের উচ্চ–পুষ্টি মূল্যের কথা, স্যার অ্যালবার্ট হাওয়ার্ডকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, লিখেছেন শৈলেন ঘোষ–ও তার লেখা 'জৈব চাষ'–এ, পৃষ্ঠা —৩১–৩২, সমবর্ধন, ১৯৮৪। তেমনি পিটার টমকিনস্ ও ক্রিস্টোফার বার্ড এর লেখা `Secrets of the Soil`, Perennial Library, 1990, pg.43, (মাটির গোপন কথা গ্রন্থে কেঁচো সারের মধ্যে সমপরিমান নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশ পাওয়ার বিশেষ উল্লেখ রয়েছে।

৯। প্রফেসর সুলতান ইসমাইল লিখিত `Vermicology`, (ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৯৭) এবং প্রফেসর সুলতান ইসমাইল এর সাম্প্রতিকালের বই `The Earthworm Book`, 'আদার ইন্ডিয়া প্রেস দ্বারা প্রকাশিত'।

১০। জে.ই.সাটচেলের হিসাব অনুযায়ী একর প্রতি বছরে কেঁচোসার এর শুষ্ক ওজনের পরিমাণ ৪ থেকে ৩৬ টন।(`Earthworm Ecology`, চ্যাপম্যান এবং হল, ১৯৮৩)।

১১। পিটার টমকিনস্ ও ক্রিস্টোফার বার্ড এর লেখা `Secrets of the Soil`, Perennial Library, 1990, pp.42-43

১২। জে.এস.ডগলাস এবং রবার্ট এ.দে.জে. হার্ট নিশ্চিত করে জানান, "এটা সাধারণত মনে করা হয় যে প্রতিবেশী গাছপালারা একে অপরের পুষ্টি কেড়ে নেয়। এবং তাই অর্থকরী ফসল ফলাতে গেলে গাছকে অন্য সমস্ত গাছপালা থেকে আলাদা করে, সমস্ত প্রতিযোগী গাছপালাদের নির্মূল করেই চাষ করতে হয়। কিন্তু প্রান্তীয় অরণ্যের বিপুল উৎপাদনশীলতা পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেয় যে, প্রকৃতিতে প্রতিযোগিতার শক্তির থেকে সহযোগিতার শক্তি অনেক বেশি সক্রিয়। (Ref. `Forest Farming', Natraj Publishers, 1982, pg.18)

১৩। জন এইচ স্টোরেরর লেখা `The Web of Life`, মেন্টর, ১৯৫৩, পৃষ্ঠা. ৩২; এছাড়াও দেখো ক্লদে বুর্গুইনন এর `Regenerating the Soil`, আদার ইন্ডিয়া প্রেস, ২০০৫, পৃষ্ঠা. ১২১।

১৪। মৌমাছিরা হাজার হাজার কিলোমিটার চলাচল করে অসংখ্য ফুলের থেকে সংগ্রহ করে প্রত্যেক কেজি মধু তৈরির জন্য! অতঃপর ভাস্কর সাভে মনে করেন যে মধু অবশ্যই প্রতিদিনের ব্যবহারের চেয়ে ঔষধি রূপে ব্যবহার অনেক বেশি ন্যায়সঙ্গত এবং যথাযত। ডঃ শৈলেন ঘোষ লিখেছেন, "প্রান্তীয় দেশগুলিতে অধিকাংশ গাছেদের পরাগমিলন ঘটে বাতাসের সাহায্যে নয়, বরং পোকাদের (যেমন মৌমাছি) সাহায্যে। মারী পোকা নাশকের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে একটা বিরল ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এর ফলে উদ্ভিদ

জগতে যে বিপুল ক্ষতি হচ্ছে তাতে যতই সার ব্যবহার করা হোক না কেন, সেই ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়। (Ref. `Organic farming`, pg.10, Samvardhan, 1984)

১৫। প্রফেসর সুলতান ইসমাইল লিখিত `Cpmposing through Earth-worms`, pg.2; এছাড়াও `Vermicology` (op cit) একই লেখকের, পৃষ্ঠা.২৮। ১৬। প্রফেসর সুলতান ইসমাইল লিখিত `Cpmposing through Earthworms`, pg.2; এছাড়াও `Vermicology` (op cit) একই লেখকের, পৃষ্ঠা.২৮।

১৭। প্রথম বৃষ্টির পরে বুনো ঘাস ও আগাছাদের বিপুল আবির্ভাব ঘটে। বিপুল বৃষ্টিস্নাত কোঙ্কন অঞ্চলে, যেখানে ভাস্কর সাভে–র খামার অবস্থিত, সেখানে এই বুনো ঘাস ও আগাছাদের বিপুল বৃদ্ধি আরো পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

১৮। যেখানে মাটি ক্রমাগত (দু)এক রকমের চাষ, ভারী খনন ও বিষাক্ত কৃষি রাসায়নিকের প্রভাবে ভুগছে; সেখানে সাধারণভাবে আগাছাদের প্রাদুর্ভাব ঘটে। অবশ্য সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে সেখানে কিছুই জন্মায় না। Anna Penderson Kummar তার The role of weeds in maintaining the plain grasslands -- এ লিখেছেন, "অতিরিক্ত পশুচারণ, উপরিতল ক্ষয়ে যাওয়া বা দীর্ঘকাল জুড়ে খরা ইত্যাদি কারণে যে মাটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে মাটিতে ঘাস ফিরে আসার ক্ষেত্রে আগাছার বৃদ্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন বিরুদ্ধ পরিবেশে ঘাস মারা যায়, তা সহজে ফিরে আসতে পারে না। তখন ঘাসকে অপেক্ষা করতে হয়, যাতে আগাছারা বৃদ্ধি পেয়ে তাদের শিকড় দিয়ে শক্ত মাটিকে আলগা করে বা তাতে তাদের শরীরের আঁশ দিয়ে জড়িয়ে মাটিতে পুনরায় ভেদ্যতা porosity সৃষ্টি করতে পারে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে এক বা একাধিক মরশুম লেগে যেতে পারে। কিন্তু এরপর আগাছারা ঘাসেদের হটিয়ে দেয় না, তারা শুধু মাটিকে প্রস্তুত করে ঘাসের প্রত্যাবর্তনের জন্য। যখন ঘাসেদের ফিরে আসার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তাদের ফিরে আগাছাদের উচ্ছেদ করার ক্ষমতা জন্মায়। মাটি যখন আঁশে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, তখন ঘাস আগাছাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।''

মিতাহারী ...
উদ্ভিদের প্রয়োজন অতি সামান্য!



৩

ভাস্কর সাভে বলেন, "প্রাকৃতিক চাষের চারটি মৌলিক নীতি হল অত্যন্ত সরল। প্রথমটি হল, প্রতিটি জীবেরই রয়েছে বেঁচে থাকার সমান অধিকার''। এই অধিকারকে সম্মান করতে হলে কৃষিকাজকে আবশ্যিকভাবে হতে হবে অহিংস। দ্বিতীয় নীতিটি স্বীকার করে যে, 'প্রকৃতিতে প্রতিটি জিনিসই প্রয়োজনীয় ও জীবনের বুনটে (web of life) তারা কোনো না কোনো প্রয়োজন মেটায়।''

"তৃতীয় নীতিটি হল : কৃষিকাজ হল এক ধর্ম, প্রকৃতি ও সহযোগী সকল জীবকে সেবা করার এক পবিত্র পথ, এটা ধান্দা বা শুধুমাত্র টাকা বাড়াবার ব্যবসা হতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মকে অস্বীকার করে আরও বেশি অর্থ রোজগারের ক্ষীণদৃষ্টিজাত লোভই হল আমাদের সামনের ক্রমবর্ধমান সমস্যাবলীর কারণ।''

চতুর্থটি হল উর্বরতার স্থায়ী পুনর্জন্মের নীতি। এই নীতি অনুযায়ী, যে ফসল আমরা ফলাই, তাদের শুধুমাত্র ফল ও বীজের ওপরেই রয়েছে আমাদের (মানুষের) অধিকার। এগুলি হল উদ্ভিদের ৫% থেকে ১৫% জীব–ভর ফলন (bio-mass yield)। বাকি ৮৫% থেকে ৯৫% জীব–ভর — ফসলের অবশিষ্ট অংশ আবশ্যিকভাবে মাটিতে ফেরৎ দিতে হবে যাতে মাটি তার উর্বরতাকে নবীকরণ (renew) করতে পারে, হয় প্রত্যক্ষভাবে আচ্ছাদন রূপে নতুবা খামারের পশুদের বর্জ্য পদার্থ (সার) হিসাবে। এটি যদি আচারনিষ্ঠ রূপে মেনে চলা হয় তাহলে বাইরের থেকে কোনো কিছু করার প্রয়োজন পড়ে না, এতে মাটির উর্বরতা কমার কোনো কারণ থাকে না।''

"আজকের দিনে উদ্বিগ্ন চাষিরা দুঃখজনকভাবে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পরিশ্রম করে, ফলে গাছেদের কী প্রয়োজন, কতটা প্রয়োজন এবং কোথায়, কখন, কীভাবে সেই প্রয়োজন সবচেয়ে ভালোভাবে মেটানো সম্ভব — এগুলি যদি ভালোভাবে বোঝা যায় তা সত্যিই কাজে লাগে।'' এইরকম

সব মাটির কাছাকাছি (down to earth) বিষয়গুলি নিয়ে ভাস্কর সাভে উৎসাহের সাথে বুঝিয়ে চলেন (সে একজন বা অনেককে) প্রকৃতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ কৃষিকাজের আরও ফলিত বুনিয়াদী ধারণাগুলি।

কী এবং কতটা

একটি সাধারণ ভুল ধারণা ভেঙে ভাস্কর সাভে ব্যাখ্যা করলেন, যে জৈববস্তু আমরা মাটিতে প্রয়োগ করি সেটা/সেগুলি গাছের খাদ্য নয় — অন্তত, প্রত্যক্ষভাবে নয়। বরং সেটা/সেগুলি হল মাটিতে বাস করা অসংখ্য জীব ও জীবাণু যারা মাটির উর্বরতা বজায় রাখতে অবিরাম কাজ করে যায় তাদের বৃদ্ধির জন্যে। আধ কাপ মাটিতে যত জীবাণু থাকে তা হল সারা পৃথিবীতে যত মানুষ বাস করে তার থেকে বেশি।[১]

কেঁচো সহ মাটিতে বসবাসকারী অন্যান্য জীবদের শরীরে পাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাটিতে যোগ করা জৈব বস্তুরা ক্রমাগত আরও বেশি করে অজৈব ও খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। এই জীবদের মল খনিজ সমৃদ্ধ। সেই মল জলকণায় দ্রবীভূত হয়ে গাছের মূলগুলি দ্বারা শোষিত হয়।

গাছেদের কতটা খনিজ বা জল প্রয়োজন এ নিয়ে ভুল ভাবনাটি আরও মারাত্মক। গাছেরা যে মিতাহারী বা মাটির পুষ্টির অতি ক্ষুদ্র ভোক্তা –— একথা জোর দিয়ে বলতে ভাস্কর সাভে কখনও ক্লান্তি বোধ করেন না। তাদের যেগুলি প্রচুর পরিমাণে দরকার সেগুলি হল সূর্যালোক ও বাতাস। কিন্তু বেশিরভাগ গাছের জলকণার চাহিদা (জলজ ও আধা–জলজ প্রজাতিগুলি যেমন ম্যানগ্রোভ প্রজাতিরা ও ধান ইত্যাদি ছাড়া) সবচেয়ে ভালোভাবে পূরণ হতে পারে যখন মাটি সম্পূর্ণ ভিজে থাকে না, বরং যখন মাটিতে শুধু একটা স্যাঁতসেঁতে (damp) ভাব থাকে।

যেহেতু ভারতে সূর্যালোকের কোনো অভাব নেই, হিউমাস বা উদ্ভিজ্জ সারে ঢাকা ছিদ্রযুক্ত (porous) মাটি বেশি বাতাস ও জলকণা ধরে রাখতে পারে এবং এগুলি স্থায়ীভাবে ও বেশি পরিমাণে জীব–ভর (bio-mass) তৈরি করতে সক্ষম। এটি আমাদের প্রাচীন জ্ঞান, যদিও আজকের দিনে এই বোধের বড়ো অভাব।

একথা বুঝিয়ে বলতে ভাস্কর সাভে বললেন, "আপনার নাসারন্ধ্রদুটি চেপে ধরুন, মুখ বন্ধ করুন এবং সময় গুনুন।" এটা করলেই আমরা বুঝতে পারব, যে বাতাস আমরা আপনা থেকেই পাই, তা আমাদের শরীরের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি বেশিরভাগ গাছের মূলগুলি ও বায়ুজীবী জীবগুলি

— যেগুলি এই মূলগুলির চারপাশে বাস করে তাদের জন্য মাটিতে দরকার বাতাসের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ।[২] প্রকৃতিতে কেঁচো, পিঁপড়ে ও জীবাণুদের খনন প্রক্রিয়ায় তা নিশ্চয়তা পায়, কারণ খনন কার্যাবলী (tillage) মাটিকে করে রাখে ভেদ্য, ঝুরুঝুরু ও বায়ু চলাচলের জন্য প্রশস্ত।



একটি গাছের ওজনের বেশিরভাগটাই যে মাটি থেকে নয়, বরং বাতাস ও জল থেকে পাওয়া তা পরখ করার এক প্রামাণিক উপায় আছে। জীবনের বুনট (web of life) গ্রন্থে জন স্টোরার লিখেছেন, "সপ্তদশ শতাব্দীতে বাস করা এক ফ্লেমিশ ডাক্তার মাটির টবে একটি উইলো চারাকে বড়ো করেছিলেন। বীজ বপনের আগে টবটির ওজন করে নেওয়া হয়েছিল। পাঁচ বছর ধরে বৃষ্টির জল ছাড়া এই টবের মাটিতে আর কিছুই দেওয়া হয়নি এবং উইলো চারাটি বেড়ে উঠে একটি ছোটো গাছের রূপ নিল। পাঁচ বছর পরে গাছটিকে টব ও মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ওজন করা হল। যখন গাছটি স্রেফ অঙ্কুর অবস্থায় ছিল তার থেকে গাছটি ১৬৪ পাউন্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল আর টবের মাটির ক্ষয় হয়েছিল মাত্র দুই আউন্স। আসলে মাটির ওজনে ইতিমধ্যে নিশ্চিতভাবে যুক্ত হয়েছিল গাছের মূলের লক্ষ লক্ষ সূক্ষ্ম রোম, কিন্তু পরীক্ষাটিতে পাওয়া তথ্য পরিষ্কারভাবে জানায় যে এই ১৬৪ পাউন্ড ওজন নিশ্চয়ই মাটির বাইরের কোনো উৎস থেকে এসেছিল।"

ভাস্কর সাভে ১৯৭২ সালে তারই করা এরকম এক পরীক্ষার কথা বললেন। তিনি ৯ কেজি মাটি শুকিয়ে ওজন করেছিলেন। সেই মাটি তিনি একটি পাত্রে ভরলেন এবং তাতে একটি তরমুজের বীজ বপন করলেন। তা থেকে যে ডালপালা বের হল তা থেকে ৯০ দিনের মধ্যে দুটি তরমুজ ধরল, পরে এই ফসল তোলা হল। একটির ওজন হল ৩ কেজি, অন্যটির ৫ কেজি। ফল ছাড়া মূল সহ গাছটির বাকি সমস্ত অংশ সতর্কতার সাথে পাত্র ও মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল। মূলগুলির সাথে লেগে থাকা গুঁড়ো মাটির কণাগুলি ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে পুনরায় পাত্রে রাখা হল। গাছটির ওজন হয়েছিল ৬০০ গ্রাম। তাই সমগ্র জীব–ভর (bio-mass) উৎপাদন বৃদ্ধি হল ৮.৬ কেজি। তারপর পাত্র থেকে মাটি সরিয়ে রোদে শুকিয়ে আবার ওজন করা হল। ওজন ৯ কেজি, কোনো ক্ষয় হয়নি! "ওম পূর্ণমদাহ ...।"[৩]

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নিশ্চিত করছে যে গাছের ওজনের (অথবা কোনো জৈববস্তুর) ৮৮ শতাংশ হল শুধুমাত্র কার্বন ও অক্সিজেন (তাতে দুটি মৌলের প্রত্যেকের ভাগই প্রায় সমান সমান, ৪৪ শতাংশ।)[৪] এই দুটি মৌলের বেশিরভাগটাই আসে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে যা পাতার নিচের তলের অসংখ্য স্টোমাটা বা ছিদ্র দিয়ে ভিতরে শোষিত হয়।

বাতাসের জলকণা থেকে গ্রহণ করা হাইড্রোজেন হল এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে। একটি গাছের ওজনে এর ভাগ হল ৬%।[৫] বাতাসে ভাসমান জলকণাও কিছুটা অক্সিজেন জোগায়, যেমন মাটির ছিদ্রগুলির মধ্যে থাকা বাতাস থেকেও গাছ কিছুটা অক্সিজেন পেয়ে থাকে।

বাতাস ও জলকণা থেকে পাওয়া কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন — এই তিন প্রধান মৌল মিলিয়েই হয় গাছের মোট ওজনের ৯৪%। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এই তিনটি মৌল মিলে গিয়ে সালোকসংশ্লেষ নামক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্যান্ত বস্তুতে পরিণত হয়।

এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যদিও গাছেদের প্রধান চাহিদাগুলি বাতাস ও জলকণা থেকে পাওয়া যায়, এদের বেশ কিছুটা মাটি ও মূল–ব্যবস্থার (root system) মাধ্যমেও পাওয়া যায়। তাই মাটির ভৌত অবস্থা ও রস শোষণ করার ক্ষমতা বা গুণ তার রাসায়নিক ও খনিজ গঠনের (composition) থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ — এর ওপর আধুনিক কৃষিতে (রাসায়নিক ও খনিজ গঠন) বিশেষভাবে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এটি প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী স্যার অ্যালবার্ট হাওয়ার্ড দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল ৭০ বছরেরও আগে।[৬] হাওয়ার্ডের বই 'অ্যান এগ্রিকালচারাল টেস্টামেন্ট' (An Agricultural Testament, 1940) একটি ধ্রুপদি সৃষ্টি বলে বন্দিত হয়েছে। কিন্তু এই লেখায় প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি তখন স্বীকৃতি পায়নি, কারণ সেগুলি ছিল কৃষি–ব্যবসায়িক স্বার্থের পরিপন্থী। কিন্তু আজ অনেক পাশ্চাত্য দেশ হাওয়ার্ডকে সুস্থায়ী, জৈবকৃষির 'পথিকৃৎ' বলে মনে করে। আর হাওয়ার্ড নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি এসব কিছু শিখেছিলেন ভারতের সাধারণ চাষিদের কাছ থেকে।

গাছের প্রয়োজনীয় গঠনকারীদের (building-block) আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলতে হয় যে নাইট্রোজেনের স্থান অনেক পরে — এটি গাছের চতুর্থ প্রয়োজনীয় মৌল যেটির পরিমাণ হল গাছের ওজনের ১% থেকে ২%। এই মৌলটি বাতাসে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। এটি মাটিতে পাওয়া যায় রাইজোবিয়া নামক কোটি কোটি জীবাণুর কাজের দ্বারা, যারা শুঁটি জাতীয় গাছের (leguminous plants) মূলের গোটে (root nodules) বাসা বাঁধে। এছাড়াও, আরও বেশি সংখ্যক পচনকারী (decomposer) ব্যাক্টেরিয়ার কার্যকলাপের ফলে মৃত জৈববস্তুরা তাদের উপাদানগুলিতে বিশ্লিষ্ট হওয়ার ফলেও মাটি নাইট্রোজেনের জোগান পায়।

গাছের ওজনের ৫% আসে খনিজ লবণ থেকে যা মাটি নিজেই জোগান দেয়।[৭] এই মৌলগুলি হল ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিকন, ম্যাগনিসিয়াম ইত্যাদি মৌল এবং আরও বেশ কয়েকটি কণা–মৌল (trace elements) অথবা অণু–পুষ্টি (micronutrients) যেগুলি খুব কম প্রয়োজন, যেমন — লোহা, তামা, দস্তা, বোরণ, কোবাল্ট ও ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি।

সবুজ সৃষ্টি
ক্লোরোফিল, সূর্যের শক্তি এবং কার্বন–অক্সিজেন চক্র

গাছের পাতার ক্লোরোফিল বা সবুজকণাই জীবনসৃষ্টিকারী সালোকসংশ্লেষের প্রাথমিক এজেন্ট। এই সামান্য কিন্তু রহস্যজনক জিনিসটি সূর্যের শক্তি ও বায়ু, জল ও মাটি থেকে আহরণ করা মৌলগুলির মধ্যে মিলন ঘটিয়ে জটিলতর (more complex) *জীবন–রূপ* (life forms) *দেয়।*

গাছের দুটি প্রধান খাদ্য হল কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল। এগুলি থেকে পাওয়া জৈব বস্তুর তিনটি প্রধান মৌল হল কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এগুলির মধ্যে বিক্রিয়ায় প্রথম অত্যাবশ্যকীয় ধাপে সৃষ্টি হয় চিনি বা শর্করা। সৌরশক্তিকে বন্ধনের এই প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে নেওয়া কিছুটা অক্সিজেন ও জল বাতাসে নির্গত হয় মুক্ত রূপে।

শীতল ও আর্দ্র গাছেরা তাদের কাঠামোয় যে সৌরশক্তি জমা হয়ে আছে তা জানান দেয় না। কিন্তু যদি আপনি কিছু শুকনো ঘাস জড়ো করে আগুন লাগান, দেখবেন তা উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে উঠছে। এই তীব্র তাপ সৃষ্টি হয় ঘাসে জমে থাকা সৌরশক্তি নির্গমনের ফলে। অবশ্য যদি একটি গাছকে না পুড়িয়ে খাওয়া হয়, তাহলে সেই শক্তি শরীরে স্থানান্তরিত হয়ে আগুন ধরে রাখে। তাকে আমরা বলি প্রাণ।

গাছ–পাতারা মানুষ, জীব–জন্তু অথবা ব্যাক্টেরিয়াদের দ্বারা ভুক্ত হবার পর, এইসব জীবদের পাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকভাবে পচতে থাকে এবং শেষে তারা যে সব উপাদানগুলি দ্বারা সৃষ্ট সেগুলিতে বিশ্লিষ্ট হয়ে মাটি ও হাওয়ায় মিশে যায়। এই চক্রাকার প্রক্রিয়ায়, বাতাস থেকে আহরিত কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসেই ফিরে যায়, যাতে করে পরবর্তী প্রজন্মের গাছপালারা তা গ্রহণ করে আবার বেড়ে উঠতে পারে। আর মাটিতে মেশা জীবভরের (bio-mass) *অভুক্ত ও অ–পচিত* (undecomposed) *উপাদানগুলি মাটিতে মিশে গিয়ে অপসৃত* (sequestered) *কার্বনের মাত্রাকে বৃদ্ধি করতে পারে, যা এই ভয়ংকর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আবহাওয়ার বদলকে প্রশমিত করতে পারে।*

একটি মিশ্র প্রাকৃতিক খামারে কেঁচোর মল সার যথেষ্ট পরিমাণে এই খনিজ ও কণা–মৌলগুলিকে জোগান দেয়। এছাড়া আরও অসংখ্য পশু–পাখি, পতঙ্গ ও জীবাণুরা (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, মোল্ড) মাটির পুষ্টিচক্রকে (nutrients cycle) অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে। বস্তুত, প্রতিটি জীবই — তাদের রেচনে ও মরণে — প্রকৃতির চলমান পুষ্টিচক্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এছাড়া, মাটির অনেকটা গভীরে প্রোথিত গাছেরা ভূগর্ভের পাথুরে উৎস বা মাটি থেকে দ্রবীভূত খনিজগুলি শোষণ করতে পারে।[৮] তাই যে চাষি উর্বরতার পুনরুজ্জীবনের প্রাকৃতিক ও জৈবিক প্রক্রিয়াগুলিকে নজরে রাখে, মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণের ব্যাপারে তার ভাবিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হল ফসলের বর্জ্য ও অন্যান্য জৈব বর্জ্য একনিষ্ঠভাবে মাটিতে ফেরত দেওয়া। বাণিজ্যিক ফসলের (দু)এক ধরনের (monoculture) চাষে যখন সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ভূমির (land) উপরিভাগের মাটিতে (top-soil) পুষ্টির অভাব ঘটছে, তখন মিশ্র চাষে ফিরে গিয়ে কয়েক বছরের মধ্যেই সেই অভাব বহুলাংশেই মিটিয়ে ফেলা যায়। অবশ্য ভূমিক্ষয় রোধ ও কৃষি রাসায়নিকের ব্যবহার থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক।

দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমানে জৈব বর্জ্যের বিরাট অংশটাই মাটিতে ফিরিয়ে দেওয়ার বদলে আক্ষরিকভাবেই নষ্ট হয়। আর একই জমিতে বছরের পর বছর একই রকমের ফসল বোনায় — মাটির একই তল (Same level) থেকে একই রকমের খনিজ গ্রহণ করায়, মাটিতে সেইসব খনিজের অভাব দেখা যায়। আজকে মাটিতে পুষ্টি ও অণু–পুষ্টির অভাব (nutrient and micro-nutrient deficiency) জনিত সমস্যাগুলির বেশিরভাগই মাত্র ১০০ বছর আগে প্রায় সারা পৃথিবীতেই অভাবনীয় ছিল। এগুলি হল জৈব বর্জ্য মাটিতে ফিরিয়ে না দেওয়া এবং (দু)এক ধরনের চাষ (monoculture) — এই দুটি কারণের প্রত্যক্ষ ফল। আর আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে ভারত, চীন, জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি দেশের চাষিরা ফসল ফলিয়ে আসছে ৪০০০ বছরের বেশি সময় জুড়ে। আবার কারো কারো মত হল, ভারতে সুস্থায়ী কৃষির ইতিহাস ১০০০০ বছরের পুরোনো।

অতিরিক্ত জলের সমস্যা

জমির ওপরে এর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। ভাস্কর সাভে জোরের সঙ্গে বলেন, ‘বস্তুত বাদাবনের মতো জলাভূমির প্রজাতিগুলি এবং ধানকে বাদ

আবহাওয়া বদল, শক্তি সংকটের মোকাবিলায় গাছপালার ভূমিকা

পৃথিবীর সুদীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে বিপুল পরিমাণ গাছপালা ও পশুর কলা (tissues) সম্পূর্ণ পচনের আগে কবরস্থ হয়েছে। এদের কার্বন সমৃদ্ধ বস্তুতে জমে থাকা সৌরশক্তি ভূগর্ভে দীর্ঘকাল ধরে বিপুল চাপের প্রভাবে ঘনীভূত জীবাশ্ম–জ্বালানিতে রূপান্তরিত হয়।

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে আমরা বিপুল পরিমাণে জীবাশ্ম–জ্বালানি পুড়িয়ে আসছি। সৌরশক্তির এই আধার মাটিতে অঙ্গীভূত হয়েছে, হাজার লক্ষ বছর ধরে আমাদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষদের পৃথিবীতে আবির্ভাবেরও আগে থেকে। জীবাশ্ম–জ্বালানি পোড়ানোর ফলে আমরা বাতাসে বিপুল পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে আসছি যা গ্রীন–হাউস এফেক্টের ফলে ভূ–উষ্ণায়নের (global warming) সৃষ্টি করছে, যা আবার ভয়ঙ্কর ভাবে আবহাওয়া বিন্যাসে বদল নিয়ে আসছে।

একথা ঠিক যে জীবাশ্ম–জ্বালানির অপচয়মূলক ব্যবহার আমাদের আবশ্যিকভাবে কমাতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বাতাসে যে অতিরিক্ত মাত্রায় কার্বন ডাইঅক্সাইড জমেছে তা কমাতে গেলে দরকার বিপুল সংখ্যক বৃক্ষ সৃষ্টির এবং দরকার প্রাকৃতিক বনভূমিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মানুষের দ্বারা কার্বনচক্রের যে ক্ষতিসাধন করা হয়েছে তা নিরাময়ের চাবিকাঠি এটিই। শক্তি চাহিদার উত্তরও হল এটিই। সৌরশক্তি হল এই পৃথিবীতে সুস্থায়ীভাবে সমস্ত প্রাণ ও কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত মহাজাগতিক উৎস। এই সৌরশক্তির দৈনন্দিন নবীকরণে সবচেয়ে কার্যকর বিকেন্দ্রীভূত ও সার্বজনীন উপায় হল সালোকসংশ্লেষ যা এক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং যা করতে পারে একমাত্র গাছপালারা।

আমাদের জ্বালানি–বুভুক্ষু শিল্প সভ্যতা করঞ্জ (পোঙ্গামিয়া পিননাটা), এবং জাট্রোফা কারকাস (চন্দ্রজ্যোতি/রতনজ্যোত/জংলি এরান্ডি) ইত্যাদি তেলে ভরা ‘জৈব–ডিজেল’ (bio-disel) সমৃদ্ধ বৃক্ষ ও গুল্মের প্রজাতির দিকে ‘ভবিষ্যতের জ্বালানি’ হিসাবে (লোভী চোখে) তাকাতে শুরু করেছে।

অধঃপতিত জমিতে অন্যান্য বৃক্ষ ও গুল্মের সাথে মিশ্র চাষের প্রজাতি হিসাবে এগুলি বপন করা যায় কিন্তু (দু)এক ধরনের (monoculture) বাণিজ্যিক প্রজাতি হিসাবে শুখা জমিতে খাদ্য ফসল প্রতিস্থাপিত করার কাজে এই প্রজাতিগুলির ব্যবহার কার্যত অপরাধমূলক কার্যকলাপের শামিল। জনসাধারণের খাদ্যকে প্রতিস্থাপিত করে মেসিনের জন্য জৈব–জ্বালানি তৈরি করতে জমির ব্যবহারকে মেনে নেওয়া যায় না। বরং আমাদের বিরাটভাবে এবং জরুরি ভিত্তিতে (অঞ্চলের) মাটি হাওয়া জলের সাথে খাপ খাওয়া বৈচিত্র্যময় দেশজ প্রজাতির গাছপালা দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলকে ঢেকে ফেলা উচিত — এ থেকে আমরা বহুভাবে উপকৃত হব।

দিলে, অন্যান্য সকল প্রজাতির উদ্ভিদরা সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর ভাবে বেড়ে ওঠে যদি মাটি থাকে স্রেফ স্যাঁতসেঁতে অথবা আর্দ্র।

সাধারণত যে সমস্ত ফসল খাওয়া হয় তাদের মধ্যে চালই (এক আধা–জলজ প্রজাতি) হল একমাত্র ফসল যা জল জমে থাকা জমিতে ভালো বৃদ্ধি পায়। তাই বর্ষায় প্লাবিত হওয়া নাবাল অঞ্চলগুলিতে প্রাকৃতিক কারণে ধানকে বেছে নেওয়া হয়। যদিও উঁচু জমির উপযোগী ধানের প্রজাতিগুলিও পাহাড়ের ধারে জমি বেঁধে ধাপে ধাপে চাষ করা হয়। এই ধাপ চাষের (terrace farming) কারণ হল এতে পাহাড়ের ঢালে জলের প্রবল গতিকে বাধা দিয়ে মাটির জলধারণ ক্ষমতা বা আর্দ্রতাকে সর্বাপেক্ষা অনুকূল (optimum) সীমায় বেঁধে রাখা যায়।

বেশিরভাগ অন্য ফসলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জল মাটির কণাগুলির মধ্যে থাকা অসংখ্য পরিসরগুলি (spaces) থেকে বাতাস ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মূল–ব্যবস্থাকে (root system) শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলে। ফলে মূল শ্বসন (শ্বাস নেওয়া) বন্ধ হয়ে যায় এবং সালোকসংশ্লেষ ব্যাহত হয়। আবার দীর্ঘমেয়াদী প্লাবন মূলে পচন ঘটায়; গাছ হয় রোগপ্রবণ, মারীপোকার শিকার।

ভাস্কর সাভে বলেন, দুধেল গাই যেমন অসুস্থ হয়ে পড়লে তার স্বাভাবিক মাত্রায় দুধ দেওয়ার অবস্থায় ফিরতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে, তেমনি জলমগ্নতার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মূলদেরও পূর্বের কার্যকারিতা ফিরে পেতে বেশ সময় লাগে। ফলে মাটির অতিরিক্ত জল শুকিয়ে যাওয়ার বা নিষ্কাশিত হওয়ার পর গাছকে তার নতুন পাতা ফুল ও ফলের বদলে মূল ও মূলের তন্তুগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার দিকে বেশি নজর দিতে হয়।



একটি লম্ব দেওয়ালের গা বেয়ে বেড়ে উঠেছে একটি অশ্বত্থ গাছ

ভাস্কর ভাই আরও বলেন, “তাৎপর্যপূর্ণভাবে হিমালয় বা সহ্যদ্রির মতো পাহাড়ের ঢালগুলিতে, যেখানে খুব ভালোভাবে জল নিষ্কাশিত হতে পারে, সেখানে প্রায়শই ঘন বন দেখতে পাওয়া যায়। এরকম খাড়াই পাহাড়ের ঢালে মাধ্যাকর্ষণের জন্য বৃষ্টির জল দাঁড়াতে পারে না। এখানে ভূমিক্ষয়ও হয় খুব বেশি, বিশেষত ভারী বর্ষায়। খাড়াই পাহাড়ের ঢালে অনেক জায়গায় পাথর থাকে ৯৫% এবং মাটি মাত্র ৫%। মূলের আশপাশ অঞ্চলে জল জমে

থাকার সম্ভাবনা খুবই কম, তবু এই সব জমিতে বিশাল সব প্রাচীন বৃক্ষরা মাথা উঁচু করে থাকে। মিতাহারেই যে গাছেদের চাহিদা মেটে এর থেকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কীই বা হতে পারে।''

আটমাস ধরে যখন বৃষ্টি হয় না, তখন এই সমস্ত পাহাড়ের ঢালে গাছেরা ঘনীভূত শিশির থেকে ও মাটিতে পাতা পচা সারের (humus) ভিতরের বায়ু থেকে সরাসরি জলকণা (বিশেষত যখন বাতাসে আর্দ্রতা থাকে খুব বেশি) গ্রহণ করে যথেষ্ট সক্ষমভাবেই টিকে থাকে। বর্ষায় পাহাড়ের খাঁজে, ফাটলে অথবা নাবাল পাথরে বৃষ্টি কিছুটা শোষিত হয় যা থেকে পরে শিকড়গুলি রস গ্রহণ করে।

পাহাড়ের কম ঢালে যেখানে মাটি কিছুটা গভীর, সেখানে মাটির ভিতরে অসংখ্য ছিদ্র পথের দেওয়ালগুলি ক্ষুদ্র ফিল্মের মতো জলকণা ধরে রাখে। এর ফলে মাটিতে বায়ু চলাচল ও মূলের শ্বসন ক্রিয়া অব্যাহত থাকে, যেমনটা ঘটে থাকে খাড়াই পাহাড়ের ঢালগুলিতেও। যাই হোক না কেন, বনভূমিতে মানুষের দ্বারা সেচ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না।

পর্বতগুলিতে যদি এরকম হয়, নদীর নাবাল উপত্যকা ও সমভূমিতে কিছু পাথর আর নুড়ি সহ মাটি সমৃদ্ধ হতে পারে, কিন্তু যেহেতু এসব অঞ্চলে ভালো জল নিষ্কাশন হয় না এবং ভারী বর্ষণেও উচ্চতর জমিতে প্রবাহিত জল জমে থাকার প্রবণতা বেশি, সেখানে গাছেদের মূলগুলি বাতাসের অভাবে ভোগে।

অক্টোবরে বৃষ্টি বন্ধ হয়। তারপর জমে থাকা জল শুকিয়ে গেলে অথবা বেরিয়ে গেলে, প্লাবনের ফলে মূলগুলির ক্ষয়কে মেরামত করতে অথবা সেগুলিকে প্রতিস্থাপিত করতে লেগে যায় কয়েক মাস। এই সময়কাল জুড়ে নতুন পাতা ও ডালপালায় সালোকসংশ্লেষ কার্যত বন্ধ থাকে। এরপর নতুন পাতা গজাতে অপেক্ষা করতে হয় মার্চ অথবা এপ্রিল পর্যন্ত। কিন্তু দু-তিন মাস পরে বৃষ্টি ফিরে আসে এবং আবার সেখানে মাটি তার থেকে অতিরিক্ত জল বার করে দিতে পারে না। ফলে সেখানে বাতাসের অভাব ঘটে এবং আবার সালোকসংশ্লেষের কাজ ব্যাহত হয়। বছর বছর প্লাবিত হওয়া নাবাল জমিতে গাছপালা ও বনের বৃদ্ধি ঘটে ভালোভাবে জল নিকাশ হয় এমন ঢালের জমির গাছ ও বনের থেকে অনেক কম।

প্রাকৃতিক বনভূমিতে বিপুল অঞ্চল জুড়ে মাটির উপরিতল থাকে শীতল সবুজ — যা থেকে প্রতিদিন বেশি পরিমাণ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ভোরের শিশিরে মাটি ভিজে থাকে, ঘন 'বহুতল' (multi-storeyed)

গাছ–পাতায় ঢেকে থাকে এমন খামারেও এটাই ঘটে। এইরকম পরিবেশে ক্ষুদ্র–আবহাওয়াপূর্ণ আর্দ্রতা (micro-climate humidity) বেশি থাকে কারণ ঘন গাছ–পাতায় ঢাকা ছায়া শীতল এই অঞ্চলগুলি বাতাসের আঘাত প্রতিহত করে এবং তাতে ভূতল বাষ্পীভবন ও উদ্ভিদের বাষ্পমোচনও কম হয়। সেটা শুষ্ক, জোর বাতাস বওয়া আবহাওয়ায় সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

গাছের ছাতার নিচে বাতাসের আর্দ্রতাকে মাটির হিউমাস (humus) সরাসরি শোষণ করে। তাই কখনও সখনও প্রয়োজন মতো সামান্য সেচের দ্বারাই জমির উপরিভাগের মাটির (top soil) স্যাঁতসেঁতে ভাব বজায় রাখা যায়। এর পাশাপাশি সক্রিয় মূলতন্তুগুলি যাদের থেকে গাছের মূল–ব্যবস্থার (root system) ওপরের মাথাটা (crown) তৈরি হয় — তারাও এই আর্দ্রতাকে শোষণ করে উপকৃত হয়।

যেখানে মাটির ভেদ্যতা বেশি অথবা মাটির ভিতরের ছিদ্রগুলি বড়ো এবং মাটির দানাগুলি বড়ো (যা সমস্ত ধরনের সজীব মাটির বৈশিষ্ট্য) সেই মাটির জলধারণ ও বায়ু–ধারণ ক্ষমতাও হয় বেশি।[৯] এরকম এক পরিবেশ, স্থানীয় চাষিরা যাকে বলে ‘ভ্যাপসা’ —– যেখানে মাটিতে যুগপৎ বাতাস ও জলকণা (উষ্ণতাও বটে) বর্তমান, সেই মাটিই গাছের স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আদর্শ। বেশি জল থাকলে ‘ভ্যাপসার’ অক্সিজেন সরবরাহকারী দিকটি বিঘ্নিত হয় এবং মাটির ক্ষতি হয় যা গাছের স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর।[১০]

এছাড়া দুর্বল নিকাশি ব্যবস্থায় অতিরিক্ত সেচের ফলে যখন সেচের জল বাষ্পীভূত হয়ে শুকিয়ে যায়, তখন মাটির উপরিতলে ক্রমবর্ধিষ্ণু সাদা নুনের গুঁড়ো জমে এবং নিশ্চিতভাবে মাটি লবণাক্ত হয়ে পড়ে। মাটির অভ্যন্তরে মূলের এলাকায় (root zone) জল জমে থাকে এবং এই প্রক্রিয়াটি দিনে দিনে ভারী সেচ সেবিত অঞ্চলগুলিকে বিশাল এলাকা জুড়ে ভিজে মরুভূমিতে পরিণত করছে।

কোথায় এবং কীভাবে?

ভাস্কর সাভের মতে আরেকটি সাধারণ ভুল হল, গাছের গোড়ায় নিচু গর্ত খুঁড়ে সেখানে সেচ দেওয়া, এর বদলে প্রসারিত মূল গুলির সক্রিয় ডগাগুলি যে অঞ্চলের মাটির নিচে থাকে সেখানে সরু একটি এলাকায় (অথবা গোল রিংয়ের মতো কেটে) যদি সেচ দেওয়া হয়, তাহলে জলের ছড়িয়ে যাওয়ার ও অতিরিক্ত বাষ্পীভবনের ক্ষতি কমিয়ে আনা যায়। এতে ভাসানো সেচের ফলে মাটির লবণাক্ত হয়ে পড়ার যে সমস্যা তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, এর ফলে মাটিতে বায়ু চলাচল

অব্যাহত থাকে এবং কাণ্ডের কাছে মূলতন্ত্রের মাথায় (crown of root system) শ্বসনের কাজটি ভাল ভাবে চালু থাকে।

তাই ভাস্কর সাভে তাঁরই উদ্ভাবিত মঞ্চ এবং খাদ (platform and trench) সেচ পদ্ধতি অণুসরণ করেন। এতে জল ব্যবহারের কার্যকারিতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। গর্তগুলি সেচ খাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই খাল কাটা হয় গাছের প্রতি সারির দুই দিকেই, গাছ থেকে মূলগুলি বাইরের যেদিকে ছড়িয়ে পড়ে সেই ধার বরাবর খালগুলি কাটা হয়, যাতে এই ছড়ানো মূলের ডগাগুলি সেই জল শোষণ করতে পারে। বুড়ো আঙ্গুলের নিয়ম মেনে মোটামুটি বলা চলে যে মাটির ওপরে পাতার ছাতা (canopy) যতখানি প্রসারিত হয়, মাটির নিচে পার্শ্বস্থ মূলের প্রসারও হয় ঠিক ততখানি, অথবা গাছের মাথার ঠিক ওপরে যখন সূর্য অবস্থান করে, তখন গাছের ছায়া যতখানি অঞ্চল জুড়ে পড়ে ঠিক ততখানি। সেচ খালগুলি কাটতে হবে এই ছায়ার কিনারা ধরে।

গর্তগুলি প্রায় ১৫ ইঞ্চি চওড়া ও ১২ ইঞ্চি গভীর। এগুলি বর্তমানে সাভের পরিণত বাগিচার ৫% স্থান অধিকার করে আছে। বাগিচায় এক একটি গর্ত/নালা দুটি সারি গাছের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত যাতে তারা দুই দিকের গাছেদের জলের যোগান দিতে পারে। বাগিচার বাকি ৯৫% জমিতে (অর্থাৎ মঞ্চগুলিতে যেখানে বৃক্ষ ও গুল্মগুলি বেড়ে ওঠে) আর কোনোরকম সার সরবরাহের প্রয়োজন পড়ে না।

এই ব্যবস্থাটি (মঞ্চ এবং গর্ত) তৈরি করা হয়েছে এমন এক এলাকা অনুযায়ী যে প্রাকৃতিক ভাবে আন্দোলিত ভূমিখণ্ডে (terrain) গাছ–গাছালির খুব ভালো বৃদ্ধি হয়। ভূমির ঢেউ খেলানো প্রকৃতির জন্য অতিরিক্ত বৃষ্টির জল গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে যায় না। ফলে যে খালগুলি সেচ খাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বর্ষার মাসগুলিতে তারা নিকাশি নালার কাজ করে।

এখানে খামারের ভূতলের অতি স্বল্প অঞ্চলে (১/২০ ভাগ) সেচ দেওয়া হয় এবং তা ঘন ছায়ায় ঢাকা স্পঞ্জের মতো ভেদ্য (porous) মাটিতে দ্রুত শোষিত হয়। একথা মনে রাখলে এটা সহজেই বোঝা যায় যে কেন বাষ্পীভবনের জন্য জলের অপচয় ও মাটির লবণাক্তকরণের সমস্যাগুলিকে কল্পবৃক্ষে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। বর্ষার মরশুমে এখানে যে ৮০ ইঞ্চির ওপর বৃষ্টিপাত হয়, তার অনেকটাই মাটি শুষে নেয় এবং ধরে রাখে।

মাটির উপরিভাগ যখন বৃষ্টির জলে সংস্পৃক্ত হয়, তখন তা চুঁইয়ে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ জলাধারে এবং প্রলম্বিত ভারী বর্ষণের সময় অতিরিক্ত জল

ভিজে নোনা মরুভূমিগুলি

মাটির লবণাক্তকরণ সেচ–নিবিড় কৃষির সবচেয়ে বড়ো সমস্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ হেক্টর চাষের জমি ধ্বংস হয়ে গেছে। যে জমিতে নিকাশি ব্যবস্থা ভালো নয় এবং বিশেষত শুখা অঞ্চলে (arid region) যেখানে বাষ্পীভবন হয় খুব বেশি, সেখানেই এই ক্ষতির মাত্রা সবচেয়ে বেশি।

ভাস্কর সাভে স্মরণ করিয়ে দেন, "শুধুমাত্র বৃষ্টিই হল তুলনামূলকভাবে বিশুদ্ধ পাতিত (distilled) জল। খাল, নলকূপ, কূয়ো ইত্যাদি থেকে যে জল সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়, তা মাটির সাথে যুক্ত থাকার কারণে সেই জলে ধাতব লবণ মিশে থাকে। (যত বেশি সময় জুড়ে এবং যত বেশি এলাকার মাটি জলের সংস্পর্শে থাকে তত বেশি ঘনত্বে ধাতব লবণ জলে দ্রবীভূত হয়ে থাকে।) খামারে যখন এই জল ব্যবহৃত হয়, তার কিছুটা বাষ্পীভূত হয় এবং ভূতলে লবণ রেখে যায়। জল বেশি বাষ্পীভূত হলে মাটিতে বেশী লবণ জমা হয়। এই প্রক্রিয়া চলতে চলতে মাটির পুরু স্তরে লবণ ঘনীভূত হয়।

মাটি বেশি নোনা হয়ে গেলে, তার বাতাস ও জলধারণ ক্ষমতা হারিয়ে যায়। মাটির ওপর পুরু স্তরে লবন জমা থাকলে বাতাস ও জল মাটির ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। এর ফলে গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার, কেঁচো ও জীবাণুরা মাটিতে অক্সিজেনের অভাবে মারা যায় এবং মাটি দ্রুত ধ্বংস হতে থাকে।

অতীতের ঐতিহ্যগত মিশ্রচাষ ও ফসলের আবর্তন ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করে আখ, বাঁশমতি চাল ইত্যাদি জলপেটুক অর্থকরী ফসল (cash crop) যেখানে সারা বছর ধরে চাষ করা হয় সেই মাটি ভয়াবহভাবে লবণাক্ত হয়ে পড়ে। রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে এই মাটির ভেদ্যতা (porosity) ও জল ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় এবং ভূতলে বাষ্পীভবন বেড়ে যাওয়ায় সমস্যা আরও ঘনীভূত হয়। রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে রাসায়নিকগুলির লবণও সেচের জলে দ্রবীভূত হয়ে শেষে মাটিতে লবণ বাড়িয়ে দেয়।

ভাস্কর সাভে বলছিলেন, মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলি ও বারামতী অঞ্চলে যেখানে প্রচুর আখ উৎপাদন হয়, সেখানে মাটির ভয়াবহ অবস্থা আমি

দেখেছি। এই ভয়াবহতা সৃষ্টি হয়েছে সেচ–নিবিড় এবং রাসায়নিক নিবিড় চাষের জন্য। এখানে মাটির স্বাদ গ্রহণ করলেই বোঝা যাবে মাটি কত ভয়ঙ্করভাবে লবণাক্ত।

"বেশি সেচ দেওয়ার ফলে আরেকটি যে সমস্যার উদ্ভব হয়, তা হল জলমগ্নতার (water logging) সমস্যা। অনেক জায়গায় ভূজল গাছের শিকড়ের এলাকায় পৌঁছে গেছে। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত মাটিতে একটা ঘাসের ফলকও জন্মাবে না।''

অনুরূপভাবে পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় বেশ কিছু অঞ্চল লবণাক্তকরণ ও জলমগ্নতার ভীষণ সমস্যায় ভুগছে। সেই অঞ্চলে উৎপাদনশীলতা পুনরুদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন। রাজস্থান ও কচ্ছে শুখা মরুভূমিকে নতুন করে সবুজ করে তোলা, বড়ো সেচ প্রকল্পগুলির জন্য সৃষ্ট নতুন ভিজে বা সিক্ত মরুভূমিগুলিকে সবুজ করার চেয়ে সহজতর।

বলা হয় সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিশাল সব শক্তিশালী সেনাবাহিনীরা যত না সভ্যতা ধ্বংস করেছে তার চেয়ে লবণাক্তকরণের সমস্যা অনেক বেশি সভ্যতার সংহারক। ৬০০০ বছর আগে মেসোপোটেমিয়ায় সুসা ও অন্যান্য যেসব নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল সেগুলি উন্নত সেচ ব্যবস্থার ফলে সমৃদ্ধ হয়েছিল। সেদেশে ২ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার পরও (বিদেশে) বিক্রির জন্য ফসল থাকত। আজ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস অঞ্চলের চারপাশ — একসময় যা উর্বর অর্ধচন্দ্রাকৃতি অঞ্চল বলে প্রসিদ্ধ ছিল — তার প্রায় সবটাই আজ মাইলের পর মাইল জুড়ে লবণে ভরে গিয়ে বন্ধ্যাভূমিতে পরিণত হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন) মতে সারা বিশ্বের সেচ সেবিত এলাকার অর্ধেক অঞ্চলই লবণাক্তকরণ ও জলমগ্নতার সমস্যায় ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লবণের এই আগ্রাসনের ফলে প্রতি বছর ১০,০০০ বর্গ কিমি জমি পরিত্যক্ত হয়।[১২]

ভারতে আনুমানিক ১ কোটি হেক্টর জমি প্রতি বছর জলমগ্ন (waterlogged) হয়ে পড়েছে এবং ২ কোটি ৫০ লক্ষ হেক্টর লবণাক্তকরণের ভীতির সম্মুখীন হয়েছে।[১৩]

খাদ দিয়ে বয়ে যায় — বিশেষত চ্যাপ্টা সমতল খাদে জল জমতে পারে না। ফলে তার পাশে কোনো গাছ থাকলে তার "সক্রিয় মূলদের'' ক্রমাগত

শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেনের কোনো অভাবে ঘটে না।

টীকা (:) ওপরে উল্লিখিত ব্যবস্থাটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল তুলনা–মূলকভাবে সমভূমিতে সেচ সেবিত নারকেল ও সবেদা ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য। অবশ্য সেচহীন সমতলভূমিতে বাগিচায় যেখানে আম, কাজু, জাম, বের, আতা, টেপারী ইত্যাদি ফলের গাছ লাগান হয়েছে, সেখানে খাদ (trench) অতিরিক্ত জলনিকাশে সাহায্য করে। যদিও এইরকম প্রয়োজনীয়তা সারা বছর জুড়ে কয়েক দিনের জন্য দেখা দিতে পারে যখন ভারী বর্ষণ দেখা যায়। মাটির ঢালে গাছ পুঁতলে, যদি খাদ (trench) কাটা হয়, তা কাটতে হবে ঢালের সীমারেখা বরাবর যাতে করে মাটিতে বৃষ্টির জল বেশি পরিমাণে শোষিত হয় এবং ভূমিক্ষয় আটকানো যায়।

বিপুলভাবে জল সংরক্ষণ করা এবং জলের ব্যবহার কমানো ছাড়াও কল্পবৃক্ষে সেচ সহ নিকাশি ব্যবস্থাটি সরল শ্রমসাশ্রয়ী, সহজে রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্যকর করা যায়, যদিও তা দূর নিয়ন্ত্রিত (remote controlled) নয়। ভাস্কর সাভে — এখন তাঁর বয়স আশির শেষের দিকে — তবুও তিনি এখনও তাঁর ১৪ একর খামারের সমগ্র সেচ ব্যবস্থাটির দেখাশোনা করেন নিজেই। (তাঁর ভয়, অন্য কেউ যদি দেখাশোনা করে তাহলে সে অসাবধানে বেশি সেচ দিয়ে ফেলবে।) তিনি যখন বাগিচার ছায়ায় হাঁটাচলা করেন, তখন প্রয়োজন অনুসারে কখনও জল বয়ে যাওয়া খাদের মুখের মাটি সরিয়ে বেশি জল প্রবাহের ব্যবস্থা করেন, আবার হয়তো কখনও কোনো খাদের মুখে একটু বেশি মাটি দিয়ে বুজিয়ে জলের প্রবাহ কমান বা বন্ধ করেন যাতে করে গাছের সারিগুলি পরিমিত মাত্রায় জল পায়।

চারা গাছগুলির পাশে সেচ–খাদগুলি কাটা হয় —– বেশি দূরে নয় —– ৯ ইঞ্চি দূরে, যাতে মূলেরা মাটির নিচে বেশি দূরে বিস্তৃত হতে পারে। খাদের আগেই তাদের শিকড়ের বিস্তার থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু চারাগাছ যতই বড়ো হতে থাকে, সেই বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে খাদও খেপে খেপে দূরে কাটা হয়। এতে গাছের মূলেরা জল পাওয়ার তাড়নায় জলের দিকে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হয় এবং দ্রুত বাড়ে। এইরকম ভাবে বিস্তৃত মূলের জাল গাছের পক্ষে দুরকম ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১) এর ফলে গাছের স্থায়িত্ব (stability) ও ভার বহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যাতে সে ভারী ঝড় সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়। ২) এর পাশাপাশি তাৎপর্যপূর্ণভাবে গাছের মূলগুলির মাটিতে বৃহত্তর বিস্তৃতি মানেই গাছ বেশি জায়গা জুড়ে শ্বাসকার্য্য, আর্দ্রতা ও খনিজ পুষ্টির রসদ সংগ্রহ করতে পারে।

তাই ভাস্কর সাভে সতর্ক করেন এই বলে যে কিছু বাবা-মা যেমন আতুআতু করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে গিয়ে তাদের কুঁড়ে বানাতে উৎসাহিত করেন, একজন চাষিরও গাছেদের ক্ষেত্রে তা করা উচিত নয়। গাছ নিজের চাহিদা মেটানোর জন্য নিজেই সচেষ্ট হয়ে মূলের বিস্তার ঘটায় — চাষির কখনই গাছেদের এই প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করা উচিত নয়। তা করলে গাছ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীকালে তা গাছের উন্নতিতে বেড়ি হয়ে দাঁড়ায়। এই বেড়িকে এড়ানো যায় যদি গাছ যত বাড়তে থাকে, খেপে খেপে খাদগুলোকে গাছ থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

খাদ বা খাদের কাছে যদি আচ্ছাদন (mulch) বা সার (manure) রাখা হয়, তাহলে বাতাস ও আর্দ্রতার উপস্থিতিতে মাটির ব্যাক্টেরিয়া কেঁচো ইত্যাদিদের কর্মকাণ্ডে সেগুলির (আচ্ছাদন ও সার) পচন ঘটে। সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সারে যে খনিজ পুষ্টিগুলি রয়েছে, জমিতে (in situ) চলে তাদের অবিরাম মন্থন এবং তারপর তারা সেচ বা বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হয়ে কৈশিক কার্যাবলীর (capillary actions) মাধ্যমে গাছের মূলরোম দ্বারা শোষিত হয়।



বাগিচায় সদ্য রোপিত চারা গাছগুলির জন্য সেচ খাল

ভাস্কর ভাই বলেন, “খাদগুলিতে আমরা মাটির ক্ষুদ্র জীবগুলির জন্য জৈব বর্জ্যের এক উৎকৃষ্ট ভোজনের ব্যবস্থা করি। এই ক্ষুদ্র জীবগুলির রেচন পদার্থ আবার গাছেদের জন্য খনিজ পুষ্টির এক স্বাস্থ্যকর ভোজন মেলে

ধরে যাতে গাছেরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে তা গ্রহণ করতে পারে। তাই কেউ ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত থাকে না। আবার এতে কোনো অপচয় হয় না বা আধিক্যের কোনো সমস্যা হয় না যা থেকে গাছদের ওপর কোনো বিষক্রিয়া হতে পারে — যেটা প্রায়শই ঘটে কৃষি–রাসায়নিক ব্যবহারে এবং ভাসানো বা প্লাবন সেচের দ্বারা ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে।''

তিনি আরও বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, গাছেদের প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়ার জন্য কোনো কর্ষণের (tillage) বা কৃষির (cultivation) প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের কোনো কর্ষণ যা মাটির জৈবজীবন ও গাছেদের মূল–ব্যবস্থার (root system) ক্ষতি করে — কার্যত তা নিস্ফলা। বহু মাস বা বছর ধরে সৃষ্ট বহু মাইল ধরে বিস্তৃত মূলেদের সূক্ষ্ম তন্তুর জাল (ওপরের সক্রিয় শীর্ষ অঞ্চল) মাত্র এক ঘন্টা মাটির কর্ষণে হারিয়ে যেতে পারে।

''কর্ষণের ফলে যদি এমনকি মূলেদের সামান্য অংশের ক্ষতি হয় বা তা জলে প্লাবিত হয় তাহলে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সালোকসংশ্লেষের কার্যকারীতা কমে যায়। সংগৃহীত সৌরশক্তির বেশীরভাগটাই ব্যয় হয় আঘাতপ্রাপ্ত মূল জালিকার পুনরুজ্জীবনে। ফলে ফুল ও ফলের বৃদ্ধিতে ব্যবহারযোগ্য সৌরশক্তির অভাব দেখা দেয়। এছাড়া গাছকে কেন্দ্র করে তাকে জোগান (input) সরবরাহের জন্য যেখানে নিয়মিতভাবে কর্ষণ করা হয়, সেখানে সুবিস্তৃত মূল–ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। ফল ধরার ফলে যদি গাছের ওজনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে, তবে তা দুর্বল ও বৃদ্ধিতে বাধাপ্রাপ্ত মূল–ব্যবস্থা (stunted root system) নিয়ে গাছের স্থায়িত্বের সমস্যা সৃষ্টি করে। গাছ 'মনে মনে' তার মূল–ব্যবস্থার এই দুর্বলতার কথা জানে। তাই সঙ্গত কারণেই তার ফল আসুক সে চায় না।''

আবার সমভূমিতে 'মঞ্চ এবং খাদ' ব্যবস্থার আর একটা সুবিধা হল এই যে এটি মাটির জীবদের জন্য একই সাথে ভিজে ও শুকনো পরিবেশ দেয়। এটি বর্ষার সময়ে গুরুত্বপূর্ণ। তখন কেঁচো ও অন্যান্য পোকারা অতিরিক্ত ভিজে খাদগুলি থেকে একটু ওপরে মঞ্চের দিকে সরে যায় যেখানে মাটি তুলনামূলকভাবে শুকনো। আর এটা করতে গিয়ে তারা মাটি কর্ষণ করে এবং মাটির (মঞ্চের) ওপরে উঠে এসে মলত্যাগ করে — যে মল বা কেঁচো সার পুষ্টিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

কোথায় তাদের জল প্রয়োজন তা গাছেরা জানান দেয়

বর্ষীয়ান জৈবচাষি শ্রী মহেন্দ্র ভাই[১৫] তাঁর মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে জানান যে গাছেরা আসলে কোথায় তাদের আর্দ্রতা প্রয়োজন তার সংকেত দেয়। তিনি কৃষকদের সুপারিশ করেন যে তারা যেন প্রতিটি প্রজাতির পাতাদের বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করে। "যদি বৃষ্টি হয় অথবা গাছের ওপরে জল ছেটানো হয়, তখন গাছের পাতাদের আকার ও বিন্যাস (pattern) লক্ষ্য করুন —— দেখবেন এসব কিছু পাতার ওপরে পড়া জলকে নিচের দিকে গড়িয়ে দেয়। আপনি এটা দেখতে পাবেন যে আখ, কলা, আদা ইত্যাদি গাছে জল টুপ টুপ করে গড়িয়ে গাছের কেন্দ্রীয় কাণ্ডের গোড়ায় মাটিতে পড়ছে। পেঁপে, আম, সবেদা, নারকেল (বাস্তবিকই বেশিরভাগ ফলের গাছ) ইত্যাদি অন্যান্য গাছের ক্ষেত্রে পাতাগুলি থেকে গাছের ছাতার সীমানা বরাবর জল পড়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর থেকে একজন চাষি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে বিভিন্ন প্রজাতির গাছেরা নিজ নিজ ভাবে ঠিক করে তাদের কোথায় জল প্রয়োজন।

কখন সেচ দিতে হবে

কখন সেচ দিতে হবে এবং কতটা,[১৬] কতক্ষণ বা কতদিন অন্তর তা দিতে হবে এবং কতটা —— এসব বিষয়ে ভাস্কর সাভের অন্তর্দৃষ্টি (insight) অত্যন্ত প্রখর। তিনি জানেন যতক্ষণ তার ফলের গাছগুলোর গায়ে যাবতীয় ক্রোটন (এক ধরনের বিরুৎ) 'জলমিটার' (water meters) খাড়াই ও চনমনে ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, ততক্ষণ মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে আর্দ্রতা থাকে এবং গাছে জল দেবার প্রয়োজন হয় না।

বাগিচায় ফলের চারাগাছগুলি (দু–বছর বয়সের কম) যেখানে থাকে, প্রধানত সেখানেই জলসেচ দেরিতে দিলে গাছের ক্ষতি হতে পারে। তাই যে চারাগাছগুলি বাড়ছে তাদের পাশে দাঁড়ানো ক্রোটন গাছগুলি যদি ঝিমিয়ে পড়ে —— তাহলে এই সংকেতই তাকে সচকিত করে যে চারাগাছগুলির শীঘ্রই জলের প্রয়োজন — সেই দিন বা পরের দিন।

বাগিচার যে অংশে গাছেরা বড়ো হয়ে গেছে, সেখানে ক্রোটনের পাতারা ঝিমিয়ে পড়লেও বড়ো গাছগুলির গভীরতর মূল–ব্যবস্থার ফলে সেই গাছেরা মাটির গভীরতর অঞ্চল থেকে আর্দ্রতা শুষে নিতে পারে। এর বিপরীতে ক্রোটনের মূল মাটির নিচে বড়ো জোর ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত যেতে পারে। কখনও কখনও এই অগভীর মূলের গাছেরা দুপুরে কুঁকড়ে যেতে পারে। কিন্তু তা

সন্ধ্যায় চনমনে হয়ে পাতা মেলে ধরে। দিনেরবেলায় এই পাতা কুঁকড়ে যাওয়ার ফলে বাষ্পমোচনের হার অনেকটা মন্দীভূত হয় এবং গাছকে জল ধরে রাখতে সাহায্য করে।

ক্রোটন 'জলমিটারদের' সংবেদের (response) ভিত্তিতে ভাস্কর ভাই সাধারণ প্রত্যাশার বিরোধী এক আবিষ্কার করেছিলেন — গ্রীষ্মকালে গাছেদের সেচের প্রয়োজন হয় শীতকালের চেয়ে কম। গ্রীষ্মে ২৫–৩০ দিন অন্তর একবার সেচ দিতে হয়, কিন্তু শীতে এক পক্ষকালে অন্তত একবার সেচ দিতে হয়। এর কারণ হল এই উপকূল অঞ্চলে গ্রীষ্মে বাতাসে আর্দ্রতা থাকে শীতকালের চেয়ে বেশী এবং দিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গাছের ছায়ায় কখনও খুব বেশি বাড়তে পারে না। ভোরের দিকে শিশিরও ঘনীভূত হয় খুব বেশি। হিউমাস বা পাতা পচা সার এইরকম পরিস্থিতিতে আর্দ্রতা শোষণ করে খুব বেশি।[১৭]

যারা এই যুক্তি মানতে নারাজ ভাস্কর সাভে তাদের আরও বিশদে ব্যাখ্যা দেন, "শীতে আমাদের ঠোঁট ও ত্বক বেশি ফাটে। তার কারণ হল শুকনো বাতাস। তেমনিভাবে কাপড় কেচে আমরা যে দড়ি বা তারে শুকোতে দিই তাও শীতকালে তাড়াতাড়ি শুকায় কারণ কাপড়ের জল/আর্দ্রতা গ্রীষ্মের গুমোট আবহাওয়ার চেয়ে শীতের শুকনো বাতাস বেশি তাড়াতাড়ি শোষণ করে।"


ঝিমানো ক্রোটন


খাড়াখাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা ক্রোটন

এটাও তাৎপর্যপূর্ণ যে ভারতের জঙ্গলের বহু গাছে গরমকালে বর্ষা আসার আগেই[১৮] নতুন পাতায় ভরে ওঠে। বিষয়টি বছরের এই সময়ে আবহাওয়ার উচ্চতর আর্দ্রতার (humidity) সাথে যুক্ত। মাটির হিউমাস রাত্রি বেলায় এই আর্দ্রতাকে শুষে নেয়। সেখান থেকে গাছও আর্দ্রতা/জলকণা সংগ্রহ করতে পারে।

শীতকালের থেকে গ্রীষ্মকালে কম সেচের প্রয়োজন — এই বিষয়টি অবশ্যই শুখা অঞ্চলের (arid region) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ শুখা অঞ্চলে গ্রীষ্ম অত্যন্ত গরম ও শুকনো হয় এবং সেখানে গাছেদের বৃদ্ধি হয় এত কম যে খামারের মধ্যে ক্ষুদ্র-আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য আর্দ্রতা ধরে রাখা সম্ভব হয় না।

কম হলে আরও ভালো, কিছু না হলে সবচেয়ে ভালো

পরিণত গাছেরা তাদের পরিবেশ এবং আমাদের দেখভাল করে। এর বদলে তাদের চামচে করে খাইয়ে লালন করা হাস্যকর। যখন ছোটো চারারা বড়ো হয়, তাদের ছাওয়া বাষ্পীভবনের কারণে জলের অপচয় কমিয়ে আনে। মাটিও তখন বেশি জল শোষণ করতে পারে এবং উর্বর হয়ে ওঠে। ফলে প্রথম বছরের তুলনায় অত ঘনঘন সেচ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সার দেওয়ার প্রয়োজনও কমে আসে।

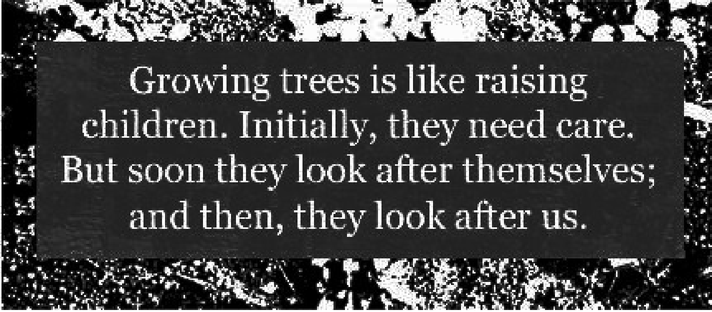
"একজন মায়ের পক্ষে তার নবজাত সন্তানের প্রতি পরিপূর্ণ নজর দেওয়াই স্বাভাবিক। এইরকম সুকোমল বেড়ে ওঠার সময় শিশুটি তার মায়ের দুধ, উষ্ণতা ও যত্নের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কিন্তু যখন শিশুর সমস্ত দুধ-দাঁত বের হয়ে যায়, তখন এই নির্ভরশীলতা অর্ধেক কমে যায়। যখন সে নিজে নিজেই হাঁটতে পারে, চান করতে পারে, তখন তার নির্ভরশীলতা আরও কমে আসে। শেষে যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন সে সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

সেইরকম গাছ যখন বাড়তে থাকে এবং তার মূলগুলির বৃদ্ধি হতে থাকে, চাষির জোগানের (input) ওপর তার নির্ভরশীলতা ধীরে ধীরে কমে আসে। এটার কারণ হল বিস্তৃত মূলেরা গাছকে সাহায্য করে যাতে সে মাটির দূরতর ও গভীরতর এলাকা থেকে আর্দ্রতা ও পুষ্টির প্রয়োজন মেটাতে পারে। ইত্যবসরে প্রাকৃতিক কৃষির নীতি অনুসরণ করে মাটির স্বাস্থ্য বিশেষত তাতে (মাটিতে) উদ্ভিজ্জ সার বা হিউমাসের বৃদ্ধি ঘটে যাতে সমস্ত রকম উদ্বেগের কারণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

ভাস্কর সাভে বলেন, "আমাদের উচিত মানুষের লালন কর্মের বাইরে

থাকা জঙ্গলের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা খুঁজে পাওয়া।'' তবুও যদি আমাদের মনে হয় আমাদের পরিণত ফলন্ত গাছেদের সেবা করা উচিত, তাহলে গাছগুলির শৈশব অবস্থায় আমরা যতটা সার দিতাম তার ৫% থেকে ১০% পর্যন্ত দিতে পারি। উদ্যানবিজ্ঞানের (horticulture) এটি একটি কাণ্ডজ্ঞান-নির্ভর নীতি। "ছোটো গাছদের পরিচর্যা লাগে কম, তারা ফল দেয় কম। পরিণত গাছদের পরিচর্যা লাগে কম, তারা বেশি ফল দেয়।'' কিন্তু একথার মানে এই নয় যে সামগ্রিক ভাবে মাটির চাহিদা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে একজন চাষি উদাসীন থাকবে।[১৯]

"দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক চাষি বাড়ন্ত চারাদের যা লাগে তার বিপরীতটাই করে। তারা জোগান (input) (জৈব অথবা রাসায়নিক) ১২৫% থেকে ১৫০% পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয় একথা ভেবে যে বড়ো গাছের চাহিদা বেশি এবং জোগান বেশি দিলে ফলনও বেশি হবে। এটি লোভের বশবর্তী হয়ে অবিবেচকের মতো অত্যাচার। অতিরিক্ত জোগান শুধুমাত্র অপচয়ই নয়, বরং অনেক সময় তা ক্ষতিকারকও বটে।



গাছপালাদের বড় করা শিশুদের প্রতিপালনের মতো।
শুরুতে তাদের যত্নের প্রয়োজন
কিন্তু শীঘ্রই তারা নিজেদের দেখভাল করে
আর তারপর, তারা আমাদের দেখভাল করে

কেজি কেজি আলমন্ডস, পেস্তা ইত্যাদি দামি সব বাদাম জোর করে খাইয়ে আপনি আশা করতে পারেন না যে কাউকে আপনি শক্তিশালী করে তুলতে পারবেন। অতিরিক্ত প্রোটিন শরীরকে বিষিয়ে দেয়। যতক্ষণ কিডনি সক্রিয় থাকে স্বাস্থ্যবান শরীর সেই বিষ শরীর থেকে বের করে দেয়। সেইরকমই একটা গাছে যদি জোর করে অতিরিক্ত পুষ্টি সরবরাহ করা হয়, সাধারণভাবে সে তা গ্রহণ করে না।

এটাও তাই মোটেই আশ্চর্য্য হওয়ার বিষয় নয়, চাষিরা যে তাদের ফসলে বিপুল পরিমাণ ইউরিয়া প্রয়োগ করে, তা ভূতলে বয়ে গিয়ে ঝরনা এবং নদীগুলিকে দূষিত করে নতুবা চুঁইয়ে মাটির তলে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলিকে দূষিত করে তোলে। আবার এই ইউরিয়ার অনেকটা অংশ বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসে মিশে যায়।

হিউমাস ও রাসায়নিক জোগানের (input) দ্বন্দ

গাছের মূলেরা খাদ্য হিসাবে হিউমাসকে খুবই পছন্দ করে। এটা একটা সহজ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। হিউমাসে ভরা একটি জার (jar) নিয়ে তার মুখটা খোলা রেখে জৈবভাবে সক্রিয় কোনো গোচারণভূমির ভূতলের চার ইঞ্চি নিচে বসান। ছয় সপ্তাহ পরে দেখা যাবে স্পঞ্জের মতো বাদামি বস্তুটি (যা আসলে হিউমাস) অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং জারটি সাদা রোম সহ (hair) অসংখ্য মূলে জমাট হয়ে ভরে আছে। সমস্ত হিউমাস খেয়ে ফেলে — মাটির শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত গ্রহণ করে — মূলেরা ভীষণ বিস্তৃতি পেয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত হিউমাস উদ্ভিদ শরীরে রূপান্তরিত হয়েছে।

১৯৫০–৬০ দশকে যখন রাসায়নিক সারের প্রসার ঘটানো হচ্ছিল বিরাট ভাবে, তখন কৃষিবিজ্ঞানীরা রাসায়নিক সারের ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি দিয়ে দাবি করেছিল যে তারা আসলে উদ্ভিদের প্রয়োজন অনুসারে অজৈব রূপে (organic form) পুষ্টি সরবরাহ করছে। এটা কিন্তু তাদের চোখ এড়িয়ে গেল (overlooked) , প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় যে হিউমাস তৈরি হয় তাকে জৈব বস্তু থেকে অজৈব খনিজরূপে অনেক কার্যকর ভাবে পুনঃচক্রাকারে (recycled) ব্যবহার করা হয়। আমাদের সমৃদ্ধ বনভূমিতে ও ঐতিহ্যশালী মিশ্র খামারগুলিতে এটাই ঘটে থাকে যাতে করে বনভূমি বা মিশ্র খামারের উর্বরাশক্তি হাজার হাজার বছর ধরে মোটেই কমে না।

ক্রান্তীয় (tropical) ও আধা–ক্রান্তীয় (sub-tropical) অঞ্চলগুলিতে জৈব বস্তুর পচন ও বিশ্লিষ্টকরণের (decomposition) হার ইউরোপ ও আমেরিকার বেশিরভাগ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের থেকে অনেক বেশি, বিশেষত ক্রান্তীয় ভিজে অঞ্চলে (wet tropics) গরম, আর্দ্র পরিবেশে মাটির সংস্পর্শে আসা জৈব বর্জ্যকে ভেঙে ফেলার জন্য অনেক বেশিসংখ্যক ব্যাক্টেরিয়া সক্রিয় থাকে। তাই গাছেরা পৌনঃপুণিকভাবে প্রচুর পরিমাণ খনিজ পুষ্টি পেয়ে থাকে।

অবশ্য ক্রান্তীয় বর্ষায় (tropical monsoon) মাটির উপরিভাগের

(top-soil) কাছে নতুনভাবে চক্রাকারে (recycled) পুষ্টিগুলি জড়ো হয়।

মুষলধারে বৃষ্টি হলে এবং ঝোড়ো বাতাস বইলে সেগুলির দ্রুত ক্ষয় হয় অথবা তারা মাটির নিচে চুঁইয়ে প্রবেশ করে। এর ফলে মাটিকে রক্ষা করতে গাছ–গাছালি দিয়ে ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক এবং মাটির ওপর জৈববস্তু যেমন বর্জ্য পাতা, ফসলের অবশেষ, যেমন খড় ইত্যাদি দিয়ে তৈরি একটা

হিউমাস — স্বাস্থ্যের পরশপাথর

হিউমাস হল একটি ঘন, স্পঞ্জের মতো খুব ভালো শোষণকারী (absorbent) *বস্তু যা স্বাস্থ্যকর মাটির উপরিতলে থাকে। এটি মূলত আংশিকভাবে জারিত* (oxidised) *বা উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ অবশেষের অর্ধবিশ্লিষ্ট* (half-decomposed) অংশ। এর সাথে মিশে থাকে ছত্রাক (fungi) *বা ব্যাক্টেরিয়া থেকে নির্গত বিভিন্ন ধরনের পদার্থ যেগুলি এই বর্জ্য বস্তুদের গঠনকারী উপাদানে ভেঙে ফেলে।*

হিউমাস আবার আঠাল 'সিমেন্টের' জোগান দেয় যা মাটির ভিতরে ক্ষুদ্র ধাতুকণাগুলিকে যুক্ত করে বৃহত্তর কণায় পরিণত করে এবং তা করতে গিয়ে মাটির কণাগুলির ভিতরে ছিদ্রগুলির ব্যবধান বজায় রাখে এবং মাটির ক্ষয় আটকায়। অনুরূপভাবে বর্জ্য পাতার, মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অর্ধবিশ্লিষ্ট (semi decomposed) *অবশেষ — যা তার আদি তন্তুজ গঠনের কিছুটা বজায় রাখে — মাটির সুক্ষ্মতর ধাতুকণাগুলিকে জল আকারে রক্ষা করে এবং ভূমিক্ষয় রোধ করে।*

হিউমাস বৃষ্টির জল সহ বিশ্লিষ্ট বস্তু (decomposed matter) *থেকে পাওয়া দ্রবীভূত খনিজ ধরে রাখে যা থেকে গাছ তার পুষ্টি সংগ্রহ করে। এছাড়া শীতল হিউমাস বাতাসের বাষ্প থেকে সরাসরি আর্দ্রতা শুষে নিতে পারে এবং তা করতে গিয়ে এমনকী বৃষ্টির অনুপস্থিতিতেও মাটির আর্দ্রতা বা ভেজা ভাব বজায় রাখে। প্রতি ২৪ ঘন্টায় এইভাবে প্রতি বর্গ ফুট জমি ২৫০ থেকে ৫০০ মিলি বাতাসের ভাসমান জলকণাকে শুষে নিতে পারে, বিশেষ করে যেখানে মাটির হিউমাস বর্জ্য পাতা ও খড়ের আচ্ছাদনের দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।*[২০]

যেহেতু প্রকৃতিতে জৈববস্তু বিশ্লিষ্ট হয়ে খনিজ রূপে পরিবর্তিত হওয়ার প্রক্রিয়া চলতেই থাকে, ভূতলের পুষ্টি জোগানও অব্যাহত থাকে, আর তাই হিউমাস ক্রমাগত পুনুরুৎপাদিত হতে থাকে।

প্রকৃতির জীবনচক্রে ভাঙন ও পুনঃবৃদ্ধির (regrowth) মধ্যে সুন্দর এক ভারসাম্য থাকে। কিন্তু কৃষি রাসায়নিকের ব্যবহারে শুধু ক্ষয়ের প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয়, যদি না জরুরি ভিত্তিতে তাকে থামানো যায়, তা প্রাকৃতিক পুনঃসৃষ্টির (regeneration) শেষের শুরুকে চিহ্নিত করে।

নাইট্রোজেন জাতীয় সার — যার শুরু পাশ্চাত্যের অস্ত্র শিল্পে[২১] — হিউমাসের ওপর এক দানবীয় আক্রমণ। এটি মাটির জৈব পদার্থের জারণ প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে। এতে জল শোষণকারী মাটির ভারী কণাগুলি ধ্বংস হয়ে ক্ষুদ্র ধূলিকণায় পরিণত হয় এবং বাতাস ও বৃষ্টির দ্বারা উড়ে যায়। ফলে মাটির বাতাস ও জলধারণ ক্ষমতা হারিয়ে যায়।

কেঁচো, পিঁপড়ে, উই ও অন্যান্য জীব —যারা মাটি খোঁড়ে এবং মাটির উর্বরাশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে — তারা কৃষি রাসায়নিকদের বিষাক্ত প্রভাব ও অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়। এই সমস্যা আরও বেশি বেড়ে যায় গভীর কর্ষণ ও অতিরিক্ত সেচের জন্য। এইভাবে চাষি নির্ভরশীলতার এক পাপচক্রে জড়িয়ে পড়ে যাতে তাকে আরও বেশি বেশি জোগান (input) ও অতিরিক্ত শক্তির (energy) খরচের জোগান দিতে হয়।

অবশ্য যদি চাষি হিউমাস তৈরির প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে তাহলে ফসলের ওপর তার গভীর প্রভাব পড়ে। অ্যালবার্ট হাওয়ার্ড বলেন, "উর্বর মাটি ও সমৃদ্ধ কৃষির চাবিকাঠি হল হিউমাস। পাতারা স্বাস্থ্যে ঝলমল করে, ফুলেদের রঙ হয় গভীর, মূলের বৃদ্ধি ঘটে বিপুলভাবে। মান, স্বাদ ও ধারণ শক্তিতে শাক-সবজি ও ফলেরা হয় উৎকৃষ্ট। পরিমাণে কম খাবার খেলেই পুষ্টি পাওয়া যায় ... পোকামাকড় ও ছত্রাক জনিত রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী ব্যবস্থাও হয় মজবুত।"[২২]

হিউমাসের কার্পেট বা গালিচা দিয়ে মাটিকে বেঁধে রাখতে হয়।

বিপরীতে, কৃষি-রাসায়নিকদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা হল কম ভয়ংকর এবং ইউরোপ ও আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ পরিস্থিতিতে সেগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। সেখানে মাটিতে শুধু বিশ্লিষ্টকারী (decomposing) ব্যাক্টেরিয়া কম থাকে তাই নয়, শীতে তুষারপাতের ফলে নিচের জৈব বস্তুদের অজৈব ধাতুতে ভেঙে যাওয়া আটকিয়ে তা সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে। একারণেই নাতিশীতোষ্ণ দেশে মাটির জৈব বস্তুর গুণমানের অবস্থান (status) যথেষ্ট

উন্নত। কার্বনজাত দ্রব্যের একটা অতিরিক্ত কুশান বা ঢাকা থাকার ফলে মাটি অধিক পরিমাণে কৃত্রিম নাইট্রোজেন শুষতে পারে।[২৩]

সেখানে রাসায়নিক জোগান (input) নাতিশীতোষ্ণ ভূমিতে জৈব বস্তুকে গঠনকারী উপাদানগুলিতে ভেঙে ফেলার কাজকে দ্রুততর করলেও ক্রান্তীয় ও আধা–ক্রান্তীয় অঞ্চলের মতো মাটি থেকে জৈব বস্তুদের ক্ষয় সাধন করে না। কারণ সেখানে স্বাভাবিকভাবেই এই বিশ্লিষ্টকরণের হার ইতিমধ্যেই বেশি, আবার সেখানে ভারতের মতো ভারী বর্ষণও হয় না। ফলে নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহারে মাটির ক্ষয় ও দূষণ উভয়ই তুলনা–মূলকভাবে কম।

এমনকী নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলিতেও কৃষকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে সুপারিশ করা হয়েছিল যাতে তারা রাসায়নিক সারের সাথে যথেষ্ট পরিমাণে জৈব সারেরও ব্যবহার করে। আবার চাষিদের এটাও শেখানো হয়েছিল যাতে তারা সূক্ষ্মভাবে জোগানগুলির (inputs) মাত্রা ও অনুপাত বজায় রেখে চাষের খেতে প্রয়োগ করতে পারে। এতদসত্ত্বেও এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে পাশ্চাত্য দেশগুলিও রাসায়নিক পদ্ধতি থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ঘুরে দাড়াচ্ছে। সেখানে কয়েক দশক আগে, কেউ যা স্বপ্নে ভাবতে পারত না, তার চেয়েও দ্রুতগতিতে জৈব চাষের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে মনে হচ্ছে, ভারতের কৃষি পরিচালনের সংস্থাগুলি মাটির সম্পূর্ণ ধ্বংসের লক্ষ্যে ঝুঁকে পড়ে নতুনতর গতিতে এগিয়ে চলেছে। এটা চলতেই থাকবে যতক্ষণ না আমাদের সুস্থ বোধ ফিরে আসবে। বর্তমানে উত্তরোত্তর বেশি পরিমাণে রাসায়নিক ব্যবহারের লাগাম টেনে ধরার কোনো ইঙ্গিতই দেখা যাচ্ছে না। বরং ভারতের পূর্বাঞ্চলে যেখানে রাসায়নিকের ব্যবহার জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেকটাই কম, সেখানে সবুজ বিপ্লব ছড়িয়ে দেবার কথাবার্তা চলছে।

প্রকৃতিতে ফেরা

অবশ্য এখনও সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি, কারণ নিজেকে সুস্থ করে তোলা এবং আমাদের দেখভাল করার এক বিরাট ক্ষমতা রয়েছে প্রকৃতির। ভাস্কর সাভে বলেন, “যা মাটি থেকে এসেছে তা মাটিকে ফেরত দেওয়া হল আমাদের ধর্ম বা কর্তব্য। উদ্ভিদের ধর্ম বা জীবনের উদ্দেশ্য হল বেড়ে ওঠা ও ফল দেওয়া।”

“বীজ বপন করার পর তা অঙ্কুরিত হয় প্রাকৃতিকভাবে। মাটিতে তার মূলের বৃদ্ধি ও ঘটে প্রাকৃতিকভাবে। তেমনি পাতা, ফুল ও ফলের আবির্ভাব

—— এসবও প্রাকৃতিক ব্যাপার। যখন ফল পরিণত হয়, আমাদের কাজ শুধুমাত্র তা তোলা। ফলে এখানে সমস্যটাই বা কোথায়?''



২০৫০ সাল পর্যন্ত তেল থাকতে পারে।
আমাদের মাটি থাকবে না!

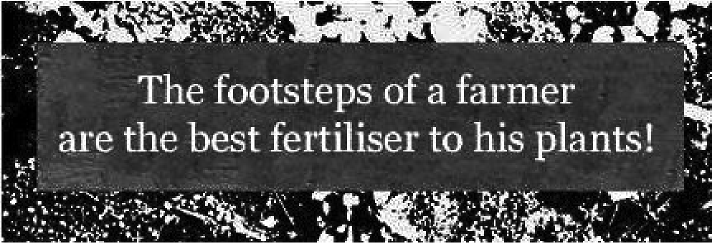
বাস্তবিকই যতদিন কৃষিকাজকে ধর্মজ্ঞান করা হত —— মনে করা হত এটি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন মেটানোর উপায় —— ততদিন কৃষিকে কেন্দ্র করে কোনো সমস্যা ছিল না। একজন চাষি জানত প্রকৃতির ক্ষেত্র (domain) কোনটি এবং মাটির থেকে তুলে খেতে হলে তার কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়, সে ভালোভাবেই জানত।

প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষিকাজ, এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন যে এক রহস্যময় অব্যর্থ বুদ্ধি (a mysterious unfailing intelligence) সমস্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলিকে পরিচালনা করে। এর এক সোনালি নিয়ম হল "অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চল''। কিন্তু যেখানে লোভের আধিপত্য, সেখানে প্রকৃতির প্রাজ্ঞতায় বিশ্বাস রাখা কঠিন। এ কারণেই ভাস্করভাই বলেন যে প্রাকৃতিক কৃষি ও আত্মিক স্বাস্থ্য বিবর্তনের একীভূত প্রক্রিয়ায় হিংসাকে পরিহার করে হাত ধরাধরি করে চলে।

ভাস্করভাই বলেন, "যখন বীজ অঙ্কুরিত হয় তখন দুর্জ্ঞেয়ভাবে (miraculously) অসংখ্য জীবাণুর আবির্ভাব ঘটে। নবাঙ্কুরের চারপাশের মাটি —— যদি আগে আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকত তা আবার সজীব হয়ে ওঠে। প্রথম পাপড়ির মতো যে পাতারা আবির্ভূত হয়, তাদের দেখে মনে হয় তারা যেন ক্ষুদ্র হাতগুলি প্রার্থনার ভঙ্গিতে জড়ো করে মিনতি করে বলছে, "আমাদের ফুটে উঠতে দাও।'' এই কারণেই বীজ বপনের পর কোনো রকম কর্ষণ বা মাটিকে আঘাত করা প্রাকৃতিক চাষে নিষিদ্ধ। এর ফলে শুধু মাটির জীবাণুরাই নয়, মূলতন্তুগুলিও রক্ষা পায়।

কিছু না করা? (do nothing?)

যদিও প্রাকৃতিক খামারে কায়িক শ্রম লাগে আধুনিক খামারের চেয়ে অনেক কম, কিন্তু সেখানে দৈনন্দিন সমান দৃষ্টি দেওয়া বাধ্যতামূলক, তাই বলা হয়, "চাষির পদক্ষেপগুলিই তার গাছেদের জন্য সেরা সার।'' বৃক্ষের (tree) ক্ষেত্রে প্রথম কয়েক বছর ধরে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ধীরে ধীরে তারা যত আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে, চাষির কাজও তত কমে আসে। শেষে ফসল তোলা ছাড়া তার আর কিছুই করার দরকার পড়ে না।



একটি কৃষকের পদক্ষেপগুলি হল
তার গাছপালার শ্রেষ্ঠ সার!

মাঠ–ফসল যেমন ধান, গম, বিবিধ ডাল ও শাক–সবজি বৃদ্ধির জন্য বছরের পর বছর ধরে তাদের নিজ নিজ মরশুমে কিছু নজর না দিলেই নয়। একারণেই ভাস্কর সাভে তার মাঠ–ফসল বৃদ্ধির পদ্ধতিকে নাম দিয়েছেন জৈব চাষ। আর পরিণত গাছ–ফসলের ক্ষেত্রে 'কিছু না করা' প্রাকৃতিক কৃষির (do nothing natural farming) বিশুদ্ধ রূপই তিনি অনুসরণ করেন। অবশ্য মাঠ–ফসলের ক্ষেত্রেও প্রকৃতির প্রাজ্ঞতার শ্রেষ্ঠত্বকে সম্মান জানিয়ে কৃষকের হস্তক্ষেপকে ন্যূনতম রাখাই বাঞ্ছনীয় যাতে হিংসার প্রকাশও হয় ন্যূনতম।

কৃষির পাঁচটি ভাবনা

পৃথিবী জুড়ে কৃষিকে কেন্দ্র করে সমস্ত কর্মকাণ্ডের পাঁচটি প্রধান ক্ষেত্র রয়েছে। সেগুলি হল ১। কর্ষণ ২। উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য জোগান (input), ৩। আগাছা পরিষ্কার করা, ৪। সেচ এবং ৫। ফসলের সুরক্ষা। ভাস্কর সাভে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কৃষি অনুশীলনের এই পাঁচটি প্রধান দিক নিয়ে সংক্ষিপ্তসার করেন এইভাবে :

১। কর্ষণ
গাছ–ফসলের ক্ষেত্রে কর্ষণ একবারেই অনুমোদনযোগ্য। চারাগাছ পোঁতা বা বীজ বপনের আগে মাটি আলগা করার জন্য কর্ষণ করা হয়। চারা রোপণের পর মাটির ভেদ্যতা (Porosity) বা ঝুরুঝুরু ভাব এবং মাটিতে বায়ু চলাচলের (aeration) দেখভালের কাজগুলি সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হয় মাটির জীব ও মাটিতে গাছের মূলগুলির ওপর।

২। উর্বরতার জন্য জোগান (fertility inputs)
নিরবচ্ছিন্ন উর্বরতার জন্য ফসলের অবশেষ ও জীব–ভর (bio-mass) খামারের মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া এক অতি আবশ্যিক কর্ম। যে খামারে জীব–ভরের অভাব, সেখানে প্রাথমিকভাবে জৈব প্রদেয় জোগান দেওয়া ভালো। অবশ্য কোনো রকম রাসায়নিক সার ব্যবহার করা উচিত নয়।

৩। আগাছা নাশ করা (weeding)
আগাছা নাশ করা ব্যাপারটিকে এড়িয়ে যেতে হবে। যদি আগাছারা বৃদ্ধিতে ফসলকে ছাপিয়ে যায় এবং তা ফসলের উদ্ভিদের ওপর সূর্যালোককে ঢেকে রাখে তাহলেও তাদের উপড়ে ফেলা উচিত নয়।[২৪] তাদের ওপর থেকে ছেঁটে ফেলে সেই ছেঁটে ফেলা বর্জ্য দিয়ে মাটিকে ঢেকে দিতে হবে। কিন্তু কোনো রকম গুল্মনাশক (Herbicides) ব্যবহার করা উচিত নয়।

৪। সেচ
সেচ হওয়া উচিত সংরক্ষণশীল। মাটিতে একটা ভেজাভাব (dampness) বজায় রাখার জন্য যতটুকু জলের প্রয়োজন ততটুকুই দিতে হবে। মাটি যদি গাছ–পাতায় সম্পূর্ণ ঢেকে রাখা যায়, বিশেষত বহু–স্তরের (multi-storied) গাছপালায় এবং মাটির ওপরে যদি ঘাস–পাতার ঘন আস্তরণ (mulching) রাখা যায়, তাহলে জলের প্রয়োজন অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

৫। ফসলের সুরক্ষা
প্রকৃতির বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট খাদক (predators) প্রজাতির দ্বারা জৈব নিয়ন্ত্রণের ওপর ফসলের সুরক্ষা সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্যবান মাটিতে স্বাস্থ্যকর জৈব পদ্ধতিতে নানাবিধ ফসলের চাষ (Poly-cultures) করলে তা মারীপোকা আক্রমণকে সফলভাবে বাধা দিতে পারে। এক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতিও হয় ন্যূনতম এবং ক্ষতি আপনা–আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। বড়ো জোর কিছু অরাসায়নিক ব্যবস্থা যেমন নিম,

দেশি গরুর চোনা লঘু করে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এটাও শেষ বিচারে অপ্রয়োজনীয়। ('পতঙ্গ, মারীপোকা নয়', এই অধায়টি দেখুন)

এইভাবে প্রকৃতিতে ফিরে — আদিতে যে কাজগুলি ছিল প্রকৃতির — সেগুলি তাকে সমর্পণ করলে ভগ্নপ্রায়, আধুনিক চাষি তার পিঠের বিশাল ভার থেকে মুক্ত হয়। আর শুরু হয় মাটির পুনরুজ্জীবনের কাজ।

স্থানিক পরিবেশ–পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো

ভাস্করভাই তাঁর খামারের ভ্রমণার্থী চাষিদের সতর্ক করে বলেন যে তারা যেন তাঁকে অন্ধের মতো অনুসরণ না করে। তিনি বলেন, "আমার ভুল হতে পারে ... অথবা আমি যা করছি তা আমার পরিস্থিতিতে সঠিক হতে পারে। কিন্তু আপনার পরিস্থিতিতে তা নাও হতে পারে। ... অনুকরণ করার বদলে আপনি বরং উদ্ভিদের চাহিদাগুলির পিছনে কোন বুনিয়াদি নীতিসমূহ রয়েছে এবং প্রকৃতি কীভাবে কাজ করে সেগুলি বুঝতে চেষ্টা করুন এবং এই বোধের সাথে আপনার অভিজ্ঞতাকে মেলান। যতক্ষণ না আপনি নিজের নিরীক্ষণ ও বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করছেন সেগুলি থেকে আপনি শিখতে পারবেন না এবং ভুল করতেই থাকবেন। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলিতে হস্তক্ষেপ (interfere) করার আগে আপনি যদি দশবার ভাবেন তাহলে আপনি সুরক্ষিত আছেন এটা মনে করা যুক্তিসঙ্গত হবে। বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতিতে কী করতে হবে এবং কী করতে হবে না — এই বোধ আপনার আসবে ধীরে ধীরে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে।"

আধুনিক চাষের বৈশিষ্ট্য হল, এই চাষে কিছু বাঁধা ধরা ফরমূলা অনুসরণ করা হয়। সেখানে প্রাকৃতিক চাষে কিন্তু প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণের (observation) কোনো বিকল্প নেই। চাষিকে তার জমি ও আবহাওয়ার সাথে বাধ্যতামূলক ভাবে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। আসলে আমাদের সংকীর্ণ মানসিক–ধাঁচাকে আমরা প্রকৃতির ওপর জোর করে চাপাতে গিয়েই দুঃসহ অবস্থাকে ডেকে আনি। এমনকী প্রাকৃতিক কৃষির বুনিয়াদি নীতি অনুসরণকারী তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের স্থানিক পরিবেশ–পরিস্থিতি এবং উদ্ভিদের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

উদাহরণ স্বরূপ সাভে বলেন, একই রকমের মাঠ–ফসল, যেমন ধান বা গম ফলানো যেতে পারে। কিন্তু একজন চাষিকে তার নিজের জায়গা থেকে ৩০০ কিমি দূরে পাঠান, সেখানে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত — আমাদের এই তিনটি প্রধান ঋতুতে প্রকৃতিতে পরিবেশ–পরিস্থিতি কেমন থাকে তা বুঝতে

তার একবছর লেগে যাবে। অঞ্চলের খাপ খাওয়া প্রজাতিগুলি ও তাদের বৈচিত্র্য বুঝতে অঞ্চলের চাষিদের কাছ থেকে তার বুদ্ধি-পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন হবে।

সমগ্র ভারত জুড়ে এবং প্রতিটি রাজ্যেই রয়েছে জমির বিপুল বৈচিত্র্য। শুধুমাত্র স্থান-বৃত্তান্তই যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়। ধাপহীন (un-terraced) জমির ঢাল যেখানে ৩০ ডিগ্রির বেশি — সেখানে, বিশেষত, ভূমিক্ষয় রোধে ও মাটিতে সর্বোচ্চ জল শোষণের জন্য বৃক্ষই সবচেয়ে উপযোগী। মৃদুভাবে আন্দোলিত জমিতে স্থানীয় জোয়ার (local millet), বিভিন্ন ধরনের ডাল, শাক-সবজি, কন্দ ও তিল ইত্যাদির চাষ করা যেতে পারে। বর্ষায় জল জমে থাকে এমন নাবাল জমিতে শুধুমাত্র ধান ছাড়া কার্যত আর কিছু চাষ করা যায় না।

স্থানিক জলবায়ু, ক্ষুদ্র পরিসরে আবহাওয়ার অবস্থা (micro-climatic conditions) মাটির জীব ও অণুজীব ইত্যাদি ছাড়াও মাটির প্রকৃতি, জলধারণ ক্ষমতা, নিকাশি ইত্যাদি ব্যাপারেও এদেশে মাটির বিপুল বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপভাবে এদেশে প্রাকৃতিক বৃক্ষাদি ও গাছপালার বিপুল বৈচিত্র্য দেখা যায়। এ সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করেই একটি অঞ্চলে কোন কোন ফসল ও দেশজ কোন প্রজাতিগুলি উপযোগী হবে এবং ভালোভাবে বেড়ে উঠতে পারে তা নির্ধারণ করতে হবে।

কল্পবৃক্ষে একটি সাইনে (sign) লেখা এক সূত্র বলছে, ‘‘কবিতা রচনা বা ফুলের মালা গাঁথার মতোই প্রাকৃতিক কৃষি হল এক কোমল, সুন্দর ও সংবেদনশীল কাজ।’’

টীকা এবং উল্লেখিত গ্রন্থাদি

১। Secretsof the Soil by Peter Tomkin and Christopher Bird, Perennial Library, HArper and Raw, 1990, pg. 4. এই বইটির লেখকরা আরো হিসাব করেছেন যে সমস্ত অণুজীবগুলির শরীরের ওজনের যোগফল হল মানুষ সহ সমগ্র প্রাণীদের শরীরের ওজনের ২৫ গুণ।

২। An Agricultural Testament by Sir Albert Howard, (first Published in London, in 1940,) Indian Edition, Earthcare Books, 2006, pg.116. ‘‘মাটির বিভিন্ন জীবসহ সক্রিয় মূলদের অক্সিজেনের নিরবিচ্ছিন্ন যোগানের প্রয়োজন।’’ ১৩৯ পৃষ্ঠায় হাওয়ার্ড আরো বলেছেন, ‘‘বর্ষার শুরুতে ও শেষে যখন ভূতলের মাটিতে প্রচুর পরিমাণ বাতাস ও আর্দ্রতা থাকে, তখন মূলের বৃদ্ধি হয় সর্বোচ্চ। ভারী বর্ষণের সময় মাটিতে বায়ু চলাচল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন গাছের মূলেরা মাটির গভীরে না গিয়ে মাটির উপরিতলে বাড়তে থাকে বেপোরোয়াভাবে অক্সিজেনের সন্ধানে।

৩। অধ্যাপক দাভোলকার বিষয়টিকে আরেক রকমভাবে বুঝিয়েছেন। একটি উদ্ভিদকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলুন। তার মূলে যতটা মাটি লেগে আছে তা ধুঁয়ে ফেলুন, এবার উদ্ভিদটিকে খুব ভালভাবে শুকান, আর তারপর একটি ধাতু পাত্রে সম্পূর্ণ পুড়িয়ে ফেলুন।পাত্রে যতটা ছাই পড়ে রইল সেই ওজনই উদ্ভিদটি মাটি থেকে সংগ্রহ করেছে, বায়ু বা জল থেকে নয়। তিনি আরো বলেন একটি কিচেন গার্ডেনে ১০০ বর্গফুট অঞ্চল জুড়ে যতটা উদ্ভিদ থাকে তাদের থেকে এইভাবে দুই বা তিন মুঠো ছাই পাওয়া যাবে — সেটা হল মাটি থেকে আহরণ করা সমস্ত খনিজের সমান। (Ref. `City Farming, S.A. Dabholkar Dr. Joshi City Farming Institute', 1994,pg.5)

৪। The Web of Life by John Storner, 1953, Mentor, pg.32.

৫। পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা – ৩২।

৬। An Agricultural Testamant. pg.23-তে স্যার অ্যালবার্ট হাওয়ার্ড লিখছেন যে উদ্ভিদের ভাল বৃদ্ধির প্রাথমিক শর্তটি হল ভূতলের ভিতর দিকে (Internal Surface) –মাটির কণাগুলির মধ্যবর্তী ছিদ্রগুলি (The pore Space) যতবড় হয় তত ভাল। এই ছিদ্রগুলির দেওয়ালগুলিতে জলের সুক্ষ্ণ ফিল্ম গুলিতে ঘেরা থেকে, মাটির ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক ও অণুজীবদের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড গুলি ঘটে, এই সমস্ত কর্মকান্ড শ্বসনের ওপর নির্ভর করে, যার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের যোগান অত্যান্ত জরুরী। তাই

মাটিতে যাতে অক্সিজেন চলাচল করতে পারে এটা দেখা বাধ্যতামূলক।
৭। (The web of life by John H. Storner, 1953, Mentor, pg. 32

৮। মূলের আঁশের মত রোমগুলি অম্ল নিঃসরণ করে, যা পাথরের গায়ে খনিজগুলিকে দ্রবীভূত করে। এই খনিজকে দ্রবীভূত করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই রোমেরা পাথর খেয়ে খেয়ে পাথরের ভিতর দিয়ে বাতাস, আর্দ্রতা ও মাটির পথিকৃৎ জীবগুলির প্রবেশের পথ করে দেয় এবং এরই ফলে পাথরের ক্ষয় (Weathering) চলতেই থাকে। তাপমাত্রা বদলের ফলে পাথরে চিড় দেখা যায় এবং বিভিন্ন ঋতুতে পাথরের বৃদ্ধি ও সংকোচন ও দেখা যায়। তাছাড়া বৃষ্টি পড়বার সময় তারা বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে কার্বনিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। কার্বনিক ও অন্যান্য অ্যাসিড ও সৃষ্টি হয় মাটিতে জৈব বস্তু পচনের ফলে। বহুবছর ধরে এই অ্যাসিডরা ধীরে ধীরে পাথরের তল থেকে আরো বেশি মাত্রায় খনিজকে দ্রবীভূত করে, এই প্রক্রিয়ায় পাথরের নীচের স্তরে অনেক গর্ত (Crevices) সৃষ্টি হয় যেখানে জল জমতে পারে। যে আর্দ্রতা দ্বারা পাথরের নীচের স্তরের লবণ দ্রবীভূত হয় তা গাছের মূল ব্যবস্থার (root system) উপরিতলে উঠে আসে, যেখানে এই মূল ব্যবস্থা বিশাল সব পাম্পের মত কাজ করে।

৯। বিভিন্ন মাটির বিভিন্ন জলধারণ ক্ষমতা নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা বোঝা যায়।

এক কেজি করে বিভিন্ন ধরনের (শুকনো) মাটির নমুনা সংগ্রহ করন। প্রতিটি মাটির নমুনাকে একটি কাপড়ে ভালভাবে মুড়ুন। এরপর এই কাপড় মোড়া মাটি জলে ভিজিয়ে রাখুন — প্রতিটিই পনের মিনিটের জন্য। এবার প্রতিটি নমুনা থেকে কাপড় সরিয়ে তাদের আলাদা আলাদা করে মাপুন, যাতে করে প্রতিটি মাটির নমুনা কতটা করে জল শুষেছে তা বোঝা যায়। কয়েক ঘন্টা পর প্রত্যেকটিকে আবার মাপুন। এবার মাটি কতটা জল ধরে রেখেছে তা আপনি ওজন থেকে বুঝতে পারবেন। দেখা যাবে যে জৈব, ভেদ্য মাটি রাসায়নিক সেবিত মাটির থেকে অনেক বেশি জল শুষেছে এবং ধরে রেখেছে।

এই পরীক্ষার এক সামান্য বদলানো রূপেও দেখা যাবে যে সমস্ত জৈব (জীবিত) মাটিতে জল নিকাশও হয় খুব দ্রুত —উপরিতলে জমে থাকা জল ক্রমাগত নীচে চুঁইয়ে পড়ে অতিরিক্ত জল বের করে দেয়। তারা আবহমন্ডলীর সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে বেশি হাওয়ার

যোগানের ব্যবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনে। রাসায়নিক মাটিতে জল শোষণের কম ক্ষমতার সাথে সাথে জলনিকাশের ক্ষমতাও খুব কম। নতুন ভারী মাটি যেমন কাদা ও পলি ক্ষুদ্র কণাসহ আটসাট ভাবে জড়িয়ে থাকে —সেই মাটির জল ধারন ক্ষমতা খুব বেশি। কিন্তু যেহেতু এই জাতীয় মাটির নিকাশী ক্ষমতা খুবই কম, এই মাটি বায়ুর অভাবে ভোগে। স্কেলের আরেকটি দিকের শেষে —মোটা আলগা দানার মাটিতে জল নিকাশ হয় অত্যন্ত ভাল এবং তা শুকায় ও খুব তাড়াতাড়ি, কিন্তু বাতাসের অভাবের সমস্যা এই ধরনের মাটিতে বিরল।

বাস্তবত সমস্যাটির দু'টি চূড়ান্ত দিক হল জল জমে থাকা অথবা খুব বেশি মাত্রায় জল বেড়িয়ে যাওয়া — এই দুটি ত্রুটিই শুধরানো যায় মাটিতে বেশি পরিমাণে জৈব বস্তুর যোগান দিয়ে। কারণ মৃত গাছ–পাতাদের একটা দারুন ক্ষমতা হল তারা আলগা গঠনের বালি মাটিকে বেঁধে রাখতে পারে। তারা আবার কাদা ও পলির মত ঘন মাটিকে ভেঙে ফেলতে পারে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা বেশ সুক্ষ্ম দানার দোঁয়াশ মাটি তৈরি করে যার রয়েছে দুটি সুবিধা : ১। ভাল জল ধারন ক্ষমতা, ২। ভাল জল নিকাশী ক্ষমতা।

১০। এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে গাছের মূলেদের শ্বসন ক্রিয়া কখনও বৃষ্টির দ্বারা বিঘ্নিত হয় না। কিন্তু আপনি বৃষ্টির সমপরিমাণ জল কোনো গভীর বোর ওয়েল থেকে দিন, দেখবেন গাছের মূলের শ্বসনের ক্ষতি হবে। কারণ গভীর বোর ওয়েলের জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কম। কিন্তু বৃষ্টি হল অক্সিজেন সংস্পৃক্ত দ্রবন।

১১। (Turning up the Heat by Fred Pierce, Paladin, 1989, pg.5)

১২। `The Viloence of Green Revolution`, by Vandana Shiva, 1989, pg. 88, Third World Network.

১৩। পূর্বে উল্লেখিত পৃষ্ঠা ৫৪, PAO স্ট্যাটিসটিকস্ উদ্ধৃতি করা হয়েছে,

১৪। বিল মলিশন লিখেছেন যে বেশির ভাগ গাছেদের ক্ষেত্রে মূল ব্যবস্থার (root system) ৮০–৯০% থাকে মাটির ওপরের দিকে ৬০ সেমির মধ্যে। এটি হাজার হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত মূলরোম দিয়ে তৈরি যা ভূতলের কাছাকাছি একটা মাদুরের মত ছড়িয়ে থাকে। মাত্র ১০–১২% মূলভর এর নীচে থাকে (দু ফুটের নীচে)। কিন্তু কিছু কিছু মূল পাথর ভেদ করে ৪০ মিটার গভীরে প্রবেশ করতে পারে। (`Permaculture : A designor's Manual` by Bill Mallison, Tagari, 1988, pg. 150.)

১৫। বহু দশকের জৈবচাষ কর্মী শ্রী মহেন্দ্র ভাটের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকে প্রাপ্ত।
১৬। সাধারণত অপরাহ্নে বা সন্ধ্যায় সেচ দেওয়া ভাল। এতে বাস্পীভবন কম হয় এবং গাছের মূলের আঘাত বা শক কম হয়। তাছাড়া কম বয়সী কোন গাছের পরিণত গাছের তুলনায় একটু বেশি বা বার বার জল দিতে হয়। গাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে তার মাথার ওপর পাতার ছাতা বিকশিত হলে মাটি হয় ছায়াময়, বাস্পীভবনও কম হয় ফলে, সেচের প্রয়োজনও কমে আসে। অভিজ্ঞ চাষিরা যাদের দেখার চোখ তৈরি হয়েছে তারা দেখতে পান, গাছ 'জানান দিচ্ছে' তাদের জলের দরকার আছে কিনা।
১৭। উপকূল অঞ্চলে গাছেদের ওপর ঘনীভবনের (condensation) ফলে (এবং মাটির হিউমাস দ্বারা বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতার সরাসরি শোষণ) বিভিন্ন রূপে মাটিতে যে জল নেমে আসে সেই অধক্ষেপের (Precipitation) সমগ্র পরিমাণের প্রায় ৮০–৮৫% পর্যন্ত হতে পারে, একথা লিখেছেন বিল মলিসন, op at pg. 144
১৮। বর্জ্য পাতারা মাটিকে ঢেকে রেখে তীব্র রোদ ও বৃষ্টির বাড়ির হাত থেকে রক্ষা করে, বর্ষা জোরদার হয়ার আগেই নতুন গাছ–পাতারা সজীব ও সবুজ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে যা বৃষ্টির হাতুড়ির বাড়ির থেকে মাটিকে আরো বেশি সুরক্ষা দেয়। তা না হলে বৃষ্টির আঘাতে প্রচুর উপরিতলের মাটি নষ্ট হতে পারত বিশেষত ঢালু অঞ্চলে।
১৯। যদি ফসলের সমস্ত অবশেষ ও আবর্জনা ধর্মীয় নিষ্ঠায় মাটিতে ফেরৎ দেওয়া হয়, তাহলে দিনে দিনে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু পরিণত গাছের মূলেরা মাটির নীচের স্তর থেকে (Sub-soil) এবং নীচে পাথর গুলি থেকে দ্রবীভূত খনিজ পাম্প করে মাটির ওপরে তোলে, গাছেরা পুষ্টির অভাবে ভোগে না।
২০। মোহন দেশ পান্ডে, জৈব চাষি, ১৯৯৪ সালে বিদাদা কচ্চে একটি জমায়েতে বলেছিলেন, যেখানে ভাস্কর সাভেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। শ্রী দেশপান্ডে তার বর্ক্তৃতা শুরু করেন নাটকীয়ভাবে, "কে বলে কচ্চে বৃষ্টি হয় না।"
২১। "যুদ্ধের শেষে আমেরিকায় ১৮টি নতুন অ্যামোনিয়া কারখানা, যেগুলি তৈরি করা হয়েছিল বিস্ফোরক প্রস্তুত করবার জন্য —তাদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের জন্য নতুন বাজার ধরা বাধ্যতামূলক হয়ে দাড়ালো। ডু–পন্ট, ডাউ, মনসান্টো, আমেরিকান সিনামাইড তাদের যুদ্ধকালীন বিশাল লাভ সহ আরো বেশি বেশি সার উৎপাদন করতে লাগল অক্লান্ত চাষিদের ওপর ঢালবে বলে।

(`Secrets of the Soil` op cit. pg. xvii)
২২। `An Agricultural Testamant` by Albert Howard op cit pg. 28-30
২৩। `Organic farming`, pg. 18 transcript and key note address by Dr Shailendra Nath Ghosh at the National Convention on Organic farming`, Sambardhan, 1984.
২৪। ফলের গাছগুলির চারপাশে সাধারণত কর্ষণ কাজ করা হয়। কিন্তু ভাস্কর সাভে তা করেন না। শুরুতে তার লক্ষ্য হল মাটিকে সবুজ গাছ–পাতায় (তা আগাছা হোক অথবা শাক–সব্জী) ঢেকে দেওয়া এবং তা বজায় রাখা। এটিই হল বাগিচা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে তার প্রথম কাজ এবং কর্ষণের কাজ কখনও নয়, আগাছা খুব বেড়ে গেলে বড়জোর তাদের অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঠেকাতে তাদের ছেঁটে ফেলে তা দিয়ে মাটির ওপর আচ্ছাদন তৈরি করা যেতে পারে। এইরকম ছাঁটার কাজ বছরে এক বা দু'বার করা যেতে পারে। এর ফলাফলও হয় খুব ভাল।

ফুকুওকা বলেন, ‘‘কুড়ি বছর আগে জাপানের কোনো বাগিচায় ঘাসের একটাও ফলক (blade) দেখা যেত না। আমার মত বাগিচা লক্ষ্য করে লোকজন বুঝতে শুরু করল যে ফলের গাছ আগাছা বা ঘাসেদের মধ্যে বেশ ভালোভাবেই বাড়তে পারে। আজ ঘাসে ঢাকা বাগিচা সারা জাপান জুড়ে খুবই সাধারণ দৃশ্য।’’

স্মৃতি : স্মরণ

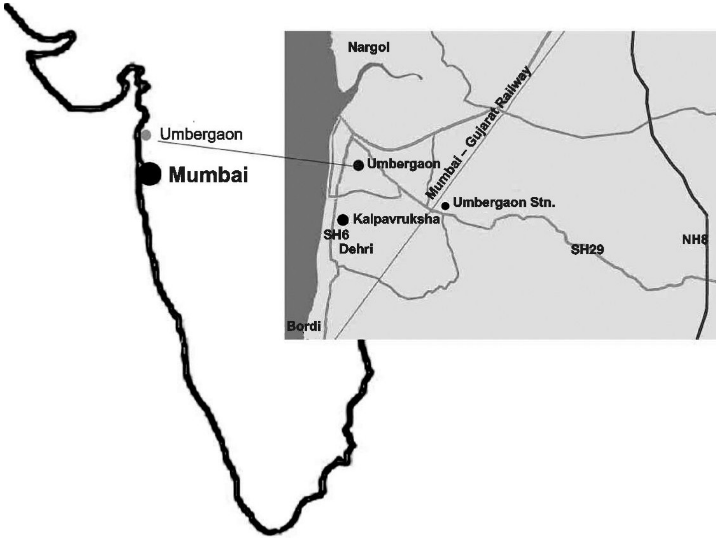


৪

ভাস্কর সাভে জন্মেছিলেন দক্ষিণ গুজরাতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রের লীলাভূমি উপকূলের এক মনোরম গ্রাম দেহরিতে। দিনটা ছিল ১৯২২ সালের ২৭ জানুয়ারি। তাঁর মা ও বাবা জানকী ও হীরাজি ছিলেন ওয়াডাল সম্প্রদায়ের।

চাষবাস বইছে সাভে পরিবারের রক্তে আর ওয়াডাল কথাটার অর্থ হল খামার–লালনকারী। গ্রামের ভূমির খতিয়ান–রক্ষক অফিসে লিপিবদ্ধ আছে ভাস্কর সাভের পূর্বপুরুষদের নাম, যারা আট প্রজন্ম ধরে ওই অঞ্চলে চাষবাস করে আসছে।

তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলির কথা স্মরণ করে ভাস্করভাই স্মৃতিমেদুর কণ্ঠে বলে চললেন, “তখন জীবন ছিল সরল। যদিও তখন বিদ্যুতের মতো





গাছটির মা এবং আদিবাসী উপকথা

মনোমুগ্ধকর শৈশবের স্মৃতি প্রসঙ্গে সাভে বললেন, "আমাদের বাড়ির কাছে একটা ছোটো গাছ বেড়ে উঠছিল। একদিন আমার মনে হল, "গাছটা আমার চেয়ে বেশি দ্রুত বাড়ছে। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে কী করে গাছটা তার সমস্ত চাহিদা মেটায়? আমার খিদে পেলে আমি রান্নাঘরে যাই, মা আমাকে খেতে দেয়। গাছটার মা কে হতে পারে?''[১]

"আমার কৌতূহল বেড়েই চলল। গাছটার ভিতরে কী আছে তা দেখতে আমি তার ছাল ছাড়ালাম। আরও বোকামি করে গাছের মূলগুলো খুঁড়লাম —— আর মায়ের চড় খেলাম। কিন্তু প্রশ্নটা আমার রয়েই গেল।''

ছেলেবেলায় আশপাশের অঞ্চলে যাওয়ার সময় বাবার সঙ্গী হত ভাস্কর। গরুর গাড়ি চড়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে তার মনে হত যেন সে এক স্বপ্নের সুড়ঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে —— তার চারপাশ জুড়ে নানা রহস্যের আবরণ। অপূর্ব এক সুগন্ধ। একটা পাখি ডেকে উঠল, বাতাসে আন্দোলিত পাতাদের শব্দ, স্যাঁত করে কী একটা জীব ছুটে গেল, কানের ভিতরে কীসের এক গুনগুন, একটু ফাঁকা মাঠে রোদ পড়েছে, কুমড়ো লতা মাটিতে বয়ে চলেছে ... আর তারপর সুন্দর সব ছোটো ছোটো বাড়িঘর, তাদের মাটির দেওয়ালে অপূর্ব সব আঁকজোক।

ভাস্কর সেখানকার ওরলি আদিবাসীদের সাথে পরিচিত হলেন। এই আদিবাসীদের জীবনশৈলী ও সংস্কৃতি যেন এক মুগ্ধতার ঝরনাধারা। ঈশ্বর গাছেদের মাঝে বাস করেন —— তাদের এই বিশ্বাসে তিনি মুগ্ধ হলেন। এই গাছেদের কখনও কাটা হত না, যতক্ষণ না তারা শুকিয়ে গিয়ে শরীরের শেষ সবুজটুকু ঝেড়ে ফেলে ... কয়েক দশক পরে বৃক্ষরোপণ হয়ে উঠল সাভের এক তীব্র আবেগ —— ঈশ্বরকে এক আনন্দময় আমন্ত্রণ।

আধুনিক সুবিধাগুলো ছিল না, মানুষজন ছিল যথেষ্ট সুখী। কৃষি ছিল এক ভরিয়ে তোলার পেশা — আধুনিক পদ্ধতির দ্বারা যা হয়ে উঠেছে উদ্বেগে ভরা এক বিচ্ছিন্ন লড়াই — এমনটা নয়, লোকজন তাদের শ্রম ভাগ করে নিত এবং প্রায়শই একে অপরের জমিতে গল্প করতে করতে, রঙ্গ রসিকতা করতে করতে, আবার কখনও বা সমবেতভাবে গান গাইতে গাইতে বীজ বুনত বা ধান কাটত।

বর্ষার আগমনের সাথে সাথেই শুরু হত ব্যস্ততার মরশুম। অঞ্চলের বেশিরভাগ গ্রামবাসীদের মতোই সাভে পরিবার চাল, ডাল ও শাকসবজি ফলাত। গাছ–ফসলের রোপণ তাদের চিরাচরিত কৃষিকাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সম্ভবত এর কারণ হল চারপাশের সমৃদ্ধ বনভূমি ও গ্রামের প্রতিবেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে ফল–ফলাদি ও বৃক্ষ–জাত উৎপন্ন ফসল পাওয়া যেত। তাই ফলানোর থেকে ফসল সংগ্রহ করার দক্ষতার প্রয়োজন ছিল বেশি।

অবশ্য লোকজন জঙ্গল থেকে তাদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর চেয়ে বেশি গ্রহণ করত না। এই অঞ্চলে জঙ্গল থেকে অতিশোষণ শুরু হল এখানে বহিরাগত ব্যবসায়িক স্বার্থ প্রবেশ করার সাথে সাথে — এর শুরু ইংরেজ উপনিবেশিকদের আগমনের সাথে।



ভাস্কর সাভে ও তার পরিবারের সাথে মাসানোবু ফুকুওকা, ১৯৯৭



জঙ্গলের ওরলি আদিবাসীগণ

আদিবাসীরা হল প্রাচীন ভারতের আদি বাসিন্দা। বস্তুত আদি–বাসী কথাটির অর্থ হল আদি–কাল বা স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাসকারী মানুষজন। ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে আদিবাসীরা সামূহিকভাবে বিশাল অঞ্চলের জমির অধিকার ভোগ করত।

ভাস্কর সাভের খামার সংলগ্ন অঞ্চলের ওরলি আদিবাসীদের বসুন্ধরা–বান্ধব (earth-friendly) *জীবন–সংস্কৃতির ওপর মনোমুগ্ধকর এক নিবন্ধে উইনিন পেরেরা লিখেছেন, "তারা নিজেদের জঙ্গলের রাজা বলে ঘোষণা করে ... যদিও তারা জঙ্গলের শোষণকারী নয়, বরং জঙ্গলের রক্ষক। জঙ্গলের বদান্যতাকে তারা কখনও অতিরিক্ত ভোগের দ্বারা নষ্ট করে না।"*

"কিন্তু ওরলিদের জঙ্গল কেড়ে নিয়ে ব্রিটিশরা জঙ্গল ধ্বংস শুরু করল। নৌবাহিনী, রেলপথ ও সামরিক প্রয়োজনে নিধন করল জঙ্গল।"[২]

পেরেরা বলছেন, "স্থানীয় আদিবাসীদের কাছে প্রকৃতি হল পবিত্র এবং তাঁকে তারা পূজা করে। তারা তাদের ঈশ্বরকে 'হিরবা' নামে ডাকে। 'হিরবা' মানে হল সবুজ। হিরবাকে ঐতিহ্যগতভাবে সমস্ত সম্পদের উৎস মনে করা হয়। তারা প্রকৃতির উৎপাদনকে মানুষের শ্রমের ফসল বা তাদের সম্পত্তি বলে মনে করে না, বরং মনে করে তা হিরবার দান। মা–মাটিকে তারা জীবন্ত ধরিত্রী — তাদের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় দেবী বলে মনে করে। কানসারি হল তাদের শস্যের দেবী, গাভভারী হল গরুর দেবী, পালঘাট হল বৃক্ষ ও উর্বরতার দেবী। জীবনের প্রতি তাদের এই ভালোবাসা ছুঁয়ে যায়, এমনকী ক্ষুদ্রতম জীব ও উদ্ভিদকে।[৩]

উইনিন পেরেরা আরও বলেন, "যদি একটি অতি প্রভেদকারী (differentiated) *সমাজ আত্ম–ধ্বংসী হয় অথবা অন্যদের শোষণ করে টিঁকে থাকে, সেই সমাজ নিজেকে সভ্য বলে দাবি করার অধিকার হারায়। ... (বিপরীতে) সৃষ্টির অখণ্ডতাকে সংরক্ষণ করার ক্ষমতা হল সভ্যতার একটি মাপকাঠি। তাদের (ওরলী) সংস্কৃতি আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িককে, প্রাণ* (living) *ও জড়* (non-living) *–কে এক অচ্ছেদ্য অখণ্ডতায় বেঁধে রেখেছে।"*
(১২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন "ওরলি আদিবাসীদের সুস্থায়ী জীবন সংস্কৃতি)



ভাস্কর সাভে জানালেন যে এই অঞ্চলে সবেদা বাগানের প্রসার ঘটে ইরানিরা এখানে বসবাস করার পর। যদিও পারসিরা পারস্য থেকে জলপথে এখানে এসেছিল বহু শতাব্দী আগে। তারা উজানে ভেসে আসে ভারলী নদীর মুখ পর্যন্ত, যেখানে নদীটি সমুদ্রে মিশেছে, সেখানে তারা উমের গ্রাম ছাড়িয়ে কয়েক কিলোমিটার উজানে সঞ্জন গ্রামের কাছে নামে। বাহমান কাইকোবাদ[৪] লিখিত আদি ফার্সি কবিতা থেকে ভাষান্তরিত 'কিসসে-ই-সঞ্জন' নামক গ্রন্থে এই কাহিনি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

কয়েক শতাব্দী পরে যখন ইরানিরা আসে, পারসিরা ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছে বিরাট সব জমির মালিক, যেখানে আদিবাসী শ্রমিকরা আবর্তন পদ্ধতিতে বিভিন্ন মাঠ-ফসল চাষ করত। এই অঞ্চল সংলগ্ন প্রাচীনতম পারসি আবাসস্থলগুলি হল সাবগল, সঞ্জন, দেহরি ও সারন্দা। ইরানিদের মতো অনেক পারসিও বাগিচা ফসলে, বিশেষত সবেদা বাগান তৈরিতে উদ্যোগী হয়।

স্থানীয় আদিবাসী ও অন্যান্য কৃষকদের বেশিরভাগই বর্ষার জলে ধান, ডাল ও শাক-সবজি ফলিয়ে পাশাপাশি কিছুটা বনজ ফসল ও সমুদ্র-জাত খাদ্য সংগ্রহ করেই খুশি থাকত। এখানে পুষ্টির কোনো সত্যিকারের অভাব ছিল কার্যত বিরল। স্বাস্থ্য সম্পদে মানুষ ঝলমল করত, এই সমৃদ্ধ অঞ্চলে এখনও বহু মানুষ তাই করে।

ধান কাটার পর অন্যান্য কাজকর্ম থাকে।[৫] আবার দেখার, ভাবার ও প্রকৃতির দানগুলিকে উপভোগ করবার জন্য তাদের যথেষ্ট অবকাশ থাকত। সুসময় জুড়ে প্রায়শই উদ্‌যাপন হত সামাজিক উৎসবের। কিন্তু কোনো মরশুমে হয়তো কারোর ফসল ভালো হল না, তখন সে বা তারা প্রতিবেশী বন্ধুদের দ্বারস্থ হতে পারত যারা তাকে/তাদের পূর্ববর্তী বছরের উদ্বৃত্ত ফসল দিয়ে সাহায্য করত।

এরকম একটা পরিবেশে ভাস্কর সাভে বেড়ে উঠেছিলেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা হল পুরোনো ব্যবস্থার সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত (আজকের দশম শ্রেণীর সমতুল্য)। তারপর তিনি প্রাইমারি ট্রেনিং সার্টিফিকেট (পিটিসি) পাশ করেন এবং স্কুলে শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি দশ বছর ধরে স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

সমুদ্রের এক উপহার ও অন্যান্য মাইলস্টোন

১৯৪০ সালে ১৭ই অক্টোবর এক ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক ঝড়ে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। কয়েকদিন পর গ্রামবাসীরা আনন্দের সাথে লক্ষ্য করল যে ঝড়ের

দাপটে শত শত ঝুনো নারকেল সমুদ্র সৈকতে এসে জড়ো হয়েছে। আসলে এটি ঘটেছিল এক ব্যবসায়ীর জাহাজ সমুদ্রের ঝড়ে ডুবে যাওয়ার ফলে।



মালতিবেন ও ভাস্করভাই সাভে

ভাস্করের বয়স তখন ১৮। তিনি আর তাঁর বন্ধু জগগু ছিলেন পোক্ত সাঁতারু। নারকেলগুলোকে গোল করে ঘিরে ভাসিয়ে নিয়ে আসার জন্য একটা দীর্ঘ তার নিয়ে তাঁরা সাঁতরে ঢুকে পড়েছিলেন সমুদ্রের অনেকটা গভীরে। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁরা ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে ফিরে এসেছিলেন — অবশ্য তাঁদের সঙ্গে ছিল বিরাট এক নারকেলের স্তূপ যেগুলি আজও রয়ে গেছে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়ে। সমুদ্র থেকে পাওয়া এই নারকেলের অনেকগুলোকে রোপণ করা হয়েছিল গোপাল বাগে। কৃষ্ণ-মন্দিরের পাশে এই বাগিচাটি ভাস্করের বাবা কয়েক বছর আগে লিজে নিয়েছিলেন। চারাগুলি স্বাস্থ্যকর গাছ হিসাবে বেড়ে উঠল এবং ফল দিতে লাগল। বহু বছর পর সাভে দ্বিতীয়

প্রজন্মের নারকেলগুলি রোপণ করেন তাঁর কল্পবৃক্ষ খামারে। এই গাছগুলি এখন প্রচুর পরিমাণে ফল দিচ্ছে। আবার তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মের নারকেল গাছগুলিও বেড়ে উঠেছে।

১৯৪০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভাস্কর সাভে শিক্ষকতা শুরু করেন। তখন থেকেই শুরু হল তাঁর দীর্ঘ কর্মব্যস্ত দিনগুলি। কারণ জেগে থাকা সময়ের সমস্তটাই হয়ে উঠল তাঁর কাজের সময়। সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত তিনি পারিবারিক খামারের দেখাশোনা করতেন। তারপর সামান্য খাবার খেয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে পৌঁছাতেন প্রতিবেশী এক গ্রামে তাঁর স্কুলে। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যেত, কিন্তু বাড়ির অন্যান্য অনেক কাজকর্ম করে অনেক রাত হয়ে যেত।

শীঘ্রই ভাস্করভাই একটি অতিরিক্ত আংশিক সময়ের কাজ পেলেন, সেটি হল সকালবেলায় ২ ঘণ্টা ধরে চিঠি বিলির কাজ। এই কাজের জন্য তিনি যে সাইকেলটি পেলেন তাতে তাঁর স্কুলে যাতায়াতে শ্রম ও সময়ের সাশ্রয় হল।

১৯৫১ সালে ভাস্করভাই মালতি বেনকে বিয়ে করলেন। দীর্ঘ ৫৮ বছর ধরে মালতি বেন ছিলেন ভাস্কর সাভের শ্রম ও সুখ–দুঃখের সাথি। (তিনি ২০০৯ সালে দেহত্যাগ করেন।) ১৯৫১ সালেই সাভে পরিবার সম্মিলিতভাবে তাদের কুয়ো খুঁড়তে শুরু করেন। ১৯৫২ সালের বর্ষার আগে কুয়ো খনন সম্পন্ন হয় এবং শীঘ্রই কুয়োটি মিষ্টি জলে ভরে ওঠে। ভাস্কর সাভের বাবা হীরাজি আহ্লাদিত হন। কয়েক মাস পরে তিনি শান্তিতে চোখ বোজেন।[৬]

রাসায়নিকের ব্যবহার শুরু ও ত্যাগ করা (১৯৫২—১৯৫৯)

১৯৫২ সালে সাভের পরিবার কুয়োতে একটি জলচাকা স্থাপন করেন। এটি চালাবার জন্য তাঁরা একটি মোষ কিনলেন। বর্ষার ধান কাটার পর তাঁরা সেচ দিয়ে শাক–সবজি চাষ করলেন এবং জীবনে প্রথমবার সবজির গাছগুলিতে গোবরসারের সাথে কিছুটা রাসায়নিক সারও ব্যবহার করলেন।[৭] তিনি ইতিমধ্যে চাষ বিষয়ে গুজরাতি বা মারাঠিতে যেসব লেখা পেতেন পড়তেন।

পরের বছর ভাস্কর সাভে বর্ষার ধান চাষেও রাসায়নিক প্রয়োগ করলেন। তিনি সাম্প্রতিককালে জাপান থেকে আনা একটি আধা–বামন প্রজাতির ধান রোপণ করলেন। (জাপানই হল প্রথম জাতি যারা ধানের খর্বকায় 'রাসায়নিক সার–সংবেদী' প্রজাতিগুলি থেকে এমন ধান নির্বাচন করেছিল যেগুলির ডগা দেশজ লম্বা প্রজাতির মতো রাসায়নিকের ব্যবহারে ঝুঁকে গিয়ে পড়ে যেত না।[৮])

সাভে যে ফসল পেলেন তা বিরাটভাবে নজর কাড়ল। গুজরাতে

ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের একজন ডিরেক্টর সাভের সাথে দেখা করে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন এবং রাসায়নিক সার বিক্রির জন্য তাঁকে এজেন্সি দিতে চাইলেন। সেক্ষেত্রে সার বিক্রির সাথে সাথে তাঁর কাজ হল সেই সারের ব্যবহারে চাষিদের পথ দেখানো। সারের প্রতি ব্যাগ বিক্রি পিছু তাঁকে আকর্ষণীয় কমিশন দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।[৯]

শীঘ্রই সাভে এই নতুন প্রযুক্তির এক আদর্শ চাষিতে পরিণত হলেন। পুণে ও অন্যান্য জায়গায় বহু কৃষিবিজ্ঞানী তাঁদের ক্ষেত্র-পরীক্ষাগুলির (field-trials) জন্য ভাস্কর সাভের অভিজ্ঞতাগুলি অনুসরণ করতেন। ১৯৫৪–৫৫ সালের মধ্যে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছিলেন যা দিয়ে তিনি ২.৫ একর ধানজমি কিনলেন। এই কেনা জমিতে শুরু হল তাঁর কল্পবৃক্ষ খামার।[১০]

যদিও ভাগ্যলক্ষ্মী সাভের ওপর প্রসন্ন ছিলেন, কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করলেন যে ইতিমধ্যে উৎপাদিত ফলনের পরিমাণ বজায় রাখতে তাঁকে আরও বেশি বেশি মাত্রায় রাসায়নিক ব্যবহার করতে হচ্ছে এবং অর্থ ব্যয়ও করতে হচ্ছে আরও বেশি। তিনি এটাও লক্ষ্য করলেন যে তাঁর মাটির জৈবজীবনও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রথম যৌবন থেকেই সাভে ছিলেন গান্ধীর "জ্ঞান গড়ে ওঠে শুধুমাত্র কাজের সাথে আন্তরিক সম্বন্ধ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর" — এই উক্তির দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। এগুলি ছাড়া কারও কাছে সবচেয়ে বেশি হলে যা থাকে তা হল 'অপরীক্ষিত তথ্য'। এই অন্তর্দৃষ্টি সাভেকে উদ্বুদ্ধ করেছে সমস্ত রকম পথে সত্যকে নিয়ে পরীক্ষা চালাতে। রাসায়নিক কৃষিকে অনুসরণ করে যখন মনে হচ্ছিল তিনি গান্ধীবাদী পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, তখনও তিনি গান্ধী ও বিনোভা ভাবের লেখাগুলি — বিশেষ করে কৃষি সংক্রান্ত লেখাগুলি উপভোগ করতেন। এই দুজন মানুষকে ভাস্কর সাভে শ্রদ্ধা করতেন তাঁদের ন্যায়পরায়ণতার জন্য।

সাভে বিনোভার একটি লেখা পড়েছিলেন, যেখানে বলা হয়েছিল যে যখন কোনো ধানজমিতে জল জমে থাকে তখন কিছুকালের জন্য নতুন বর্ষণের অভাবে সাদা ফিল্মের মতো একটি স্তর ভূতলের ওপরে জমা হয়। এটা থেকে বোঝা যায় যে ধানগাছের দ্বারা শোষিত হয়ে এই জলে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেছে। বিনোবা আরও লিখেছিলেন যে অনেক আদিবাসী সমাজ জানে যে যখন প্লাবিত ধানখেতে এরকম ঘটে তখন মাছেরা ছটফট করে এবং সেই খেত থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এই সময়টাই আদিবাসীরা মাছ ধরার জন্য ফাঁদ পাতে। ভাঁটি বাঁধে (downstream bund) ছোটো একটা গর্ত কেটে ঠিক তার নিচে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি এক ছাকনি

ঝুড়ি বসিয়ে জলের সাথে চুনো মাছগুলি এড়িয়ে যাবার পথ রেখে বড়ো মাছগুলিকে ধরে।

অণুসিদ্ধান্ত হিসাবে সাভে যুক্তি সাজালেন ধান গাছেরাও তো জল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। যখন মাঠে জমে থাকা পুরোনো জলকে (যাতে অক্সিজেন থাকে কম) বর্ষার নতুন জল (অক্সিজেন সম্পৃক্ত) পূরণ করতে না পারে, তখন ধান গাছেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাভে লেখাটি বারবার পড়লেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাঁর কোনো একটা জমিতে তিনি এ নিয়ে পরীক্ষা চালাবেন।

যখন বর্ষণের এক দীর্ঘ বিরতি পাওয়া গেল, তিনি এক টুকরো ধানজমিতে বাঁধ কেটে জমে থাকা পুরোনো জল বের করে দিলেন। তারপর তিনি কাটা বাঁধটি মেরামত করলেন এবং বর্ষায় জমা জল ভরতি কুয়ো থেকে জল চাকা ব্যবহার করে জল দিয়ে আবার জমিটিকে প্লাবিত করলেন।

পরদিন খুব সকালে সাভে ছুটে গেলেন ধানগাছগুলি দেখবার জন্য। মনে হল ধানগাছগুলি সজীব হবার বদলে বরং ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছে। তিনি হতাশ হলেন। অবশ্য ২–৩ দিনের মধ্যেই ধানগাছগুলি পুরোনো জল জমে থাকা অবস্থায় গাছগুলির থেকে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর দেখাল। এক সপ্তাহ পরে তিনি তাঁর এক প্রতিবেশীকে এই ফারাকটা দেখালেন। তিনি ভাবলেন সাভে তাঁর পরীক্ষাটি নিয়ে নিজের গুণকীর্তন করছেন। প্রতিবাদে সাভে বললেন, "আমাকে বোলো না যে তোমার কুয়োর জলে রাসায়নিক সার আছে"।

পরের বছর ভাস্কের সাভে ঠিক করলেন যে জৈব ধান নিয়ে পরীক্ষা চালাবেন, জমিতে জমে থাকা জলকে দুবার বদল করলেন। যেহেতু সেই বছর তিনি দেশজ লম্বা প্রজাতির ধান রোপণ করেছিলেন, চারাগুলি অন্যান্য গাছপালার বুনো প্রজাতিদের চেয়ে অনেক বেশি বৃদ্ধি পেল, ফলে আগাছা নির্মূল করার কোনো দরকার হল না। জাপানি বামন প্রজাতির ধানের আন্ত–কর্ষণ (inter-cultivation) বা আগাছা বৃদ্ধি আটকাতে কাস্তে দিয়ে উপড়াতে অনেক শ্রম বা লোকের প্রয়োজন। এটা একটা অবাঞ্ছিত ঝামেলা বলে মনে হল। পাশাপাশি এটা ব্যয়বহুলও বটে।

সাভে সংকল্প করেছিলেন যে তিনি ধীরে ধীরে জৈব চাষে ফিরে যাবেন — অন্তত ধান চাষের ক্ষেত্রে। কারণ যে শাক–সবজি তিনি বাজারে বিক্রি করতেন, তাতে তিনি রাসায়নিক ব্যবহার করতেন। কিন্তু গুজরাত ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন রাসায়নিক ব্যবহার কমিয়ে দেওয়াতে খুশি হল না। চাল হল অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাষ আর কোম্পানি তাদের রাসায়নিক সারের প্রসার বাড়ানোর একজন আকর্ষণীয় তারকাকে হারাচ্ছে

বলে ভয় পেল।

এরপর থেকে ভাস্কর সাভে আধ একর জমি সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত রাখলেন জৈব চাষের পরীক্ষার জন্য। এখানে তিনি অনুসরণ করলেন ফসলের আবর্তন (crop rotation)। জৈব ধান তোলার পর তিনি লাগাতেন শুঁটি (leguminous) ডাল (যেমন লাবলাব বীন) অথবা ছোলা। সাম্প্রতিক বর্ষার সময়ের বৃষ্টি থেকে মাটিতে যে আর্দ্রতা রয়ে যেত তা থেকেই এই গাছের বৃদ্ধি হত এবং অন্য কোনো ভাবে সেচের প্রয়োজন হত না। এরা বাতাস থেকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে মাটিতে চালান দিত যা থেকে পরবর্তী দানাশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হত। ডাল ফসল তোলার পর তার ন্যাড়ার (ফসল কাটার পর মাটিতে থেকে যাওয়া খড়ের অবশিষ্ট অংশ) ওপর গবাদি পশু দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে মাটিতে কিছুটা গোবর মিশিয়ে দেওয়া হত যা থেকে যথেষ্ট (গোবর) সার পাওয়া যেত।

ফসল আবর্তনের মাধ্যমে পাওয়া ঐতিহ্যগত জৈব চাষের ফলন মোটেই কম হয় না। সাভে স্মরণ করলেন যে তিনি এক আদিবাসী অঞ্চলে দেখেছিলেন প্রায় দু-মাইল লম্বা এক গরুর গাড়ির লাইন। গাড়িগুলিতে ছিল অঞ্চলের উদ্বৃত্ত (surplus) ফসল। আর গাড়িগুলি ছিল পাইকারি ব্যবসায়ী ও তাদের মধ্যসত্ত্বভোগী দালালদের।[১১]

১৯৫০ সালে সাভেকে তাঁর বাড়ির কাছে একটি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ দেওয়া হয়েছিল। এটি তাকে কৃষিকাজে আরও বেশি সময় দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে সরকারের নতুন জেলা শিক্ষা অধিকর্তা ওই একই স্কুলে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য তার কাছে ঘুষ দাবি করেন। নীতিগত ভাবেই তা দিতে সাভে অস্বীকার করেন। শীঘ্রই তিনি দূরবর্তী একটি স্কুলে স্থানান্তরিত হওয়ার নির্দেশ পেলেন। এটির অর্থ হল তাঁকে যাতায়াতের জন্য অন্তত দু-ঘন্টা ব্যয় করতে হবে। প্রতিবাদে সাভে পদত্যাগ করলেন।

সাভে শিক্ষকতা ছাড়লেও তাঁর রাসায়নিকের এজেন্সিটি ছিল। কৃষিকাজে যে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি আগ্রহী ছিলেন, এখন সেগুলি চালাবার জন্য প্রচুর সময় পেলেন। সেই বছর তিনি তাঁর মাঠে গোবর সারের সাথে গ্রামের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা আবর্জনাও ব্যবহার করলেন। এ জন্য তাঁকে আবর্জনা সংগ্রহ ও গাড়িভাড়ার খরচ দিতে হত। সেই সময় আবর্জনায় কোনো প্লাস্টিক থাকত না, বিক্রি করার জন্য যে শাক-সবজি তিনি ফলাতেন তাতে তিনি রাসায়নিকের ব্যবহার অব্যহত রাখলেন।

ঐতিহ্যগত টেঁকসই বা সুস্থায়ী কৃষির সম্পদ

ভারতীয় কৃষি হল ১০০০০ বছরের পুরোনো।[১২] এতগুলি সহস্রাব্দ জুড়ে ঐতিহ্যশালী জৈব চাষের সমৃদ্ধ জ্ঞান ভারতীয় উপমহাদেশের বিপুল জনসংখ্যার মুখে খাবার জুগিয়ে এসেছে। এই জ্ঞানই বৃহৎ এই প্রাচীন সভ্যতার সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতিকে বিকশিত করেছে এবং তা সারা পৃথিবীর পর্যটকদের মুগ্ধ করেছে। তখন তো কোনো কৃষি রসায়ন ছিল না। অবশ্য তখন জমি ছিল — এখনও আছে — সারা বছর ধরে প্রচুর সূর্যালোকের আশীর্বাদ পুষ্ট, প্রচুর বৃষ্টিপাত, উর্বর মাটি এবং অসংখ্য বৈচিত্র্যময় ও উপ–বৈচিত্র্যময় প্রজাতির ফসল সহ জৈব বৈচিত্র্যের অপার সম্পদ।

উইনিন পেরেরা তাঁর 'মাটির লালনকর্ম' (১৯৯৩) (Tending the earth) নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছেন, ভারতের ঐতিহ্যশালী কৃষি কীভাবে "সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা, স্থায়িত্ব, আত্মনির্ভরশীলতা, বৈচিত্র্য ও দেশজ জ্ঞানের গভীরতায় সব দিক দিয়েই উচ্চস্থানাধিকারী।"[১৩]

ঠিক একশো বছর আগে জে এ ভোয়েলকার — তাঁর সময়ের একজন প্রখ্যাত ইউরোপীয় কৃষিবিশেষজ্ঞ — ১৮৯৩ সালে তাঁর "ভারতীয় কৃষি প্রসঙ্গে রিপোর্ট'–এ লিখেছিলেন, 'এটা নিশ্চিত যে সযত্নে লালন করা কৃষির এর চেয়ে বেশি চমৎকার ছবি আমি অন্তত দেখিনি"। ... জল উত্তোলন কৌশলের এমন বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ, বিভিন্ন ধরনের মাটি ও তাদের সক্ষমতা এবং বীজ বপনের ও ফসল তোলার নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান — এগুলি ভারতীয় কৃষিতে যেভাবে পাওয়া যায় তা কেউ অন্য কোথাও দেখতে পাবে না। আর এরকম জ্ঞান শুধু সর্বোৎকৃষ্ট স্তরেই নয় — বরং সাধারণ স্তরে — চাষিরাই এই সব জ্ঞান ও কৃৎকৌশলের অধিকারী। ফসল আবর্তন, মিশ্রচাষ ব্যবস্থা, জমির উর্বরতা পুনরুদ্ধারে চাষ না করে ফেলে রাখা (fallowing) ইত্যাদি বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিস্ময়কর।"[১৪]

ভারতের উপনিবেশিক সরকারের সাম্রাজ্য সংক্রান্ত অর্থনৈতিক উদ্ভিদবিদ (The Imperial Economic Botanist) স্যার অ্যালবার্ট হাওয়ার্ড, যিনি এদেশে বহুদিন কাজ করেছেন, তিনি অনুরূপ স্বীকারোক্তি করেছেন, "আমি এই কৃষকদের আমার অধ্যাপক বলে সম্মান করতাম। কৃত্রিম সার ও কীটনাশকের বিন্দুমাত্র সাহায্য ছাড়া কীভাবে কার্যত রোগহীন সুস্থ ফসল ফলাতে হয় তা আমি এদের কাছে শিখেছিলাম।"

হাওয়ার্ড আরও বলেন, "প্রাচ্যে কৃষির অনুশীলন চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তা প্রায় প্রাচীন অরণ্য বা সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্রের মতো স্থায়ী।"[১৫]

বাজারে বিভিন্ন শাক-সবজির কীরকম চাহিদা ও দাম এগুলি সাভে লক্ষ্য করতেন। তিনি দেখলেন বাজারে ছোটো লাউয়ের খুব চাহিদা। বিশেষত বিয়ের মরশুমে এই সবজি থেকে ভালো দাম পাওয়া যেত। তিনি ঠিক করলেন প্রধানত এগুলিরই চাষ করবেন। সেই বছর দক্ষিণ গুজরাতে বহু চাষি এরকমই ভেবেছিল এবং ওই একই চাষ করেছিল, ফলে বাজারে চাহিদার থেকে জোগান হল বেশি।

সে বছর ডিসেম্বরে দাম ভীষণ ভাবে পড়ে গেল। সাভের পাইকারি ক্রেতা তাঁকে টেলিগ্রাম করে মাল পাঠাতে নিষেধ করলেন। কিন্তু সাভে ইতিমধ্যেই ২৭ বস্তা মাল ট্রেনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাতে প্যাকিং ও যান খরচ ধরে তাঁর খরচ হয়ে গেছে ২০০ টাকা। জানুয়ারিতে সাভে তার 'বিক্রির স্লিপ' পেলেন। তা থেকে দেখা গেল, ২৭ বস্তা সবজি পাঠিয়ে তাঁর লাভ হয়েছে ২৬ টাকা।

এই তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভাস্কর সাভে এমন বিরক্ত হলেন যে তাঁর মনে হল, আর দেরি নয়, তিনি অর্থকরী ফসলের অজৈব চাষ, শীঘ্রই বন্ধ করে দেবেন। এই ধরনের চাষ দিনে দিনে বেশি ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছিল, কারণ বছরে বছরে বেশি বেশি রাসায়নিকের দরকার পড়ছিল আর দামও বাড়ছিল হু হু করে।



সেরাটা কি শেষের জন্য তুলে রাখব?

যখন সাভে পদত্যাগপত্র জমা দিলেন, তাঁর বন্ধু ও অগ্রজরা সাভেকে ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা করতে বললেন। তাঁরা ভাবলেন যে সামাজিক সম্মান-জনক নির্ভরযোগ্য উপার্জনের এমন একটা সরকারি চাকরি ছেড়ে দেওয়া হল বোকামির কাজ। তাঁরা পরামর্শ দিলেন, যতক্ষণ না তুমি আর্থিকভাবে সুরক্ষিত হচ্ছ, ততক্ষণ কাজটা চালিয়ে যাও।

ভাস্কর সাভে বিষয়টা নিয়ে বেশ কিছুদিন ভাবলেন। তিনি তার পরামর্শ-দাতাদের সেই প্রশ্নগুলিই করলেন, যেগুলি তাঁকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে। কিন্তু প্রশ্নগুলির কোনো সদুত্তর তাঁদের কাছে ছিল না।

যতক্ষণ না আমরা সুরক্ষিত হব, ততক্ষণ কি আমরা আত্মমর্যাদা গিলে ফেলব? আমরা যদি অন্যায়ের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ না করি, আমরা কি আরও বেশি অন্যায়কে আমন্ত্রণ জানাই না? তাহলে কি আমরা এই (অন্যায়) ব্যবস্থাটাকে চলতে দেওয়ার অপরাধে অপরাধী নই?[১৬]

যদি পরিস্কার ভাবে বোঝা যায় যে ব্যবস্থাটাকে বদলে ফেলা দরকার, তাহলে সেই কাজটা পরে করব বলে ফেলে রাখার কী মানে? আমাদের যৌবনের প্রত্যয় ও আকাঙ্ক্ষাগুলিকে দাবিয়ে রেখে আমাদের সেরাটা কি শেষের জন্য তুলে রাখতে আমরা বাধ্য থাকব? আমাদের স্বপ্নগুলো পরে পূরণ করার কল্পনা কি এক ভ্রম নয়? তখন আমাদের উদ্দীপনা ও শক্তি শেষ হয়ে যাবে না? আর আমরা কতদিন বাঁচব সেটাই বা কে জানে!



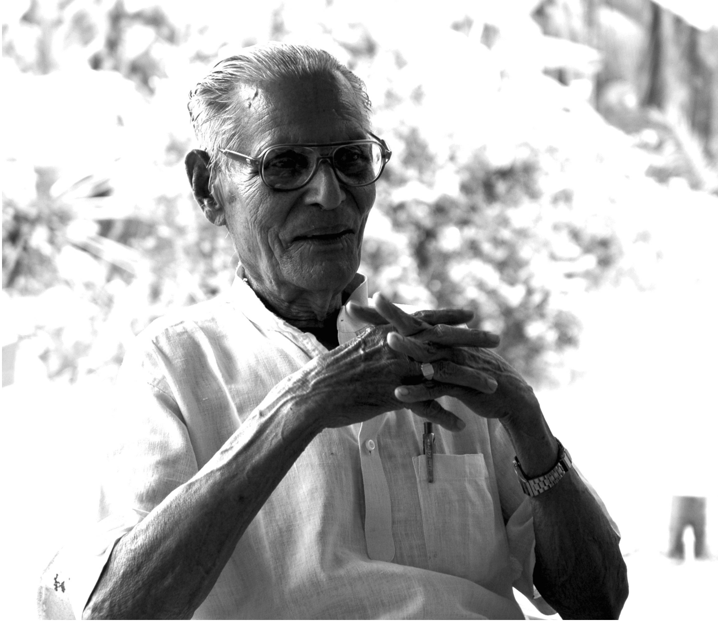
কার্যকর একটা বিকল্প ফসলের কথা ভাবতে গিয়ে সাভের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল অঞ্চলের ইরানি ও পার্সি বাগিচাগুলির দিকে। তিনি ভাবতে লাগলেন যে তিনিও ফল/বাদাম গাছগুলির চাষে নামবেন কিনা? প্রবৃত্তিগতভাবে তিনি এদিকে আকৃষ্ট হলেও এক্ষেত্রে অর্থ ফেরত পাবার দীর্ঘ মেয়াদের কথা ভেবে তিনি দমে গেলেন। সাভে ঠিক করলেন যে এপথে তিনি এগোবেন ধাপে ধাপে। তার পরীক্ষা–নিরীক্ষা শুরু হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।[১৮]

১৯৫৪ সালে ভাস্কর সাভে তাঁর খামারের জমিটি কিনেছিলেন। সেটা ইতিমধ্যেই বেড়ে হয়েছে ৪.৫ একর। ১৯৫৭–৫৮ সালে তিনি সেখানে একটা ছোটো বাড়ি করলেন। এরপর এক কিমি কম দূরত্বে, দেহরি গ্রামে তাঁর পুরোনো আবাসস্থল ছেড়ে সেখানে তিনি সপরিবারে উঠে গেলেন। জৈব শাক–সবজির মাঝে ফলের গাছের চাষ হয়ে উঠল তাঁর নতুন আকর্ষণ। আর তিনি চাইলেন যাতে এই কাজে তিনি আরও বেশি শ্রম ও ধ্যান দিতে পারেন। জৈব পথের ওপর তাঁর প্রত্যয় দৃঢ়ভাবে বাড়তে লাগল। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র খরচই কমল না, দেখা গেল মাটি ও গাছপালা হয়ে উঠেছে আরও বেশি স্বাস্থ্যজ্জ্বল। ১৯৬০ সালের মধ্যে, বেশিরভাগ ভারতীয় চাষিরা তাঁদের জমিতে রাসায়নিক ব্যবহার শুরু করার আগেই, তিনি তাঁর জমিতে রাসায়নিক ব্যবহার বন্ধ করে দিলেন।

রাসায়নিকের মাত্রা কমানো ভালো পরিচালন কৌশল নয়

দু–দশক আগে গুজরাতের এক সর্বোদয় (গান্ধীবাদী) নেতা ভাস্করভাইকে বলেছিলেন, তিনি চাষিদের পরামর্শ দিন যাতে তারা রাসায়নিকের ব্যবহার হঠাৎ করে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে না দেয়, বরং তা খেপে খেপে কমিয়ে সম্পূর্ণ বন্ধ করে। কিন্তু ভাস্করভাইয়ের যুক্তি হল, "যখন রাসায়নিকের ব্যবহার কমানো হয় তখন মাটির ক্ষতি কমে আসে। কিন্তু তবুও তা

ক্ষতিকর। তাতে মাটির ক্ষতি হতেই থাকে, যদিও কম দ্রুততার সাথে।’’



ঘুরে দাঁড়ানোর বিন্দুতে (the turning point) — যেখানে ক্ষতি হওয়া বন্ধ হয়ে মাটির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার শুরু হয় — তখনই পৌঁছানো যায়, যখন মাটির জৈব জীবনের ওপর যাদের বিষাক্ত প্রভাব আছে তাদের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়। বৃষ্টি যখন পুরোনো বিষ ধুয়ে দেয়, তখন মাটির অসংখ্য অণুজীব ও কেঁচোরা ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে এবং মাটিতে হিউমাস (বা পাতাপচা সার) তৈরি হয়। এটাই হল মাটির স্বাস্থ্যের মূল ভিত্তি — যার অভাবে সুস্থ গাছপালার বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি হয় না।

মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলি ধ্বংস করে কৃষি–রাসায়নিকগুলির অব্যাহত ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীলতা তৈরি করা হয়। ফলে রাসায়নিকের ব্যবহার কমলেই ফলন কমে যায়। তখন চাষি উদ্বিগ্ন হয় এই ভেবে যে সে সার দিয়েছে কম, ফলে ফলন কমেছে। তখন সারের ব্যবহার বন্ধ করবে কি, বরং তখন সে আরও বেশি বেশি সার দিতে থাকে।

‘‘রাসায়নিক ব্যবহারকারী চাষিদের মধ্যে যাদের সাথে আমি কথা বলেছি তাদের বেশিরভাগই পরিষ্কার বুঝতে পারে এবং প্রায়শই স্বীকার করে যে

তারা (খাদের দিকে) গড়িয়ে নামছে। তারা বোঝে যে এপথ দিয়ে এগোনো সম্ভব নয়। কিন্তু কৃষির পথ পরিবর্তনে তাদের প্রত্যয়ের অভাব রয়েছে। তাদের প্রতি আমার পরামর্শ হল যে তাদের অন্তত শুরু করা উচিত —— তাদের জমির একটা অংশে রাসায়নিক সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এবং তার বদলে যেখানে যতটুকু জৈব সার পাওয়া যায় তা তাদের ব্যবহার করা উচিত।''

সাভে বলেন, এরকম করলে প্রথম বছরে যদি ফলন বিশেষভাবে কমে যায়, এই পদ্ধতিতে খরচের সাশ্রয় হওয়ায় ক্ষতিটা অনেকাংশে কম হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের শেষে অবস্থার উন্নতি হয়ে পরিষ্কার লাভ পাওয়া যাবে। আর যদি এই জৈবসারে তৈরি খাবার কৃষকের নিজের পরিবার খায়, তাহলে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। চাষির অভিজ্ঞতা ও প্রত্যয় যত বাড়তে থাকবে ততই ধাপে ধাপে বেশি পরিমাণ জমি পুনরুদ্ধার করে জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা যাবে। এই নতুন জমিতে প্রতি বছর যে জৈব সার ব্যবহৃত হয় তা ঘনীভূত হয়ে মাটির স্বাস্থ্যের পুনরুজ্জীবনকে দ্রুততর এবং মাটির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। তাই জমি পুনরুদ্ধারে প্রাথমিক ফলাফল ভালো না হলে নিরুৎসাহ হবার কোনো কারণ নেই।

কৃষি–রাসায়নিকের পথ কেন আত্মহত্যার শামিল

গত পরিচ্ছদে যেমন বলা হয়েছে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জমির (temperate land) সঙ্গে তুলনায় গ্রীষ্মমণ্ডলের মতো আবহাওয়ার জমিতে/মাটিতে (tropical condition) জৈব বস্তু বেশি দ্রুত অজৈব বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। তাই মাটিতে কৃত্রিমভাবে রাসায়নিক পুষ্টির জোগান দেওয়া শুধুমাত্র অপ্রয়োজনীয় নয় বরং বিশেষভাবে ক্ষতিকারকও বটে। ইউরিয়ার মতো নাইট্রোজেন–জাত সার মাটির ওপর জৈবতন্তু দ্বারা সৃষ্ট আসনের মতো স্তরটি ক্ষইয়ে দিয়ে রূপান্তর বা পচনের কাজটি ত্বরান্বিত করে। এই আসনের মতো স্তরটি মাটির সুরক্ষা কবচের মতো কাজ করে। ফলে এর ক্ষয়ে ভূমিক্ষয়ের প্রবণতা ও মাটির পুষ্টি দ্রব্যগুলির ক্ষয়ও বৃদ্ধি পায় যা গ্রীষ্মমণ্ডলীর বিপুল বর্ষণে মারাত্মক আকার ধারণ করে।

তা সে যাই হোক, সংশ্লেষিত সারের অজৈব যৌগগুলিতে গাছের প্রয়োজনীয় মৌল থাকে মাত্র কয়েকটি। এই কয়েকটি মৌলও আবার জোগান দেওয়া হয় ঘনীভূত রূপে। যেহেতু গাছপালা ঘনীভূত মৌলগুলিকে তৎক্ষণাৎ শোষণ করতে পারে না, পুষ্টিগুলি (nutrients) বহুলাংশে নষ্ট হয়। কিন্তু আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে বিষাক্ত রাসায়নিকগুলি মাটির জৈব

জীবনের ভীষণ ক্ষতি করে। বিশেষ করে মারাত্বক হল মাটির অণুজীব, কেঁচো ইত্যাদির ওপর কীটনাশকগুলির হত্যালীলা। এর অবশম্ভাবী ফল এই জীবগুলি মাটির তৈরি করার (কর্ষণের) যে কাজ করে থাকে তা নষ্ট হয়ে যায়, মাটির দানাগুলির ভেদ্য (porous) গঠন ভেঙে যায়, মাটি থেকে বাতাস বের হয়ে যায়, ফলে মাটি জলধারণ ও বায়ুধারণ — এই উভয় ক্ষমতাই হারায়।

এরপর আসে আরও অসংখ্য সমস্যা। কৃত্রিম কর্ষণ ও সেচের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। মারীপোকার সংখ্যা বাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে। তাদের ওপর কীটনাশক ছেটানো হলে তারা দ্রুত কীটনাশক-প্রতিরোধী হয়ে যায়। ফলে আরও শক্তিশালী, আরও বেশি মাত্রায় বিষ প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু এই মারীপোকাগুলির প্রাকৃতিক শিকারীগুলিও (natural predators) মাটি থেকে শেষ হয়ে যায়। মৌমাছি সহ পরাগমিলনে সাহায্যকারী অন্যান্য পতঙ্গরাও বিলুপ্ত হয় আর খাদ্যে বিষাক্ত অবশেষের মাত্রা মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। যেখানে আগে প্রকৃতিতে এসবই চলত সহজ স্বাভাবিকভাবে, সেখানে মানুষের চাতুর্যে কৃষকের ওপর কাজের বোঝা ও উদ্বেগ বেড়ে গেছে বহু গুণ।

ভারতে চাষিরা রাসায়নিক ব্যবহার শুরু করেছিল এই কারণে নয় যে তাদের ঐতিহ্যগত পদ্ধতিগুলি কার্যকর নয়, বরং এই কারণগুলির জন্য যে রাসায়নিকগুলির ওপর বিপুল ভরতুকি দেওয়া হত এবং সেগুলির ব্যবহারের দীর্ঘমেয়াদী কুপ্রভাবগুলি না জানিয়ে তাদের ব্যবহারে উৎসাহিত করা হোত। কৃষিতে ব্যবহার করার জন্য দেয় (inputs) জিনিসগুলি ক্রয় করার জন্য সহজলভ্য ব্যাঙ্ক ঋণ; দানাশস্য বাজারে বিক্রয়ে উৎসাহিত করার জন্য সহায়ক মূল্যে (support price) কিনে নেবার ব্যবস্থা — এগুলিও কৃষকদের কাছে গাজরের টোপ হিসাবে রাখা হত।

আয়তনে ও ওজনে নিরেট (compact) হওয়ায় রাসায়নিকগুলির ব্যবহার ছিল সুবিধাজনক। কিন্তু যেহেতু এই প্রযুক্তি ঐতিহ্যগত কৃষিকাজ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বা অচেনা, কখন কতটা রাসায়নিক ব্যবহার করতে হবে এ প্রশ্নে কোনোরকম সতর্কতা নেওয়া হত না। রাসায়নিকের প্যাকেটের গায়ে ক্ষুদ্র অক্ষরে যদি কিছু সতর্কতা বা হুঁশিয়ারির কথা লেখা থাকত, তা কেউ পড়ত না বা অগ্রাহ্য করত।

(এসবের ফলে) ক্ষুদ্রমেয়াদী আর্থিক বিবেচনা প্রাধান্য পেল, আর স্বাস্থ্যের ওপর এবং জীবনের সহায়তাকারী বুনিয়াদি ব্যবস্থাগুলি অবহেলিত হল।

অণু–পুষ্টিগুলির নির্গমন (micro-nutrient Drain)

দীর্ঘদিন হল এটা জানা গেছে যে রাসায়নিকের সাহায্যে নিবিড় চাষের ফলে মাটিতে অণু–পুষ্টিগুলির অভাব দেখা যাচ্ছে। এই অণু–পুষ্টিগুলি হল জিংক, লোহা, তামা, ম্যাংগানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, মলিবডেনাম এবং বোরন — এগুলি উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদাহরণ স্বরূপ পাঞ্জাবে ৪৭০৬টি সংগৃহীত মাটির নমুনা বিশ্লেষণ করে অর্ধেকের বেশি নমুনায় জিংক বা দস্তার অভাব লক্ষ্য করা গেছে।[১৯] এর ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে ফলন কমে যায়। কারণ জিংক উদ্ভিদের নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ব্যবহার করার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। আরও ক্ষতিকারক দিকটি হল (যা খালি চোখে দেখা যায় না) খাদ্যগুণের হ্রাস। ফলে মানুষের স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে পড়ছে। চণ্ডীগড়ের পোস্টগ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স–এর এক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে জিংকের অভাব আছে এমন দানাশস্য খেলে শরীরের বৃদ্ধি ও যৌনতা বৃদ্ধিতে ক্ষতি হতে পারে; অভাব ঘটতে পারে কার্বোহাইড্রেট সহনশীলতায় এবং আঘাত সেরে ওঠার ক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি হতে পারে।

আধুনিক ভূ–প্রযুক্তিবিদরা মাটির এইসব পুষ্টির অভাব পূরণ করতে পুষ্টিগুলিকে রাসায়নিক রূপে মাটিতে প্রয়োগ করার পরামর্শ দেয়। তবে তারা এটাও স্বীকার করে যে এইরূপ প্রয়োগের ফলে মাটিতে ও খাবারে বিষ জমতে পারে। এছাড়া কোনো অণু–পুষ্টির অভাব যদি রাসায়নিক রূপে প্রয়োগ করে পূরণ করার চেষ্টা করা হয় তাতে অন্য অণু–পুষ্টির অভাব ঘটতে পারে। কোনো কোনো স্থানে জিংকের প্রয়োগে লোহা ও ম্যাংগানিজের ঘাটতি দেখা গেছে। আবার অন্য কয়েকটি জায়গায় জিংকের অভাব পূরণ করতে গিয়ে তামা বা কপারের অভাব দেখা গেছে।

Only from healthy soil
will healthy plants grow

শুধুমাত্র সুস্থ মাটি থেকেই
বেড়ে উঠতে পারে সুস্থ গাছগাছালি

টাকা অর্থনীতির সাথে কৃষকরা বাঁধা পড়ে গেল। এমনকী তাদের জমি কৃষি রাসায়নিকে নেশাসক্ত হয়ে পড়ল। কৃষি হয়ে উঠল এক ঝঞ্ঝাটপূর্ণ, ক্লান্তিকর ব্যাপার।

ভারতের কৃষি–খামারের অবনমনের (degradation) এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এদেশে যুদ্ধের গর্ভজাত আধুনিক রাসায়নিক নিবিড় কৃষির (chemical intensive agriculture) ঐতিহাসিক আগ্রাসনের বয়স পাঁচ দশকের কম। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তা ভয়ংকর ধ্বংসলীলা চালিয়েছে।

এটা অনেকদিন ধরেই জানা ছিল যে মাটিতে কৃত্রিমভাবে নাইট্রোজেন জোগান দিতে অ্যামোনিয়া থেকে ইউরিয়া উৎপাদন করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, আমেরিকায় আঠারোটি নতুন অ্যামোনিয়া কারখানা —– যেগুলি আদিতে বিস্ফোরক উৎপাদনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল —– সেগুলির অতিরিক্ত উৎপাদনসামগ্রী বিক্রির জন্য বেপরোয়াভাবে বিশ্ববাজারের প্রয়োজন পড়ল। পরবর্তীকালে বিশ্বজোড়া কৃষিযোগ্য মাটির ধ্বংসলীলা বিপুলভাবে বাড়ল।

এ ব্যাপারে কী ঘটতে চলেছে তার হুঁশিয়ারি অনেক আগেই ১৯৩০ দশকে আমেরিকার বৃহৎ মন্দার সময়কালেই পাওয়া গিয়েছিল। এই সময়কার ভয়ংকর ধুলো–বাটিগুলি (Dust Bowels) হল অনেকাংশে মাটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফল। প্রায়শই এগুলি হয়েছিল বনভূমি উচ্ছেদ করে নিবিড় কৃষিকাজে বৃহৎ বাণিজ্যিকভাবে যথেচ্ছ রাসায়নিক প্রয়োগের প্রথম দশকে।

ভারতে আমাদের খামারগুলি ও কৃষক সম্প্রদায়ের শোষণ শুরু হয়েছিল অনেক আগে ঔপনিবেশিক শাসনের যুগে, কৃষি–রাসায়নিকের আবির্ভাবের আগে থেকেই। বহু কৃষককে তাদের ঐতিহ্যগত মিশ্র চাষ ও ফসল আবর্তনের ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাদের সবচেয়ে উর্বর কৃষিজমিগুলিকে রপ্তানিযোগ্য বাণিজ্যিক ফসল, যেমন আফিম, তামাক, তুলো, নীল, চা, কফি উৎপাদনের জমিতে পরিণত করা হয়েছিল। এই জমিগুলিকে বিশ্রাম না দিয়ে তাদের অবিরাম বছরের পর বছর ব্যবহার করা হত বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন করতে।

জমিদারি ব্যবস্থা এবং তা থেকে ইংরেজ শাসকরা যে উচ্চহারে রাজস্ব আদায় করত, তার ফলে কৃষকদের জীবন দুঃখে ভরে গিয়েছিল। পুকুর, দীঘি —– জলসম্পদের এইসব সামুদায়িক বা সামাজিক উৎসগুলি অবহেলিত হল। সেচ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। কাঠের গুঁড়ির (timber) জন্য বিপুল সব

বনভূমিকে নিশ্চিহ্ন করা হল অথবা স্থানীয় অধিবাসীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য 'সংরক্ষিত' হিসাবের ঘোষণা করা হল। এর ফলে আশপাশের বিস্তৃত অঞ্চলের মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে জঙ্গল থেকে যা কিছু দেওয়া হত তা কমে গেল।

ব্রিটিশরা ভারত ছাড়ার পর এবং দেশ ভাগের যন্ত্রণা যখন কিছুটা প্রশমিত হয়েছে, তখন ভারতীয় কৃষি আক্রমণের হাত থেকে ছাড় পেয়েছিল প্রায় বছর পনেরো। ভারতের প্রথম কৃষিমন্ত্রী কে এম মুন্সি গান্ধীর গ্রাম স্বরাজ বা গ্রামীণ স্ব-শাসন ও আত্মনির্ভরশীলতার দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতি গ্রাম ও জীব-অঞ্চলে (bio-region) পুষ্টি-চক্র (nutrients cycle) ও জল চক্রকে (Hydrological cycle) পুনরুদ্ধার করার অসামান্য গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন।[২০] সেটা ছিল ১৯৫১ সাল। ইতিমধ্যে জে সি কুমারাপ্পা — গান্ধীর দ্বারা প্রভাবিত আর এক সুদূরপ্রসারী চিন্তক — ১৯৪৫ সালে 'সুস্থায়ী অর্থনীতি' (The Economy of Permanance) নামে একটি বই লিখে প্রকাশ করেছিলেন।

পরবর্তী দশ বছরে (১৯৫১-৬১) ভারতের কৃষি উৎপাদন স্থিরভাবে (steadily) বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই উৎপাদনের বেশিরভাগটাই ভুক্ত হত গ্রামাঞ্চলে — সেখানকার মানুষ বিদেশি শাসনের দারিদ্র ও অভাব থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছিল। তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় (perishable) এমন অসংখ্য খাদ্যের কিছু উদ্বৃত্ত খামার থেকে বাজারে আসত। কিন্তু সেগুলি সংগ্রহ করে দূরবর্তী শহরের বাজারে পৌঁছানো ছিল প্রশাসনিক দিক দিয়ে অসুবিধাজনক। এটা যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে বোঝা গিয়েছিল যে গৃহিত সরকারি নীতি দ্বারা কৃষি রাসায়নিক ও শস্যের বামন প্রজাতির বিস্তৃত প্রসারের ঠিক আগের দশকে — ১৯৫০ দশক জুড়ে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা (প্রতি একর জমিতে ফলনের মাত্রা) — এই দুইই ছিল বেশি।

প্রথম যোজনাকালে (১৯৫১-৫৬) সমস্ত শস্যের মোট উৎপাদন চক্রবৃদ্ধি হারে গড়ে বেড়েছিল বছরে ৪.৯%, যেখানে চক্রবৃদ্ধি হারে মোট উৎপাদন-শীলতার গড় বৃদ্ধি ছিল বছরে ১.৪%। দ্বিতীয় যোজনাকালে (১৯৫৬-৬১) অনুরূপ কৃষি উৎপাদনের গড় বৃদ্ধি ছিল বছরে ৩.১%। যেখানে উৎপাদনশীলতা বেড়েছিল বছরে ১.৮% হারে। তৃতীয় ও চতুর্থ যোজনাকালে (১৯৬১-১৯৭১) মিলিতভাবে মোট কৃষি উৎপাদনের তুলনীয় বৃদ্ধি ছিল বছরে ২% হারে, যেখানে উৎপাদনশীলতার বাৎসরিক বৃদ্ধির হার পড়ে গিয়ে হয়েছিল ১.৩%।[২১]

১৯৫০ দশকে ভারতীয় কৃষির প্রশংসনীয় পুনরুদ্ধার হলেও, জহরলাল নেহরুর শহর–শিল্পের (Urban-industrial) উন্নয়নের ধারাকে অনুসরণ করা সম্ভব ছিল, শুধুমাত্র যদি কৃষিজ উদ্বৃত্ত বিশেষ করে সহজে নষ্ট হয়ে যায় এমন সব প্রধান খাদ্যদ্রব্যগুলি শহরে আসত। সেই কারণে যোজনা কমিশনের কিছু সদস্য প্রস্তাব দিলেন যে কৃষি–খামারগুলিকে যদি রাসায়নিক ব্যবহারে আকৃষ্ট করা যায়, তাহলে তারা পরে এইগুলি কিনবার পয়সার জোগান পেতে বাজারে বিক্রি করা যায় এমন সব ফসল উৎপাদন করতে বাধ্য হবে।[২২]

নেহরুর মৃত্যুর পর লালবাহাদুর শাস্ত্রী কিছুকাল প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার পালন করেন। ১৯৬৫ সালে মেক্সিকো থেকে ২৫০ টন বামন প্রজাতির গমের বীজ আমদানি করা হয়।[২৩] এম এস স্বামীনাথনদের মতো টেকনোক্রাটরা বললেন যে এই বামন প্রজাতির বীজগুলির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ রাসায়নিক ব্যবহার করলে আমাদের দেশজ লম্বা প্রজাতির শস্যগুলির প্রবণতা হল মাথা ভারী হয়ে নুয়ে গিয়ে পড়ে যায় (lodge)। বোরলো — যিনি পৃথিবী জুড়ে সবুজ বিপ্লবের জনক বলে পরিচিত — তিনি ইতিমধ্যেই ১৯৬৩ সালে স্বামীনাথনের আমন্ত্রণে ভারতে এসেছিলেন।[২৪]

রাসায়নিকের প্রয়োগ ও বামন প্রজাতির শস্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নতুন কৃষিকে তাড়াহুড়ো করে ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করায় বিপদ থাকতে পারে, এই মর্মে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শাস্ত্রী। কিন্তু ১৯৬৬ সালে তাঁর রহস্যজনক মৃত্যুর পর এই বিদেশি প্রযুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে। আমেরিকান পরামর্শদাতা ও বিশেষজ্ঞগণ — এমনকী যোজনা কমিশনকে পাশ কাটিয়ে ভারতে তাদের কার্যক্রম লাগু করতে সক্ষম হল।[২৫] সেই বছরই ভারত সরকার মেক্সিকো থেকে বিশাল পরিমাণ — ১৮ হাজার টন গমের (দুটি বামন প্রজাতির) বীজ আমদানি করে। সারা পৃথিবীতে একটি দেশ থেকে অন্য কোনো দেশে বীজের গমনের ইতিহাসে এটিই হল সর্বাধিক।[২৬] রাসায়নিক আমদানির মাত্রাও তীব্রভাবেই বাড়তে লাগল ওই বছর থেকেই।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (ICAR) দ্বারা প্রকাশিত 'ভারতে কৃষির এক ইতিহাস' গ্রন্থে এম এস রনধাওয়া লিখেছেন, "তৃতীয় যোজনায় রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়ছিল স্থির ভাবে (steadily) এবং ১৯৬৬–৬৭ সালে এই বৃদ্ধির হার হল বিশাল, যা ছিল তার আগের বছরের চেয়ে ৬০% বেশি।" রনধাওয়া ছিলেন আইসিএআর–এর অবসরপ্রাপ্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি এই পদ্ধতিটির প্রসার ঘটিয়েছিলেন। অথচ ওই একই অনুচ্ছেদের শেষে তিনি আরও লিখেছিলেন, "যেহেতু (এই) শস্য উৎপাদনের

প্রযুক্তি রাসায়নিক সারের উত্তরোত্তর বেশি প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল, তাদের বাজারে জোগান ও চাহিদার মধ্যে যে ফারাক তা দিনে দিনে বাড়তেই থাকবে।''

ওই একই বইয়ে তিন পৃষ্ঠার পর একটি বার চার্ট–এর ছোট্ট নিরীহ পাদটীকায় (footnote) রনধাওয়া মন্তব্য করেছেন যে ১৯৭০ সালে ১ ব্যারেল তেলের দাম ছিল ১ ডলার ৮০ সেন্ট, যা ১৯৮০ সালে (১৩ গুণ বেড়ে) হয়েছিল ২৩ ডলার ৪১ সেন্ট, যা কৃষি–উৎপাদনের খরচ বিরাট পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। যেহেতু তেল একটি অ–নবীকরণযোগ্য সম্পদ, তার দাম বাড়তেই থাকবে। তাই সস্তা খাদ্যের স্বপ্ন শূন্যে মিলিয়ে গেছে।

১৯৭৩–এর অক্লান্ত চাষিরা মোটেই সন্দেহ করতে পারেনি যে তাদের স্বল্পমেয়াদী কাঁচা টাকার রোজগার তাদের মূল পুঁজি খোদ জমির উর্বরতাকে খেয়ে ফেলছে। পাশাপাশি বাইরে থেকে কেনা সামগ্রী চাষের খেতে জোগান দেওয়ার ওপর নির্ভরশীলতাও বাড়িয়ে তুলছে। এক অর্থে তারা ভুল বুঝে ফাঁদে পড়ল। স্থির ভাবে (steadily) কৃষিকাজে উত্তরোত্তর খরচ বাড়তেই লাগল, প্রতি বছরে নতুন নতুন সমস্যা মাথা চাড়া দিতে লাগল, যাতে ভূমির ব্যাপক ক্ষতি ও গ্রামীণ দুর্দশা বৃদ্ধি পেল, বৃদ্ধি পেল ভূমির লবণাক্তকরণ, ভূমিক্ষয়, জলসংকট, শস্যনাশ — চাষিরা ঋণের ফাঁদে পড়ল এবং ব্যাপকভাবে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল।

২৯–০৭–২০০৬ তারিখে স্বামীনাথনকে লেখা তার প্রথম চিঠিতে ভাস্কর সাভে ফসলের বৈচিত্র্য হ্রাসে সচেতন কারিগরি প্রয়াসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এই সচেতন কারিগরি প্রয়াসের ফলে আমাদের মাটিতে ঘটেছে জীব–ভরের (bio-mass) অভাব এবং আমাদের মাটি দিন–কে–দিন বন্ধ্যা হয়ে পড়ছে। তিনি লিখেছেন, "আমাদের শস্যগুলির অসংখ্য, লম্বা, দেশজ প্রজাতি হাজার হাজার বছর ধরে স্থানীয় পরিবেশ ও প্রয়োজনীয়তার সাথে খাপ খাইয়ে অনেক বেশি জীব–ভরের (bio-mass) জোগান দিয়েছে, মাটিকে সূর্যের আঘাত থেকে ঢেকে রেখেছে এবং ভারী বর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির ছদ্মবেশে বিদেশি বামন প্রজাতিগুলি এদেশে ঢোকানো হল এবং তাদের প্রসার ঘটানো হল আপনারই প্রচেষ্টায়।''

"রাসায়নিক সার দ্বারা বৃদ্ধি করা এই বামনগুলি 'মারীপোকা ও রোগ প্রবণ' বলে কৃষি ক্ষেত্রে আরও বেশি বিষ (কীটনাশক) ঢালার দরজা খুলে দিল। কিন্তু আক্রান্ত কীট–প্রজাতিগুলি (বিষ) প্রতিরোধী হয়ে উঠল এবং দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করল। তাদের খাদক প্রাণীগুলি, যেমন মাকড়সা, সোনা

ব্যাঙ ইত্যাদি যারা এইসব কীট খেয়ে জৈব পদ্ধতিতে তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করত — তারা এইসব বিষ প্রয়োগের ফলে নিশ্চিহ্ন হল। তেমনই নিশ্চিহ্ন হল কেঁচো, মৌমাছি ইত্যাদি অনেক উপকারি প্রজাতিগুলি।''

“কৃষি–ব্যবসায়ী ও টেকনোক্র্যাটরা আরও কড়া মাত্রায় বিষ ঢালার সুপারিশ করল; আরও নতুন, বিষাক্ত (এবং ব্যয়বহুল) রাসায়নিক ব্যবহৃত হতে লাগল। কিন্তু মারীপোকা ও রোগের সমস্যা আরও বাড়তে লাগল, এই পাকে পড়ে বাস্তুতান্ত্রিক আর্থিক ও মানবিক ক্ষতি আরও বাড়ল।''

পরিবর্তন — দূরদৃষ্টির ফলে না বাধ্যবাধকতায়?

উর্বরতার প্রাকৃতিক চক্রটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আজকের যুগে তা আমাদের বাধ্যতামূলকভাবে সারিয়ে তুলতে হবে। বড়ো বুশের ইরাক যুদ্ধ যদি আরও কয়েকমাস দীর্ঘায়িত হত, তাহলে হয়তো দ্রুততার সাথে আমরা আমাদের পথ শুধরে ফেলতে বাধ্য হতাম। জীবাশ্ম–জ্বালানির (ন্যাপথা সহ) দাম চূড়ান্ত বেড়েছিল আর সেখানে রয়ে গিয়েছিল অনেক মাস ধরে। ভারতের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার প্রায় শূন্যে নেমে এল। আর যেহেতু ভারতের বেশিরভাগ সার কারখানাগুলিতে ব্যবহৃত ন্যাপথার বিরাট অংশটিই উপসাগর থেকে আমদানি করতে হত, এটার ফল দাঁড়াত এদেশের বাজারে সারের যোগান ভয়ংকর ভাবে কমে যাওয়া এবং তার দাম দেশীয় বাজারে ভীষণভাবে বেড়ে যাওয়া।

স্বল্প মেয়াদে উৎপাদন কমে গেলেও এটা যদি সত্যিই ঘটত তাহলে তা হত ছদ্মবেশে আশীর্বাদ। সোভিয়েতের পতনের পর যখন আমেরিকা কিউবার ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাকে দৃঢ়তর করেছিল, তা কিউবাকে বাধ্য করেছিল কার্যকরভাবে জৈবচাষে ঘুরে দাঁড়াতে এবং আত্মনির্ভরশীল সুস্থায়ী পথের শিক্ষা গ্রহণ করতে।[২৭] কিন্তু বড়ো বুশ ইরাককে পিটিয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির দাম কিছুদিনের জন্য পড়ে গিয়ে আবার বারংবার হেঁচকি তুলে ২০০৮–এর মাঝামাঝি তীব্রভাবে বেড়ে গেল।

পৃথিবী জুড়ে জীবাশ্ম–জ্বালানির ভাণ্ডার সুস্থিরভাবে ক্ষয়িষ্ণু আর তার চাহিদার বৃদ্ধি ঘটছে ক্রমাগত। ফলে জ্বালানির দাম ও তার ফলশ্রুতিতে সারের দাম আবার নিশ্চিতভাবে বাড়বে, দেরিতে নয়, তা ঘটবে শীঘ্রই। আবহাওয়া পরিবর্তনের বাধ্যবাধকতায় এবং তার দুঃস্বপ্নের মতো ফলশ্রুতি–গুলির জের জীবাশ্ম–জ্বালানি ও সারের দামের বৃদ্ধিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে।

ইত্যবসরে ভূমির উর্বরতা কমেই চলেছে। ভূমির উচ্চক্ষয় ও লবণাক্ত–করণের অন্তিম ক্ষেত্রগুলিতে —— যেগুলি দিনে দিনে স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে —— অতি উচ্চমাত্রায় কৃষি–রাসায়নিক ব্যবহার করেও মাটির পেট থেকে জোর করে বেশি ফলন বের করা সম্ভব হয় না। এটি নিশ্চিতভাবে এক পরাজয়ের পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে সুরাহার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে যত দেরি হবে, ঘনায়মান সংকটগুলির মোকাবিলাও ততই কঠিন হয়ে পড়বে।

প্রাকৃতিক কৃষির ‘পূর্ব পদক্ষেপ’ হিসাবে জৈবকৃষি

ভাস্কর সাভে জোর দিয়ে বলেন যে উর্বরতা কমে গেছে এমন জমি পুনরুজ্জীবনের জন্য দেখতে হবে যাতে জমি থেকে বেরিয়ে যাওয়া কিংবা বিক্রি হওয়া জৈব দ্রব্যের পরিমাণ জমিতে বাইরে থেকে প্রয়োগ করা জৈব–ভরের (bio-mass) চেয়ে বেশি না হয়।

বরং তাঁর পরামর্শ হল যে শুরুতে নূন্যতম খরচে হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন জৈব বর্জ্য জমিতে বেশি করে ফেলতে হবে। সমস্ত রকমের বিষহীন জৈব পদার্থ —— তাদের নির্দিষ্ট পুষ্টিমূল্য যাই হোক না কেন —— তারা মাটিতে বাস করা জীব ও জীবাণুগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। এর ফলে মাটির ভেদ্যতা (Porosity) ও জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও গাছ–পাতা বৃদ্ধিতে দারুণভাবে সাহায্য করে।

কয়েক বছরের মধ্যে খামারে জৈব–ভর বৃদ্ধির সাথে সাথে মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় আর তখন মাটি থেকে খাদ্য হিসাবে যতটা জৈব পদার্থ বেরিয়ে যায় ততটা জৈব পদার্থ জমিতে ফিরিয়ে দিলেই তা পূরণ করা যায়। আবার এর কয়েক বছর পরে এটাও আর তেমনভাবে প্রয়োজনীয় নয়, বিশেষ করে প্রাকৃতিক বনভূমির মতো একটি পরিণত প্রাকৃতিক বাগিচায়। অন্তত সমস্ত অ–খাদ্য জীব–ভর–ফসলের অবশিষ্ট অংশ ও পাতার আচ্ছাদন —— এগুলি কিন্তু বিশেষ যত্ন সহকারে মাটিতে ফিরিয়ে দিতে হবে। সাথে দিতে হবে খামারে সৃষ্ট হওয়া সমস্ত পশু ও মানুষের বর্জ্য পদার্থ।

যে কৃষকরা রাসায়নিক পরিত্যাগ করছে তারা এই বাইরে থেকে কম মাত্রায় জোগানো দ্রব্যাদি (low external input) দিয়ে জৈব চাষ শুরু করতে পারে। যদি বুনিয়াদি দৃষ্টিভঙ্গীটা হয় অহিংস এবং প্রাকৃতিক যাবতীয় প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম হস্তক্ষেপ, তবুও এটিকে প্রাকৃতিক চাষের এক অশুদ্ধ রূপ হিসাবে মনে করা যেতে পারে। তারপরে এই কৃষির শুদ্ধতর রূপ ‘কিছু না–করা’ (do-nothing) কৃষির অনুশীলনের কথা ভাবা যেতে পারে।

বিশেষত বৃক্ষ ফসলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বৃক্ষ যতই পরিণত হতে থাকে ততই তারা আত্মনির্ভরশীল হয় আর তাদের জন্য বাইরে থেকে আমাদের আর কিছুই করার বা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। একজন ভালো চাষি, ভালো পিতা-মাতার মতো তার কচিকাঁচার জন্য উদ্বিগ্ন হতে পারে, কিন্তু সাথে সাথে তার এই বুদ্ধিরও প্রয়োজন যে গাছেরা (অথবা সন্তানরা) বেড়ে ওঠার সাথে সাথে ধীরে ধীরে নিজেদের দেখভাল করতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

ভাস্কর সাভে আরও বলেন যে বহুবর্ষজীবী গাছ-ফসলগুলির সবচেয়ে ভালো দেখভাল হয় বিশুদ্ধ 'কিছু না-করা' প্রাকৃতিক কৃষির দ্বারা। বাৎসরিক বা মরশুমি খেত-ফসলের ক্ষেত্রে সবসময় কিছু না কিছু নজর দেওয়া প্রয়োজন। এটি বিশেষভাবে সত্য আমাদের ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে, যেখানে সারা বছরের বৃষ্টির বেশিরভাগটাই ঘনীভূত হয় বর্ষার ৩/৪ মাস জুড়ে। ফলে সারা বছর জুড়ে বিশাল ফাঁকা মাঠ প্রখর সূর্যের তাপে সেঁকে শক্ত হয়ে যায়। এজন্য প্রতি বছর বীজ বুনবার আগে অন্তত অগভীর খননের (shallow tillage) প্রয়োজন হয়।

প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের পুনরুদ্ধার

"প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষিকাজ" গ্রন্থে বৌদ্ধ কৃষক ফুকুওকা[২৮] জৈব খেতচাষকে হীনযান কৃষি বলে বর্ণনা করেছেন। হীনযান কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল 'ছোটো যান'। কিন্তু যেহেতু এই চাষ-ব্যবস্থা মাটিকে কতকগুলি মৃত রাসায়নিক পদার্থের সমষ্টি বলে মনে করে না, বরং মাটিকে এক সজীব, গতিশীল সত্তা বলে মনে করে, তা অজৈব 'বৈজ্ঞানিক' কৃষিকাজের চেয়ে অনেক উন্নত। ফুকুওকা লিখেছেন, "হীনযান জৈব কৃষিতে প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা রয়েছে, যদিও তার সাথে সম্পূর্ণ মিলন এখন বাস্তবায়িত হয়নি"... কারণ জৈবচাষি এখনও খনন, আগাছা পরিষ্কার এবং বাইরে থেকে জৈব সারও প্রয়োগ করে।

কিন্তু ফুকুওকা বলেন, মহাযান (বড়ো যান) প্রাকৃতিক কৃষিতে মানুষের সত্তা, সমস্ত বিভেদ পরিহার করে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, যারা এরকম জীবনযাপন করে, তারা বাস্তবিকই সন্ন্যাসী ও জ্ঞানী পুরুষ। এরকমই মানুষজন ছিলেন আমাদের ঋষিরা যাঁরা কাঁচাফল খেয়ে ও বনের ফসল সংগ্রহ করে বেশ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বনে বাস করতেন।

কৃষির আবির্ভাবের আগে পৃথিবীর অন্যান্য জীব-জন্তুদের মতো মানুষ

তখনও তাদের চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট খাবার পেত। দ্য গাইয়া অ্যাটলাস অফ প্ল্যানেট ম্যানেজমেন্ট–এর মতে পৃথিবীতে ভক্ষণ করা যায় এমন গাছ–গাছালির সংখ্যা হল আনুমানিক ৮০,০০০।[২৯] এদের বেশিরভাগটাই হল অকৃষিজাত খাদ্য, প্রকৃতির দান, যেগুলি প্রকৃতিতে — সাধারণত বনাঞ্চলে — আপনিই বেড়ে ওঠে। যেজন্য সংগ্রহ করা ছাড়া আর কোনো মনুষ্যশ্রমের প্রয়োজন হয় না। এই ৮০,০০০ প্রজাতির মাত্র ১৫০টি বৃহদাকারে চাষ করা হয়। ভাবা যায়, এদের মধ্যে মাত্র ২০% প্রজাতি এখন ৯০% মানব–খাদ্যের জোগান দেয়![৩০]

ভারতে অনেক আদিবাসী, যারা জঙ্গলে বা জঙ্গলের কিনারায় বসবাস করে, তারা অসংখ্য বুনো ও অকৃষিজ গাছ–খাদ্য চেনে ও খায়। বনবাড়ি জঙ্গলের আদিবাসীরা বর্তমান লেখককে এমন তিন ডজন প্রজাতি অনায়াসেই চিনিয়েছিল। কিন্তু বনভূমির ধ্বংস বা বেড়া সৃষ্টির (enclosure) সঙ্গে সঙ্গে গাছ–গাছালির ঐতিহ্যগত জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে আমরা ক্রমাগত প্রকৃতির প্রাচীন সমৃদ্ধ ব্যবস্থা (order) থেকে দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এখন আমাদের জরুরি প্রয়োজন হল সব কিছু সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আগে প্রকৃতির সঙ্গে সেই স্বাস্থ্যকর সম্বন্ধ ফিরিয়ে আনা।

বাণিজ্যিক জৈব চাষের সমস্যা

বর্তমান বাজারমুখী জৈব চাষে, বেশি আর্থিক লাভের জন্য বাইরে থেকে দেওয়া জৈবসারকে এক ধরনের কাঁচা মাল মনে করা হয়। এর বিপদ হল, জৈবসারগুলির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে অন্য জমি সেইসব জৈব পদার্থ থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে একটা ক্ষুদ্র শতাংশ চাষি যারা দাম দিয়ে জৈব সার/জৈব বর্জ্য কিনতে পারে, তারা গরিব চাষি ও সাধারণ জমির ক্ষতির বিনিময়ে লাভবান হয়।

জাপানের মতো দেশগুলিতে এটি ইতিমধ্যেই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই ফুকুওকা এইরকম জৈব চাষকে (বাইরে থেকে প্রযুক্ত জৈবসারে চাষ করা) মনে করেন হীনযান — যা সবার মঙ্গল করতে পারে না। এছাড়া বহু বাণিজ্যিক জৈবচাষি ব্যাপকভাবে (দু)এক রকমের চাষ (monoculture) চালিয়ে যায় যাতে সহজে ফসল তুলে বিক্রি করা যায়। এর ফলে অণু–পুষ্টির (micro-nutrients) অভাব, গাছের বিভিন্ন রোগ ও মারীপোকার আক্রমণ ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয় — যেগুলি আবার চাষির অধিকতর হস্তক্ষেপ আদায় করে তাকে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা (natural order) থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

ভারতে সাম্প্রতিককালে বাণিজ্যিক জৈব চাষ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি ঘটেছে ১৯৯০ দশক থেকে, যখন সরকার এই চাষের প্রসারে সক্রিয়ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।[৩১] ব্যাপারটা এইজন্য নয় যে আমাদের জনসাধারণের বেশি করে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া উচিত, বরং এইজন্যে যে এখন ইউরোপীয় দেশগুলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের কাছ থেকে বিশ্বাসযোগ্য শংসাপত্র পাওয়া (certified) জৈব উপায়ে তৈরি খাদ্য কিনতে চাইছে। ওই দেশগুলিতে ক্রমাগত বেশি সংখ্যক মানুষ উপলব্ধি করছে যে জৈবচাষে উৎপাদিত খাদ্য স্বাস্থ্য (ও স্বাদের) দিক থেকে অনেক ভালো এবং তারা এই উন্নত গুণমানের জন্য অধিকতর মূল্য দিতে রাজি।

জি এম (Genetically Modified) বা জিন প্রযুক্তি দিয়ে বদলানো (modified) ফসল আরও সমস্যা ডেকে আনে।

অংশত কৃষি–রাসায়নিকের ব্যবহারের কুফল এবং সেগুলি যে আরও দীর্ঘদিন ব্যবহার করা সম্ভব নয় এই উপলব্ধি থেকে কৃষি–শিল্প (agro-industry) জীব–প্রযুক্তির (bio-technology) মধ্যে এক বাণিজ্যিক রাস্তা আবিষ্কার করেছে এবং সে পথটিকে কৃষকের নতুন রক্ষাকবচ বলে চালানোর চেষ্টা করছে। ভার্মিকালচার (কেঁচো সার), টিস্যু–কালচার, বিদেশী খাদক ও পরজীবী–প্রতিরোধক দ্বারা জৈব উপায়ে মারীপোকা নিয়ন্ত্রণ, নির্বাচিত অণু–জীবদের টীকাকরণ (inoculations of selectively bred micro-organisms) ও জিন বদল করা প্রজাতি — এগুলি চালু হয়েছে। এমনকী কৃষি–রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরাট সব স্থপতিরাও এখন জীব–প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান বা শিল্পগুলি চালাচ্ছে।

নতুন জীব–প্রযুক্তির (bio-technology) দাওয়াইগুলির জন্য সাধারণত প্রয়োজন বিপুল লগ্নি ও বাহ্যিক কৃৎকৌশল। যদিও তাতে আমাদের তাৎক্ষণিক (স্বল্পমেয়াদী) সুবিধার জন্য প্রকৃতির ওপর কারিগরির পুরোনো মানসিকতা পুরোমাত্রায় রয়ে গেছে। এটি প্রাকৃতিক চাষের মূল ভাবনা বা সত্তার পরিপন্থী। এই ভাবনা সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন প্রযুক্তি ক্ষেত্রটির বাইরে সর্বস্তরেই ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে।[৩২]

তার নিজস্ব বিধানেই এই জীব–কারিগরিবিদ্যার দৃষ্টিকোণটি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বিশেষত জিন বদলের ক্ষেত্রে — অবধারিতভাবে ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণে — কয়েকটি সীমাবদ্ধ বৈশিষ্ট্যকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে, যেমন একটি বিরুৎ–নাশকের বিরুদ্ধে (herbicide) এই বদল করা

জিন কতখানি সহনশীল। কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে কী বিশাল ক্ষতিকারক প্রভাব পড়তে পারে সেগুলি না জেনেই তা করা হয়। এ প্রশ্নে সাভের মন্তব্য "প্রকৃতি তার বিশাল কর্মকাণ্ডে হাজার লক্ষ উৎপাদকদের মধ্য দিয়ে যে বিপুল সূক্ষ্ম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কাজ করে চলে তা কার্যত দুর্জ্ঞেয় এবং তা উজ্জ্বলতম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারদের পেশাগত উদ্বেগ ও জ্ঞানের সীমার অনেক বাইরে।"

মাসানোবু ফুকুওকা মন্তব্য করেছেন, "বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন প্রকৃতি হল ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রকৃতির ভূত।" সাভে আরও বলেন, "জীব-প্রযুক্তিবিদদের হয়তো তাদের পৃষ্ঠপোষকদের নির্দেশে পরিষ্কার ভাবে নির্দিষ্ট কতকগুলি আর্থিক স্বার্থের কথা মনে রাখতে হয়, কিন্তু (প্রকৃতিতে) সেই সামগ্রিক ভারসাম্য যা বিপুল বৈচিত্র্যময় উপাদান ও শক্তিসমূহের সেই রহস্যময় ঐক্যতানে সকলের স্বাস্থ্যকে লালন করে, সেই ভারসাম্য সৃষ্টি করার কোনো চেষ্টার কথা তারা কল্পনাতেও আনতে পারে না।"

যেহেতু জিন-কারিগরিবিদ্যা আর তার শৈশবাবস্থায় নেই —যদিও সবে সে তা অতিক্রম করেছে —তার থেকে উদ্ভুত অনেক সমস্যা এখন পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। আন্তরিক কামনা এটাই যে আমাদের সভ্যতা যেন পারমাণবিক দানবের থেকেও বড়ো কোনো ফ্রাংকেনস্টাইনের জন্ম না দিয়ে ফেলে।

সাভে সওয়াল করেন, "যদি আমরা শুধুমাত্র এটা দেখতে সক্ষম হই যে হাজার লক্ষ বছর ধরে সময় পরীক্ষিত প্রকৃতি-সৃষ্ট প্রজাতিগুলির জিন কোডে কোনো কিছুরই অভাব নেই ... তাহলে আমরা উপলব্ধি করব যে আমাদের জীবনের ডিএনএ ফিতেকে বদল করার কোনোরকম প্রয়োজন নেই। আর সকলের মঙ্গলের জন্য আরও অনেক সুস্থ ও সুখকর পথ রয়ে গেছে।"

বস্তুত প্রকৃতি উদার হস্তে গড়ে তুলেছে এই বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ও উৎপাদিকা শক্তি, যার সাক্ষ্য বহন করছে অপূর্ব সমৃদ্ধশালী ক্রান্তীয় বনভূমিগুলি। দূর্ভাগ্যবশত আধুনিক কৃষিতে টাকাই সব এবং এই কৃষি তার শিকড় থেকেই হিংসাত্বক। তা সমস্তরকম জীব ও গাছ-গাছালির প্রতি অসহিষ্ণু ও ধ্বংসাত্বক। তার একমাত্র লক্ষ্য হল (দু)এক ধরনের চাষে (monoculture) মাটিকে নিংড়ে নিয়ে ক্রমবর্ধমান বাজার ও মুনাফা।

ওয়েন্ডেল বেরি একজন অনুভূতিশীল চিন্তক, জৈবচাষি ও লেখক। তিনি বলেন "যখন আমরা আমাদের খাদ্য-উৎপাদনের পথ বদলাই, আমরা

আমাদের খাদ্য, আমাদের মূল্যবোধ, আমাদের সমাজকেই বদলে ফেলি ... প্রাকৃতিক চাষ আমাদের অসুস্থ সম্পর্কগুলি সারিয়ে তোলে।''[৩৩]

ভাস্কর সাভে আরও বলেন, ''অহিংসা হল আমাদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক বিবর্তনের প্রধান চিহ্ন। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক চাষের মাধ্যমে এটি অর্জন করা সম্ভব।''



ওরলি আদিবাসীদের সুস্থায়ী জীবনসংস্কৃতি

সৃষ্টির অখণ্ডতা সংরক্ষিত রাখার ক্ষমতা হল ওরলি সভ্যতার এক মাপকাঠি। তাদের সংস্কৃতি আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত, প্রাণী ও অপ্রাণীকে এক অখণ্ড সমগ্রতায় বেঁধে রেখেছে।

জঙ্গলে নানাবিধ গাছ–গাছালি ও জন্তু–জানোয়ারের সংরক্ষণ ওরলি সংস্কৃতির এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদের অনেক গানের বিষয়বস্তুই হল এটি। তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলি গাছের বিভিন্ন অংশ থেকে তৈরি করা হয়। প্রধান বাদ্যযন্ত্র তরপা তৈরি করা হয় শুকনো লাউ থেকে। ওরলি নৃত্যে সারা গ্রামের মানুষ হাতে হাত ধরে একসুরে এক তালে নাচে। তাদের কুঁড়ের মাটির দেওয়ালে বৃক্ষ বা উর্বরতার দেবী পালঘাটের ছবি আঁকা হল তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য। যখনই কৃষিকাজে ও বাড়ি–ঘর তৈরিতে প্রয়োজন হয়, তখনই তারা একে অন্যের জন্য বিনা পয়সায় শ্রম দেয়। এভাবেই তারা শ্রমের বিভাজনের দ্বারা অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাজনকে এড়িয়ে চলে।

ওরলি সমাজে কোনো অবাঞ্ছিত শিশু নেই। শিশুরা যারা তাদের পিতামাতাকে হারিয়েছে অথবা কুমারী মায়ের গর্ভজাত — তাদের সকলকেই সমাজ স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে গ্রহণ করে। খাবারের অভাব ঘটলে প্রাপ্তবয়স্করা না খেয়ে থাকে। কিন্তু শিশুদের আগে খাওয়ানো হয়। শাস্তির প্রশ্নে সন্তানরা পিতামাতা বা অভিভাবকদের প্রশ্রয় পায়। কারণ তাদের কাছে শিশুদের শাস্তি দেওয়া হল বর্বরতা। আর ওরলিদের মধ্যে কোনো ভিখারি নেই।

ওরলিরা সাধারণত পুষ্টিগতভাবে সম্পূর্ণ খাবার গ্রহণ করে। ঐতিহ্যগত খাদ্যাভাসে তারা তাদের তৈরি জৈব ফসল ছাড়াও স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন শ–খানেক ভক্ষণযোগ্য বুনো গাছ–গাছালি খেত। তাছাড়া ছিল মাছ, কাঁকড়া, ডিম ... (নুন ছাড়া তাদের প্রায় কোনো কিছুই কিনতে হত না)।

তারা দুধ খায় না। দুধ বাছুরের জন্য রেখে দেওয়া হয়। কারণ তারা

মনে করে গরুর দুধের অধিকার বাছুরের, তাদের নয়। গরু বুড়ো হয়ে গেলে তাদের কাটবার জন্য বিক্রি করা হয় না, বরং বুড়ো বয়সে যেন তারা অবকাশের মুক্তজীবন যাপন করতে পারে, সেজন্য তাদের ছেড়ে রাখা হয়।

ওরলিদের জ্ঞানভাণ্ডারটি বিশাল। এই জ্ঞান অসংখ্য প্রজন্ম পরম্পরায় প্রবাহিত হয় মুখে মুখে। একটি বারো বছরের ওরলি বালক গড়পড়তা অন্তত একশোটির বেশি বিরুৎ (herbs) *গুল্ম* (shrubs) *, লতা ও বৃক্ষের নাম ও তাদের বিবিধ ব্যবহার জানে।*

কোন গাছ খাওয়ার যোগ্য, কোনগুলি তন্তুর উৎস। কোনগুলি ভালো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়, কোনগুলির ঔষধিমূল্য আছে ... এবং সেগুলি কোথায় পাওয়া যায়। এবং সে এছাড়া আরো অনেককিছু জানে — যা এক বিশাল ব্যপ্ত ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা। যার দ্বারা সে নিজের ও অন্যদের দেখভাল করতে পারে। আর বলা বাহুল্য, গল্প গান সঙ্গীত — তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার প্রকৃত অভিব্যক্তির নানাবিধ প্রকাশের দক্ষতার কথা। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই ধরনের জ্ঞান ও দক্ষতার কোনো মূল্য দেওয়া হয় না। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এইসব জ্ঞান ও দক্ষতার ক্ষয়ে সাহায্য করে, বিশেষত তাদের ক্ষেত্রে, যারা স্কুলে যায়।

(উইনিং পেরেরা লিখিত আর্থকেয়ার বুকস দ্বারা প্রকাশিত ২০১০ 'দ্য সাসটেনেবল লাইফস্টাইল অব দ্য ওরলিস্' (ওরলিদের সুস্থায়ী জীবনশৈলি) থেকে গৃহিত ও কিঞ্চিত পরিমার্জিত)



টীকা এবং উল্লেখিত গ্রন্থাদি

১। Ashok Sanghavi, `The Way to Health, Wealth and Happiness on Bhaskar Save, 2004, pg. 55.
২। Wininin Pereira, ``Asking the Earth`, The other India Press, 1992, also Published as an independent essay, `The Sustainable Lifestyle of the Worlis`, Earthcare Books, 2010.
৩। পূর্বে উল্লেখিত,
৪। ডঃ জীবনজী মোদিদের মত গবেষকদের মতে পার্সীরা ভারতে পৌঁছেছিল ৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে —এই মন্তব্যটি করেছেন এইচ.ই.এডুলজী তার পার্সী থেকে ইংরাজিতে অনুদিত 'কিস্‌সে–ই–সনজন' বইটির মুখবন্ধে।
৫। বছরের শুখা আট মাস জুড়ে ভাস্কর ভাইয়ের বাবা প্রধানত গরুর গাড়ি করে খামার ও বনভূমির ফসল পরিবহনের কাজ করতেন।
৬। Ashok Sanghavi, op cit pg. 61-62
৭। পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা ৬৪।
৮। ভাস্কর সাভে বলেন যে এই আধা–বামন প্রজাতির ধান হবিশচন্দ্র গোপাল পাতিল এনেছিল জাপান থেকে। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন ১৯৫১–১৯৫২ সালে। সাধারণত বোরলো ও তার সহযোগীদের কৃতিত্ব স্বীকার করা হয় এই বলে যে তারা রাসায়নিক–সংবেদী বামন প্রজাতির গমের চাষের পথপ্রদর্শক। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা হল এটিই যে জাপানীরাই হল প্রথম যারা গম ও চালের উভয়েরই বেঁটে প্রজাতি নির্বাচন করে তা কার্যে রূপায়িত করার কৌশল (Strategy) লাগু করতে শুরু করেছিল এবং তাতে রাসায়নিক ব্যবহার করেও গম ও চালের প্রজাতির শীর্ষ মাথা ভারী হয়ে ঝুলে (lodge) পড়ত না। এটা ঠিক দ্য রকফেলার ইন্সটিটিউট ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন, বোরলো, স্বামীনাথন, আই.আর.আর.আই. এই ধারনাকে অন্যান্য দেশে ব্যাপক ভাবে প্রসার ঘটিয়েছিল। কিন্তু তারা যে বামন বা আধাবামন প্রজাতির 'গম ও ধান'কে উন্নীত করেছিলেন এবং বিস্তারিত ভাবে প্রসার করেছিলেন তাদের বেশির ভাগ প্রজাতিই তারা জাপানী নবীন প্রজাতিগুলি থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন।
৯। Ashok Sanghavi, op cit pg. 65.
১০। পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা ৬৫–৬৬।
১১। পূর্বে উল্লেখিত পৃষ্ঠা –৭৪।
১২। Report of India's National Commission on Farmers, 2006.

১৩। `Tending the Earth`, Traditional Sustainable Agriculture in India by Winin Pereira, Earthcare Books, 1993; reprinted 2009.
১৪। Agricole's 1986 reprint of Voelcker's Report, pg.11.
১৫। `An Agricultural Testament` by Sir Albert Howard, 1940; Indian reprint published by Earthcare Books, 2006, pg.10.
১৬। Ashok Sanghavi, op cit pg. 80-81.
১৭। পূর্বে উল্লেখিত পৃষ্ঠা, ৮৪।
১৮। শুরুতে ভাস্করভাই তার ধান জমি ছোট ছোট খণ্ড জমিতে (plots) ভাগ করে নিলেন। প্রতি খণ্ড জমির সর্বোচ্চ এলাকা হল আধ একর বা দেড় বিঘা। এই খণ্ড জমিগুলির মধ্যে তিনি মাটির বাঁধ তৈরি করলেন এবং তাদের মাঝখানে বিভিন্ন শাকসব্জীর চাষ করলেন তার পরিকল্পনা ছিল যে নারকেল ও সবেদার চারাগুলি ভালভাবে বেড়ে ওঠার পর তারা তাদের মূল ছড়িয়ে দেবে আর এই বাঁধকে দুইদিক থেকে বেশি মাটিসহ শক্ত করে বেঁধে রাখবে আর এভাবে মঞ্চের (Platform) মত বাঁধগুলি বিস্তৃতি পাবে। (Ashok Sanghavi, op cit pg. 89-90.)
১৯। `The Violence of Green Revolution` by Vandana Shiva, 1989, pg. 77
২০। ২৭–০৯–৫১ তারিখে একটি সেমিনারে কে.এম.মুন্সী (তখনকার কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী) উপস্থিত সমস্ত রাজ্য কৃষি আধিকারিকদের (Direcitors of Agriculture) তাদের দায়িত্বে থাকা প্রতিটি গ্রামের জলচক্র ও (মাটির) পুষ্টি চক্রকে পুনরুদ্ধার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। (`The Violence of Green Revolution` by Vandana Shiva, 1989, pg. 77)
২১। `Handbook of Agriculture`, Indian Council of Agricultural Research (ICAR), 1987, pg.105, `Table Compound Rates of Growth in Producition and Producitivity for all crops`.
২২। `The Green Revolution`: A Historical Perspecitive`, Readings from the PPST Bulletin, Madras.
২৩। `A History of Agriculture in India`, by M.S. Randhawa, Indian Council of Agricultural Research, 1986, vol.4, pg.370.
২৪। পূর্বে উল্লেখিত পৃষ্ঠা –৭৪।
২৫। `The Violence of Green Revolution` by Vandana Shiva,

1989, pg.8.

২৬। `A History of Agriculture in India`,op.cit.pg.370.

২৭। `Organic Revolution` The Agricultural Transformation of Cuba since 1990`, Bharat Mansata, Earthcare Books, 2008.

২৮। `The Natural Way of Farming` by Masanobu Fukuoka, Japan Publications, 1985, pg.93-95 (An Indian edition, 1993 has been published by Bookventure)

২৯। `The Gaia Atlas of Planet Managemant`, edited by Norman Myers, Pan Books, 1985, pg.156.

৩০। পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা — ১৫৬

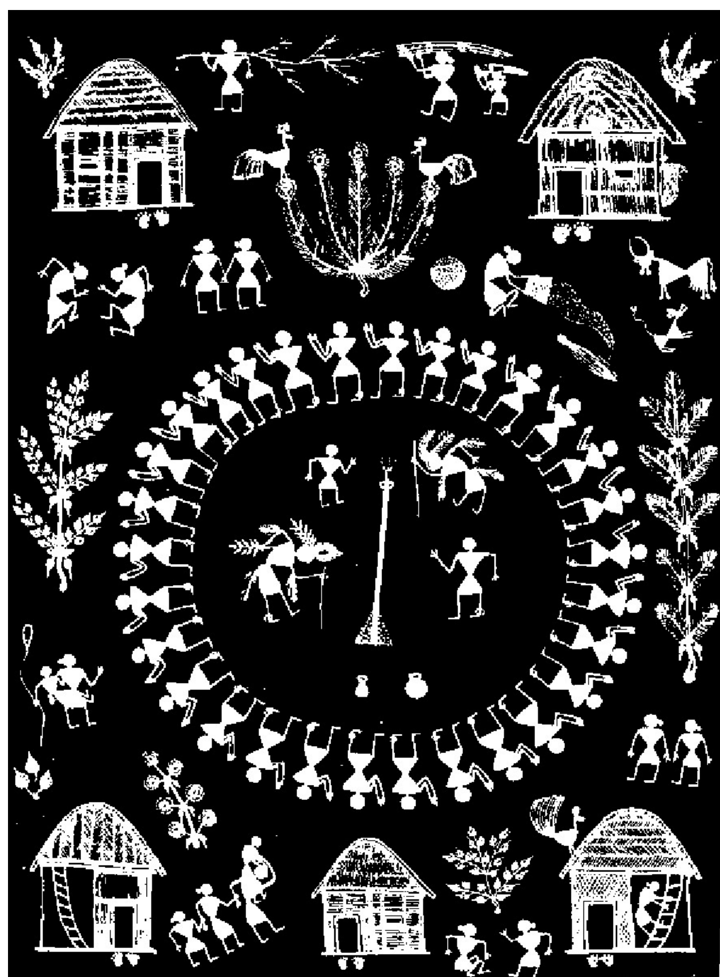
৩১। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় ভারতে কৃষি রপ্তানিতে ৩০০% বৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছিল। কে.এল. চাড্ডা, ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল (হর্টিকালচার) ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ', 'দ্য হিন্দু সার্ভে অফ ইন্ডিয়ান এগ্রিকালাচার, ১৯৯৪, ১১১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "জৈবচাষে সৃষ্ট বিভিন্ন ফল শাক-সব্জী ও তাদের বিবিধ উতপন্ন দ্রব্যের রপ্তানি বাজারে ভাল ভবিষ্যত আছে। তাদের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা লাগু করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে সুবিধা প্রাপকদের (beneficiares) জন্য নিম্নলিখিত আর্থিক সহায়তা (এই সুবিধা প্রাপকরা হলেন, উৎপাদক, রপ্তানীকারী, উদ্যোগী) উদ্যোগটি লাভজনক হবে কিনা তা অধ্যয়নের feasibility study) জন্য ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত; উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংক্রান্ত লেখা-জোকা (literature) প্রস্তুতির জন সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, বিশেষ পরিবহনকারী গাড়ী কেনার জন্য ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, রপ্তানি প্রসারের জন্য ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, প্যাকেজিং এর উন্নতির জন্য ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, গুণমানের উন্নতির জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, ফসল তোলার পর তার নাড়াচাড়ার উন্নয়নকল্পে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, প্রতিটি সুবিধাভোগীদের জন্য আর্থিক সহায়তা হল তাই ১৬.৫ লক্ষ টাকা। (অবশ্য খামারে যারা কাজ করে ফসল ফলান তাদের আর্থিক সহায়তার কোন কথা সেখানে নেই, নেই সার ও চারা কিনবার জন্য কোন সহায়তার কথাও। শুধুমাত্র ঘটনাক্রমে কিছু ছায়া কার্যই (shadow work) সরকারি সহায়তার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়!)

৩২। সাধারণত কিনে আনা বিদেশী প্রজাতির কেঁচো ও অণুজীবরা...স্থানীয় অঞ্চলের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না, তাই টিকে থাকতেও পারে না।

ফলে চাষির লোকসান হয়। কারিগরী সমাধানগুলি নিকৃষ্টতর, জৈবভাবে মারীপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য যদি কোথাও বিদেশী প্রজাতির খাদক (Predator) বা প্যারাসিটয়েডদের এনে ছাড়া হয়, দেখা যায় তারই সংখ্যায় ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেয়ে, পুরোন সমস্যার বদলে নতুন সমস্যার জন্ম দেয়। জিনকারীগরী বিদ্যার দ্বারা বদলানো প্রজাতির ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

৩৩। Wendell Berry, in his preface (মুখবন্ধে) to Fukuoka's `The One Straw Revolution`, 1978, Rodale Press.

জীবন চক্র



৫

জীবনচক্র
সূর্য বীজ ধারণ করে
গর্ভবতী পৃথিবী
জীবনের ঝরনাধারায় সৃষ্টি করে চলেছে
বিশ্বের ভিতরে বিশ্ব

মাটির প্রাণশক্তি এবং পুষ্টিচক্র

ভাইটালিটি শব্দটির উৎস হল ল্যাটিন ভাইটা বা জীবন আর ফার্টিলিটি শব্দটি এসেছে ল্যাটিন ফার্টিলিস থেকে যার অর্থ হল বহন করা।[১] আমাদের পৃথিবী যেন একক এক দ্বীপ যার গর্ভে প্রাণের প্রাচুর্য্য সৃষ্টি ও লালন করার বিরলতম সক্ষমতা রয়েছে, যে কারণে সারা দুনিয়া জুড়ে আমরা তাকে বলি মা ধরিত্রী; তিনি শুধু মানুষের মা নন, তিনি অসংখ্য গাছপালা, জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গেরও মা। আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের সমগ্র পৃথিবীটাকে একটা পরিবার হিসাবে দেখতে শিখিয়েছিলেন — 'বসুন্ধইবো কুটুম্বকম' — ভাস্কর সাভে স্মরণ করিয়ে দেন এবং 'পরস্পর সহা-অস্তিত্বা' বা পারস্পরিক নির্ভরশীলতার নিয়ম এটিকে পরিচালিত করে।'

গণনার অতীত লক্ষ-কোটি বছর ধরে প্রাণের ঝরনাধারা মা বসুন্ধরা বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ভরা প্রাণের জন্ম দিয়েছেন এবং তাদের মুখে তুলে দিয়েছেন অন্ন। এবং সাম্প্রতিককালে মৌলিকভাবে আত্মহত্যাপ্রবণ প্রযুক্তি-অর্থনীতির জালে জড়িয়ে পড়া আধুনিক মানুষের দ্বারা প্রকৃতির ওপর উদ্ধত সংহারলীলা সংগঠিত হওয়া সত্ত্বেও এখনও মা বসুন্ধরা তা করে চলেছেন।

এখন আমরা আমাদের নিজস্ব প্রকৃতি থেকে এতখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি যে প্রকৃতির একীভূত উপাদানগুলির ভিতর আন্তঃসম্পর্ক, আন্তঃপ্রবেশ ও অখণ্ডতাকে সামগ্রিকভাবে দেখতে আমরা অক্ষম হয়ে পড়েছি। এখান থেকে — এই মাটি, জল, হাওয়ায় ব্যাপ্ত বিশাল প্রাণের এই সমাহার থেকে আমরা

মানবজাতি উদ্ভূত হয়েছি এবং আমরা এখনও এই প্রাণের সমগ্রতারই অঙ্গ। কিন্তু আমাদের শিকড় ভুলে গিয়ে আমরা বিশাল এই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় আমাদের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যতের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছি।

ভাস্কর সাভে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন যে 'কেমিকাল ফার্টিলাইজার' এই নামকরণটি ডাহা ভুল, শব্দ ব্যবহারে চাতুর্য ও বিজ্ঞাপনী কৌশল। এই কৌশল করা হয়েছে অন্তর্নিহিত মিথ্যাটাকে ঢেকে রাখার জন্য। কারণ কারখানা থেকে বের হওয়া কৃষি–রাসায়নিকগুলি মাটিকে প্রাণবান করে তুলে তার উর্বরতা বৃদ্ধি করার বদলে তা খনন করে, ধ্বংস করে। তারা ক্রমাগত মাটিতে বসবাসকারী প্রাণ — মাটির জীব ও অণুজীবগুলি — যারা আসলে মাটির উর্বরতাকে পুনরুজ্জীবিত করে[২] — তাদের ওপর ধ্বংসলীলা চালায়। কিন্তু রাসায়নিক সার ব্যবহার এড়িয়ে গেলে এক মরশুমে ভালো বর্ষা হলেই তা পুরোনো বিষ ধুয়ে ফেলে মৃতপ্রায় মাটিতে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে বিরাট সাহায্য করে, বিশেষত সেই মাটিতে যদি কিছু জৈব বর্জ্য ঢালা হয়।

আমাদের মাটির প্রাণশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে আমাদের জৈব–সম্পদে নিরক্ষর (bio-resource illiterate)[৩] আধুনিক সভ্যতাকে প্রথমে নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে যে বর্জ্য নামক জিনিসটি প্রকৃতির অপরিচিত। ভাড়াটে মানুষ দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে শুধুমাত্র অযত্নে ও ভুল জায়গায় ব্যবহার করার ফলেই তৈরি হয় বর্জ্য।[৪] দুশ্চরিত্র বিশ্বায়িত অর্থনীতি তার বেপরোয়া ভোগবাদ, শিল্পযোজনাবাদ ও যুদ্ধং দেহী সামরিক আয়োজন — এই তিন পায়ের দাম্ভিক, টলমলে মাতাল পদচারণায় — সমগ্র পৃথিবীটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে এক সুবিশাল বর্জ্যপাত্রে পরিণত করছে। যদি সুস্থ মনোভাবাপন্ন মানুষদের একটা ভগ্নাংশও এই বিশাল মৃত্যুর নীরব প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে না থাকে, তাহলে এটা কিছুতেই চলতে পারে না।

প্রকৃতিকে কোনো কিছুরই অপচয় হয় না। কোনো প্রজাতির বর্জ্য অন্য প্রজাতির খাবার। শবদেহ থেকেও নতুন জীবন পুষ্ট হয়। সমস্ত কিছু চক্রাকারে মাটিতে ফিরে আসে আর সজীব গাছ–পাতার বৃদ্ধি ঘটে এবং পুষ্টিচক্র ও নবীকরণের ধারাটিকে অবিরাম সচল রাখে।

আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বর্গকিলোমিটার যত মানুষ বসবাস করে, এক শতাব্দী আগেও ভারতে সম পরিমাণ অঞ্চলে তার বেশি মানূষ বাস করত। কিন্তু যেখানেই ফসলের সমস্ত বর্জ্য, জৈব বর্জ্য, মানুষের (পশুরও) বর্জ্য মাটিতে ফিরিয়ে দেওয়া হত, সেখানেই মাটির উৎপাদিকা শক্তি সমান থাকত। অ্যালবার্ট হাওয়ার্ডের ভাষায়, ভারতের ৫,০০০০০ গ্রামের চারপাশের

জমি থেকে (তখনকার দিনে) উর্বর মাটির সঙ্গে গাছের স্বাস্থ্যকর সংযোগের প্রায় পাঁচ লক্ষ উদাহরণ পাওয়া গিয়েছিল।[৫]

চীনের ব্যাপারটাও ভেবে দেখুন। জৈব-বর্জ্য মাটিতে ফিরিয়ে দেওয়ার পরিশ্রমী ঐতিহ্য সে প্রাজ্ঞতার সাথে বজায় রেখেছে। (যদিও দুঃখজনকভাবে আরও বেশি বেশি মাত্রায় রাসায়নিক ব্যবহার করে মাটিকে ধ্বংস করে দেওয়ায় সে ভারতকে ছাপিয়ে গেছে)। উইনিন পেরেরা লিখেছেন যে ১৯৭৬ সালে চীনারা তাদের জমিতে ২০০০ মিলিয়ন টন জৈব সার প্রয়োগ করেছিল। তার মধ্যে আনুমানিক ৩৭% ছিল বলদ ও গরুর গোবর, ২৪% শুকরের মল, ১৯% মানুষের মল, ৮% সবুজসার, ৫% কম্পোস্ট সার ও ৭% নদী ও পুকুরের পলি। হাঁস-মুরগির মল, আগাছা ইত্যাদি উৎসগুলি এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি —— সেগুলিও প্রয়োগ করা হয়েছিল।[৬]

সারা পৃথিবী জুড়ে গৃহস্থবাড়ির চারপাশে ঘন গাছ-গাছালি সমৃদ্ধ বহুবিধ ফসলের চাষ (poly culture) প্রতি একর জমিতে সর্বোচ্চ ফলনশীল, কারণ এখানে জৈব বর্জ্য ও মনুষ্যশ্রম ব্যবহারের কার্যকারীতা সবচেয়ে বেশি। কেরালা —— যেটি হল ভারতের সবচেয়ে বেশি জনবহুল রাজ্যগুলির একটি —— সেখানে তাদের একটি ঐতিহ্যশালী গার্হস্থ্যবাগান —— যা গড়ে এক একরের কম —— সেটি উচ্চ-উৎপাদনশীলতার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এরকম একটি মোটামুটি আদর্শ খিড়কি-বাগান থেকে পাওয়া যেত শাক-সবজি, ফল, নারকেল, কন্দ, খাওয়ার গাছ-পাতা, ঔষধি, বিরুৎ, মশলা, প্রচুর জ্বালানি, গো-খাদ্য, সার ও আসবাবের কাঠ ... বস্তুত কৃচ্ছসাধন ব্যতিরেকে ভালো জীবন-যাপনের জন্য বুনিয়াদি প্রয়োজনের সমস্ত সামগ্রী।

তাই মিশ্রচাষ ও জমির উর্বরতা বজায় রাখা হল যে কোনো স্থায়ী কৃষির মৌলিক শর্তাবলী। বহুতল ফলন পদ্ধতিতে বৃক্ষ ও বহুবর্ষজীবীদের সংহত করে, সৌরশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে, জীব-ভর (bio-mass) পুনরুজ্জীবনের বৃদ্ধি ঘটিয়ে এবং ভূমিক্ষয় রোধ করে শুধুমাত্র মাটির উর্বরতা শক্তিকে রক্ষা করা যায় এমন নয়, বরং সেই উর্বরতাকে প্রাকৃতিক বনভূমির মতো বাড়িয়েও তোলা যায়।

ভাস্কর সাভে বলেন, সূর্যালোক, জল, জৈব সামগ্রী, ফসলের বৈচিত্র্য ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের বিরাট বদান্যতা, ভারতে সব কিছুই রয়েছে যা দিয়ে স্থায়ীভাবে সে তার জনসাধারণের পুষ্টির চাহিদার চেয়েও বেশি মেটাতে পারে —— যদি পুনরায় শুধুমাত্র সুসংহত মিশ্রচাষ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয় এবং সমস্ত জৈব বর্জ্য ধর্মীয় নিষ্ঠায় মাটিতে ফেরত দেওয়া হয়।''

বর্জ্যের অপচয়

ঠিক এখনই ভারতে বিপুল পরিমাণ জৈব পদার্থের — পুর নিগমগুলির (মিউনিসিপাল) বর্জ্য ও নর্দমার আবর্জনার (sewage) — শুধুমাত্র অপচয়ই হচ্ছে না, সেগুলি আবর্জনা ফেলার জায়গায় এত বেশি মাত্রায় নির্বিচারে খালাস করা হচ্ছে যে তা ভয়ংকর দূষণের সৃষ্টি করছে। শুধুমাত্র মুম্বই শহর (ভূতপূর্ব বোম্বাই) প্রতিদিন ৬০০০ টন বা ১৪০০ ট্রাক ভর্তি আবর্জনা সৃষ্টি করছে। এর অনেকটাই জৈব সামগ্রী — যার অর্থ হল খামারগুলির মাটি থেকে ক্রমাগত উর্বরতা নিকাশির একমুখী স্রোত বইছে। এই শহরের মিউনিসিপাল কর্পোরেশন আবর্জনা সংগ্রহ করে সেই আবর্জনা ফেলার জায়গাগুলিতে বয়ে নিয়ে ফেলতে প্রতিদিন বিপুল অর্থ ব্যয় করে। এই আবর্জনাস্থলগুলি শহরের বুকে পচা ক্ষতের মতো বিরাজ করে। দেওনার অঞ্চলে শহরে প্রধান আবর্জনাস্থলে বর্জ্য উপচে পড়ছে এবং এখন আবর্জনা ফেলার জন্য উপযুক্ত নতুন কোনো স্থান খুঁজেপাওয়া কঠিন।

ভাস্কর সাভে স্মরণ করছিলেন যে ১৯৬০–এর দশকের প্রথমদিক পর্যন্ত শহরের আবর্জনা রাতের ট্রেনগুলিতে বয়ে নিয়ে যাওয়া হত গ্রামাঞ্চলের মাটিতে ফেরত দেওয়ার জন্য। এখন মুম্বই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন প্রতিদিন বিপুল টাকা খরচ করলেও দেওনার ও অন্য আবর্জনাস্থলগুলি থেকে ভয়ংকর দুর্গন্ধ ছড়ানো ছাড়া যেন তাদের কিছুই দেখানোর নেই।

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে মাটিতে মেশে না এমন বস্তুর (non-biodegr-adable) (যেমন প্লাস্টিক, ফয়েল ইত্যাদি) বিপুল বৃদ্ধি ঘটেছে যেগুলি শহরের সমস্ত আবর্জনাকে দূষিত করে তুলেছে। এই আবর্জনাস্তূপগুলি শুধুমাত্র চোখের পক্ষে ভয়ংকর পীড়াদায়কই নয়, বরং এগুলি পরিবেশ ও অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের ভয়ংকর সমস্যা ডেকে আনছে। এগুলিতে যেহেতু প্রচুর জৈব পদার্থের সাথে মাটিতে মেশে না এমন সব পদার্থ ও বিষাক্ত পদার্থ মিশে থাকে, এগুলি মাটির উর্বরা শক্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহজে ব্যবহার করা যায় না।

বিরাট বিজ্ঞাপনের দ্বারা স্পনসর্ড বাণিজ্যিক টেলিভিশনের নানাবিধ চ্যানেল গ্রামের বাড়িগুলিকেও অবরোধ করছে। ভোক্তাসুলভ মানসিকতা আমাদের গ্রামাঞ্চলের গভীরে প্রবেশ করছে, বিশেষ করে কিশোর–কিশোরী ও যুবক–যুবতীদের মধ্যে, যাদের হাতে কিছুটা কাঁচা টাকা আছে। এর ফলে বিভিন্ন দ্রব্য যা মাটিতে মেশে না (non-biodegradable) তাদের ব্যবহারের বৃদ্ধি ঘটছে। প্রতিটি জায়গায় আমাদের জরুরি ভিত্তিতে সচেতনতা



“...he’s a compulsive buyer, thrives on additives and industrial waste, doesn’t need a home or a family, has no sense of aesthetics, and, in our high technology schools, gentlemen, we can churn him out by the thousands.”

এডওয়ার্ড গোল্ডস্মিথের দ্য গ্রেট ইউ টার্ন থেকে গৃহিত। রিচার্ড উইলসনের কার্টুন। নিচে লেখা — ‘এ হলো এক বাধ্য ক্রেতা, এ ... ও শিল্পের বর্জ্যে সমৃদ্ধ হয়, এর কোনো গৃহ্ বা পরিবারের দরকার হয় না, আমাদের উচ্চ প্রযুক্তির স্কুলগুলিতে ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা একে হাজার হাজার বার দুয়ে নিতে পারি।’

প্রসারে কাজ করা উচিত এবং আইন কড়া ভাবে বলবৎ করা উচিত যাতে প্লাস্টিক সহ সমস্ত রকমের বিষাক্ত পদার্থ আইন মেনে বর্জ্য ক্ষেত্রে ফেলা হয়। বাস্তবিক প্রতিনিয়ত যে বিপুল মাত্রায় এইসব বর্জ্য পদার্থ তৈরি হচ্ছে তা আমাদের বেপরোয়াভাবে কমানো উচিত। বিরাট আমেরিকান স্বপ্ন (Great American Dream) ও তাদের ঝলমলে 'নয়নের মণির মতো ভোগের সংস্কৃতি' থেকে নির্গত শিল্পজাত ও ভোগের বর্জ্য তারা নিজেদের দেশেই ধারণ করতে অক্ষম। অথচ ভারতে জনপ্রতি যত জমি আছে তাদের দেশে পরিমাণটা দশ গুণ, এই ব্যর্থতার কথা ভাবলে লাগামহীন শিল্পায়ন ও ভোগে সংযত হওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করা যায়, নিজেদের দেশে তৈরি বিষের সমস্যা যখন তারা নিজেদের দেশের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, তখন তারা তা সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে। এ ব্যাপারে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র কুখ্যাত।

ভারতে দ্রুত বৃদ্ধিশীল শহরে জনসংখ্যা — যারা ইতিমধ্যে ভোগের সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে — তাদের সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার থেকে বেশি। যদি ভারতীয় শহুরে নাগরিকের ভোগের মাত্রা গড়পড়তা আমেরিকান নাগরিকের ভোগের মাত্রার দশভাগের একভাগ হয়, তাতে আমাদের শহরগুলি শুধুমাত্র নরকের গহ্বরে পরিণত হবে না, তার ভোগের বিষাক্ত স্রোতধারা ছড়িয়ে গিয়ে গ্রামীণ পশ্চাদভূমির (rural hinterland) গভীরেও প্রবেশ করবে। বাস্তবিকই যদি সমস্ত পৃথিবী আমেরিকার ভোগবাদী জীবনশৈলী অনুকরণের কামনা করত — (যে জীবনশৈলী বুশ জুনিয়র ঘোষণা করেছেন যে কোনো মতে ছাড়া যাবে না) তাহলে সম্পদ ও বর্জ্যপাত্র — উভয়ের জন্য আমাদের অনেকগুলি পৃথিবীর দরকার হত। সুউচ্চে উড়ে বেড়ানো প্রযুক্তিবিদ ও কর্পোরেট-স্বপ্নদ্রষ্টারা কি এ ব্যাপারে মাটিতে নেমে আসতে পারে?

গার্হস্থ্য বর্জ্য মাটিতে ফেরত দেওয়া ও নগর-কৃষি

পুনে শহরে কাঞ্চনগলি নামে একটি আঁকাবাঁকা রাস্তা আছে, সেটি সামান্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে শহরের ইতিহাসের ভবিষ্যত মানচিত্র আঁকছে। এই পরিবেশের স্ব-সংগঠিত মহিলারা অঞ্চলে সৃষ্ট সমস্ত বর্জ্যকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বাছাই করে মাটিতে ফিরিয়ে দেবার পাকা ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তারা একটি সহজ পদ্ধতির ওপর জোর দেয়। পদ্ধতিটি হল উৎস থেকে জৈব-বর্জ্য (সাধারণত ভিজে) ও অজৈব বর্জ্য (সাধারণত শুকনো) আলাদা করে ফেলা। এজন্য তারা দুটি পৃথক পাত্র ব্যবহার করে। এতে পরে জৈব

থেকে অজৈব বর্জ্য আলাদা করার ঝঞ্ঝাট ও অতিরিক্ত শ্রমের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আর এতে মাটিতে জৈব বর্জ্য সম্পূর্ণভাবে ফেরত দেওয়ার কাজটা হয় অতি সহজেই।



কলকাতায় ডি আর সি এস সির বারান্দায় বাগান।

লতা শ্রীখণ্ডের মতো অনেক মহিলা সমতল ছাদে, ঝুল বারান্দায় অথবা বাড়ির লাগোয়া টুকরো জমিতে পাকশাল বাগান (kitchen garden) করতে শুরু করেছে। এখানে তারা রান্নাঘরের আবর্জনা যেমন তরকারির খোসা ইত্যাদি মাটির আচ্ছাদন (mulch) হিসাবে ব্যবহার করে, যা কেঁচো ও অণুজীবদের দ্বারা স্ব-ক্ষেত্রে (in situ) দ্রুত কম্পোস্ট সারে পরিণত হয় এবং জায়গাটিতে দুর্গন্ধের লেশমাত্র থাকে না। এইরকম পাকশাল বাগান থেকে তাজা জৈব বিরুৎ, শাকসবজি, ফল এবং এক স্নিগ্ধ সবুজ পরিবেশ পাওয়া যায়।

বাগান করার মতো এই নম্র সুন্দর অভ্যাস অস্থির নাগরিকসত্তার ওপর এক স্নিগ্ধ প্রভাব ফেলে। কিউবার হাভানা শহরে সবজি ও ফলের চাহিদার ৫০%-এর বেশি এইরকম বাগানগুলি থেকে জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত হয়। এর ফলে এই শহরে বেশ কয়েক বছর ধরে উচ্চরক্তচাপ ও হৃদ-রক্তবাহী নালীর রোগ উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রায় ৪৫%, কমে গেছে — যেখানে এইসব রোগ সারা পৃথিবী জুড়ে দিনে দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।[৭]

যেখানে খোলা আনুভূমিক জায়গার অভাব, যে কেউ সেখানে কোনো জায়গায় লম্ব পরিসরের (vertical space) যথাযথ ব্যবহার করতে পারে। পরিকল্পিতভাবে লতানো গাছের সবজি, যেমন লাউ, বীন, সীম লাগিয়ে তারা লাভবান হতে পারে। এগুলি দেওয়ালের গায়ে এমনকী মাত্র ৯ ইঞ্চি পুরু মাটিতে করা যেতে পারে, যেখানে সারা দিনে তারা কয়েক ঘন্টা রোদ পেতে পারে। এই মাত্রায় রোদ পেলে লতারা সুন্দরভাবে পল্লবিত হতে পারে। আমি একবার আমাদের মুম্বইয়ের বাড়িতে পাঁচ ইঞ্চি পুরু মাটিতে আধ ডজনের কম বীনের বীজ পুঁতেছিলাম। (প্রজাতি ছিল ডলিচোষ লাবাব বীন)। সেই লতা দেওয়াল বেয়ে চারতলা ছাড়িয়ে ছাদে উঠেছিল এবং বিশাল বাড়িটার দেওয়ালের প্রায় অর্ধেক অঞ্চল জুড়ে সবুজে ভরিয়ে তুলেছিল।

মুম্বইয়ে ডাঃ রমেশ দোশীর ফল ও সবজির বৈচিত্র্য ভরা উচ্চ–উৎপাদনশীল ছাদ বাগান[৮] বহু মানুষকে তাদের ছাদে অথবা ব্যালকনিতে কিচেন গার্ডেন তৈরিতে উৎসাহিত করেছে। এই বাগানে তারা সাধারণত জৈব পদ্ধতিতে ব্যবহৃত কয়েক ধরনের ভেষজ ও শাক–সবজি ফলিয়ে নেয়। অধ্যাপক শ্রীপাদ দাভোলকারের[৯] শিক্ষা, লেখা ও তাঁর প্রয়োগ–পরিবার (আক্ষরিকভাবে পরীক্ষকদের পরিবার) বহুসংখ্যক শহুরে বাগানকারীদের উপকৃত করেছে। অধ্যাপক দাভোলকারের natueco (natu প্রাকৃতিক ও eco বাস্তুতান্ত্রিক) নীতিসমূহের অনুসরণ করে প্রীতি পাতিল ও তাঁর সাথিরা মুম্বই পোর্ট ট্রাস্টের স্টাফ ক্যান্টিনের ছাদে একটি চমৎকার বাগান তৈরি করেছেন। এটি মুম্বইয়ে একদল উৎসাহী শহুরে চাষির বৃদ্ধিতে অনুঘটকের কাজ করেছে। বাঙ্গালোরে অনুরূপভাবে ডঃ বি এন বিশ্বনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙ্গালোর ও তার আশেপাশে ছাদ বাগান তৈরি করা এক শক্তিশালী আন্দোলন হিসাবে গড়ে উঠেছে।[১০]

জৈব উর্বরতার উৎস হিসাবে একটা শহর উদ্যোগী শহুরে মালীদের (gardener) কাছে তুলে ধরে বিপুল সম্ভাবনা। ২০০৬ সালে কিউবার হাবানা শহর সৃষ্টি করেছিল ৩০ লক্ষ টন খাদ্য। রান্নাঘরের আবর্জনা দিয়ে তৈরি ভার্মি–কম্পোস্টিং অর্থাৎ কেঁচো সার পারিবারিকভাবে যথেষ্ট সহজেই তৈরি করা যায়, যদি কয়েকটি বুনিয়াদি নিয়ম ঠিক ঠিক ভাবে মানা হয়। এতে বেশি জায়গাও লাগে না। ৪/৫ জন সদস্যযুক্ত একটি পরিবারের রান্নাঘরে রান্না না করা বর্জ্য পদার্থ দিয়ে ১/২ বর্গমিটার ছায়া যুক্ত মাটিকে সুন্দর, সমৃদ্ধ পাতা পচা সারে রূপান্তরিত করা যায়। (১৬৬ পৃষ্ঠায় দেখুন শহুরে জৈব–বর্জ্য (bio-waste) দ্বারা সৃষ্ট কেঁচো সার। এছাড়া ১৬৯ পৃষ্ঠায় দেখুন ছোটো শহুরে বাগানে কেঁচো সার ও কিচেন গার্ডেনের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে

এবং সেখানে বাগানের অতিরিক্ত টবের জন্য কম্পোস্ট সার উৎপাদনের আর কোনো প্রয়োজন নেই।)

রাত্রির বর্জ্য (Night-soil)

শহুরে বর্জ্য পদার্থের অপচয় সম্বন্ধে একজন সুপরিচিত বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে আমরা হয়তো পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের পরেও টিকে যাব, কিন্তু ক্রমাগত ফ্ল্যাশ টয়লেটের[১১] প্রসারের ফলে আমরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারব না। মাটিতে গৃহীত পুষ্টি খাদ্যের মধ্য দিয়ে যা শরীরে প্রবেশ করে তা শরীর থেকে নিষ্কাশিত হবার পর বেশি মাত্রায় জলের প্রভাবে ধুয়ে গিয়ে নদীতে সাগরে পড়ে মাটির উর্বরাশক্তিকে বৃদ্ধি করার বদলে সেই জলধারাকে দূষিত করে।[১২]

ভাস্কর সাভে মানুষের মলকে মনে করেন সোন–খেত বা সোনালী মনুষ্য সার। আবার মানুষের মূত্র অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সহ আরও বেশি মূল্যবান বলে মনে হয়। এই বিরাট জনবহুল দেশের এই জমিতে প্রতিটি ব্যক্তিই হল ২৪ ঘন্টা জুড়ে এক একটি ক্ষুদ্র প্রাথমিক কম্পোস্ট–সার তৈরির কারখানা। কিন্তু আমাদের আধুনিক যোজনাকারীরা প্রকৃতির দ্বারা বিনা পয়সায় দেওয়া এই বিরাট সম্ভাবনাময় সম্পদকে কোনো গুরুত্ব দিতে চায় বলে মনে হয় না। অথচ এই সম্পদ আমরা অতীতে হাজার হাজার বছর ধরে ব্যবহার করে এসেছি।

প্রায় এক শতাব্দী আগে এফ এইচ কিং তাঁর ‘চল্লিশ শতাব্দীর কৃষকরা’ (Farmers of Forty Centuries) নামক স্মরণীয় গ্রন্থে চীন, কোরিয়া ও জাপানে ঐতিহ্যগতভাবে অনুসৃত স্থায়ী (Permanent) কৃষি সম্বন্ধে লিখেছেন। মনুষ্য বর্জ্যের (human waste) অর্থনৈতিক মূল্য সম্পর্কে একটি আগ্রহ উদ্দীপক তথ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন, “১৯০৮ সালে সাংহাই শহরের আন্তর্জাতিক ছাড় (International Concession of the City of Sanghai) বছরের প্রতিদিন ভোরে বেসরকারি বাড়ি ও সরকারি আবাসগুলিতে প্রবেশ করে মল (night-soil) সংগ্রহ করার অধিকার বিক্রি করেছিল একজন ঠিকাদারকে। ৭৮,০০০ টন মলের বিনিময়ে সংস্থাটি ঠিকাদারের কাছে পেয়েছিল ৩১,০০০ ডলার মূল্যের সোনা।[১৩]”

নর্দমার বর্জ্য পুনঃচক্রাকারে ব্যবহার করার প্রাচীন ব্যবস্থাপনার আর একটি উদাহরণ হল — (যা এখনও চলছে) পূর্ব–কলকাতার জলাভূমি, যেখানে মানুষের বর্জ্য কম্পোস্ট আকারে ও নর্দমার বর্জ্য–জল কম্পোস্ট ও জৈবসার হিসাবে চাষের জমিতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে শহরের

বাজারে বিক্রি হওয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ সবজি ফলানো হয়। অবশ্য সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই নর্দমার বর্জ্যের সঙ্গে মাটিতে মেশে না এমন বর্জ্য (non-biodegradable waste) অথবা বিষাক্ত দ্রব্যাদি মিশে বড়ো রকমের সমস্যা সৃষ্টি করছে।

নগর পরিকল্পনার প্রতিটি ক্ষেত্রে এটা দেখা অত্যন্ত জরুরি, যাতে মানুষের মল ও নর্দমার বর্জ্যতে প্রাপ্ত উপাদানে মাটির মূল্যবান উর্বরাশক্তিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা যায় এবং পুনঃচক্রাকারে প্রবাহিত করা যায়। এবং এক্ষেত্রে তা করার সমস্যা নেই। কিন্তু সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে বিস্তৃতভাবে জড়িয়ে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয় সদিচ্ছার অভাব দেখা যায়।

গোবর (Cattle Dung)

ভারতে আজও বিপুল গো–ধন বা গো–সম্পদ রয়েছে। এই সম্পদকে যদি মাটির ধারণ–ক্ষমতার মধ্যে সুবিবেচকের মতো ব্যবহার করা যায়, তাহলে উপকারি জীবাণুতে (beneficial microbes) পরিপূর্ণ গোবর, পশুদের চোনা মাটির জৈব জীবনের পুনরুদ্ধারে সমৃদ্ধ সম্পদ হিসাবে কাজ করতে পারে। অবশ্য গবাদি পশুদের চরে খাওয়াকে সযত্নে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে নতুন রোপিত গাছপালা ও কৃষকের খাদ্য ফসলের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়।

যদিও ভারতীয় কৃষিতে গোবর সার বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু খামারে এর যোগান ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এর মুখ্য কারণ হল গবাদি পশুর সংখ্যা কমছে, যার আবার প্রধান কারণ হল পশুখাদ্য আর অত সহজে পাওয়া যায় না।

ঐতিহ্যগতভাবে সবচেয়ে সাধারণ গো–খাদ্য হল বিভিন্ন দানাশস্য ও ডালের খড়ের অবশিষ্টাংশ। কিন্তু 'সবুজ বিপ্লবের' দ্বারা বিভিন্ন বামন প্রজাতিগুলির বেশি প্রসারের ফলে ফসল থেকে প্রাপ্ত খড়ের উৎপাদন ভীষণভাবে কমে গেছে। এই বিদেশি বামন প্রজাতির চাল, গম, জোয়ারগুলি দেশি প্রজাতিগুলির থেকে লম্বায় তিনভাগের একভাগ।

পাঞ্জাবের মতো জায়গায় ধান ও গম থেকে পাওয়া খড়ের অনেকটাই পুড়িয়ে ফেলা হয় এই ভাবনায় যে তাতে নাকি মাটিতে জীবাণুর বৃদ্ধিকে আটকানো যায়। কিন্তু খড়ে কীটনাশক জমে থাকার ফলে পশুখাদ্যকে বিষাক্ত হয়ে যাওয়ার হাত থেকে মুক্ত করতে হয়তো এটি করা হয়। পাঞ্জাবের মতো জায়গায় গবাদি পশুকে বিরাটভাবে প্রতিস্থাপিত করেছে ট্রাক্টর।[১৪]

এখন বড়ো শহরগুলির বাইরে শহরতলীতে বহু সংখ্যক দুগ্ধ খামারের

উপস্থিতির ফলে বেশ একটা বড়ো মাত্রার দানাখণ্ড (grain straw) ও আগাছা ঘাস (weed grass) শহরস্থিত গবাদি পশুগুলির খাবারের জন্য গ্রাম থেকে পাঠানো হয়। এই গবাদি পশুগুলির গোবর (মাটির স্বাস্থ্য ফেরানোর বদলে) শহরে দূষণ ছড়ায়। ভাস্কর সাভে দুঃখপ্রকাশ করে বলেছিলেন, ভারতীয় রেল গ্রাম থেকে শহরে খড় পাঠানোর ক্ষেত্রে যে মাশুল নেয়, তা শহর থেকে গ্রামে গোবর ফেরত পাঠানোর মাশুলের চেয়ে কম, যদিও পরেরটির (গোবর) পরিবহণে কম আয়তন প্রয়োজন হয়। অবশ্য ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারত সরকার নেদারল্যান্ড থেকে বিষাক্ত রাসায়নিকে ভরা গোবর আমদানি করার যে অনুমোদন দিয়েছিল, তার মধ্যে যে এক চরম পরিহাস লুকিয়ে আছে তা আমাদের সরকার দেখতেই পায়নি!

ফসলের অবশেষ ও সবুজ সার

ফসলের অবশিষ্ট খড় ও তুলোর দণ্ড (cotton stalks) কাগজ ও বোর্ড উৎপাদনের কাজে লাগে এবং তা থেকে জ্বালানি গুল (briquettes) তৈরি হয়, যা শহরাঞ্চলে বিক্রি হয়। অন্যান্য অনেক কৃষিজ বর্জ্য, যেমন নারকেলের খোলা, চিনেবাদামের খোলা, পাট কাঠি, ভুট্টার বর্জ্য ইত্যাদি জিনিসগুলিকে শহরে শিল্প অর্থনীতির অতৃপ্ত খিদে মেটাতে জ্বালানির সম্ভাব্য উৎস বলে দেখা হয়। ধানের কুঁড়ো ইটভাটাগুলিতে সরাসরি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার ইট তৈরি হয় ধান জমির উর্বর উপরিভাগের মাটি (top soil) দিয়ে এবং তাতে ধানের কুঁড়োও মেশানো হয় যাতে মাটি ও ইট আটোসাটো হয়।

এক শতাব্দী আগে ভারতীয় কৃষি সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে ডঃ জন ভোয়েলকার লিখেছিলেন যে এদেশ থেকে ব্রিটেনে রপ্তানি করা বিপুল মাত্রায় ভক্ষণযোগ্য তৈলবীজ ও তেল বের করে নেবার পর খোল রপ্তানি ছিল কার্যত ভারতের "মাটির উর্বরতার রপ্তানি"।[১৫] স্বাধীনতার পরের দশকগুলিতে অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে।

তেল নিষ্কাশনের মিলগুলিতে ভারত সরকার যবে থেকে ভরতুকি দেওয়া শুরু করেছে, গ্রামাঞ্চলে হাজার হাজার দেশজ তেল নিষ্কাশনের ক্ষুদ্র সব ঘানিগুলি ব্যবসায় হটে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে গ্রামীণ রোজগার ও স্বনির্ভরতা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আরও ক্ষতি হয়েছে মূল্যবান খোলের (তেল নিষ্কাশনের পর যে শক্ত ছিবড়ে পড়ে থাকে) — যেগুলি আগে খামারে ফিরে আসত সরাসরি অথবা গরুকে খাওয়ানোর পর তাদের গোবর হিসাবে। আজকের দিনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত তেলকলগুলি চাষিদের এই

খোল ফেরত দেয় না, বরং রেখে দেয় ভাল দামে বিক্রি করবে বলে।

এক বিরাট পরিমাণ খোল পাশ্চাত্যে রপ্তানি করা হয় গবাদি পশুগুলিকে খাইয়ে পুষ্ট করে মাংস-শিল্পের বড়ো বড়ো কসাইখানাতে জবাই করার



খামারের গবাদি পশু প্রসঙ্গে

গ্রামীণ ভারতে গবাদি পশু দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ কাজ করে। তাদের উন্নত মূল্যের (গোবর) সার ও চোনা ছাড়াও তারা পরিবহণ, জল তোলা ও হালকা কর্ষণে পশু-শক্তির যোগান দেয়। এর ফলে খামারের সাথে তাদের অঙ্গীভূত করে রাখা একটি আকর্ষণীয় ব্যাপার — এমনকী যদি দুধ নাও খাওয়া হয় — যেমন কিছু আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যেত — অন্তত অতীতে।

অবশ্য গবাদি পশুর সংখ্যা খামারের জমির ধারণ ক্ষমতার মধ্যে থাকাই বাঞ্ছনীয়। ফসলের অবশেষ থেকে খড়, বুনো ঘাসপাতা, গোখাদ্য, উদ্ভিদ ও গাছের পাতা — ইত্যাদি গোখাদ্য হিসাবে খাওয়ানো যেতে পারে। কিন্তু মুক্ত বিচরণ বন্ধ করা বা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কারণ তা না করলে গবাদি পশুদের পায়ের খুরের চাপে মাটি শক্ত হয়ে যাওয়া ছাড়া মরসুমি মাঠ-ফসল ও খামারের গাছের চারার ক্ষতি হতে পারে।

ভাস্কর সাভে বললেন, ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী সময়ের আগেই গরুদের কসাইখানায় না পাঠিয়ে বুড়ো গরুদেরও খাওয়ানো ও দেখভাল করা হত, যতক্ষণ না তারা বয়সের ভারে প্রাকৃতিকভাবেই মারা যেত। গরুরা কৃষকের এই বদান্যতার প্রতিদান দিত মূল্যবান গোবর ও গোমূত্র ফিরিয়ে দিয়ে।

জন্য। উদাহরণ স্বরূপ ভারতে ৪৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সোয়াবিনের চাষ হয় এবং বেশিরভাগ সোয়া-খাদ্য তেল বের করে নেওয়ার পর রপ্তানি করা হয়। তৈলবীজের উৎস থেকে যে খোল পাওয়া যায় তা থেকে ১৯৯২-৯৩ সালে

রপ্তানি করা হয়েছিল ৩৪০ কোটি কেজি, ভাবা যায়! [১৬]

পাশ্চাত্যে মাংস-শিল্প শক্তি-কর্মক্ষমতায় (energy-efficiency) অত্যন্ত পশ্চাদপদ। প্রতি কিলোগ্রাম মাংস প্রস্তুত করতে এই শিল্পের প্রয়োজন হয় বহু কিলোগ্রাম দানা শস্য, খোল ও অন্যান্য খাদ্য ভারত ইত্যাদি বাইরের দেশ থেকে রপ্তানি হয়ে আসে। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে একদিকে সৃষ্টি হয় স্থূলত্ব (obesity) ও স্বাস্থ্য সমস্যাবলী ও অন্যদিকে খিদে ও পুষ্টির অভাব এবং উভয়দিকেই তা ডেকে আনে পরিবেশের ক্ষতি ও আবহাওয়ার বদল।

ভারত সরকার ধান ভানার কলগুলিতে — সে বড়োই হোক বা ছোটো — লাইসেন্স প্রথা চালু করেছে। এই কলগুলির মধ্যে বড়ো ও দূরবর্তী কলগুলি স্থানিক ছোটো কলগুলিকে প্রতিযোগিতায় ছিটকে দিয়েছে। গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে ঢেঁকি ছাঁটা চাল আজ অতীতের ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। এর ফলে ধান কুঁড়ো — যা ধানকলগুলি বিক্রির জন্য রেখে দেয় — তা আর মাটিতে ফেরত আসে না। আর বড়ো কলগুলির যন্ত্র দ্বারা ছাঁটা চালে অতিরিক্ত পালিশের কারণে খাদ্যগুণের অভাব ঘটে।

ভাস্কর সাভে বলছিলেন, পুরোনো অর্থনীতিতে শস্যের অবশেষ কতরকম-ভাবে ব্যবহৃত হয়ে শেষে তাদের মাটিতে ফিরিয়ে নেওয়া হত। কিন্তু আজকের দিনে সরকারি ঋণ পাওয়া বৃহদায়তন আখ চাষে দেখা যায়, ফসলের অবশেষের বিন্দুমাত্র মাঠে ফিরে আসছে না। (বিশাল সর্দার সরোবর বাঁধের কমান্ড অঞ্চলে অন্তত দশটি বিশাল চিনি কারখানার লাইসেন্স অনুমোদন করা হয়েছে)।

আখের খোসা ও ছিবড়ে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে চিনি কারখানাগুলির বয়লারগুলিকে চালানো হয়। বেশ কিছু পরিমাণ বর্জ্য তন্তু কাগজ উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়। তার অবশিষ্ট গাদ (Slurry) অ্যালকোহলের পাতন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। এগুলির কোনো কিছুই পুনরায় চাষের খেতে ফেরত দেওয়া হয় না। আর চাষিও কোনোভাবেই লাভবান হয় না। ভাস্করভাই জিজ্ঞাসা করছিলেন, "কুড়ি বছর পরে এই আখ চাষের কী হবে?" তিনি নিজেই উত্তর দিলেন, "জমি দিনে দিনে বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে এবং অকৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আগে যা ছিল সমৃদ্ধ কৃষিক্ষেত্র, নগর শিল্পের বৃদ্ধি আজ তাকে গিলে নিচ্ছে।"

আবার এখন অর্থনৈতিক সংস্কারকে গতি দিতে — কৃষিজমি (সে অধঃপতিত জমি হোক আর না হোক) শিল্পেও নগরায়নে ব্যবহার করার জন্য আইনি বাধা দূর করতে কিছু রাজ্য নতুন আইন প্রণয়নের কথা ভাবছে। কেন্দ্রীয় সরকারও কৃষিজমিতে বেশ কিছু বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের(SEZ

বা স্পেশাল ইকনমিক জোন) ছাড়পত্র দিয়েছে।

ফসলের অবশেষ ছাড়াও চাষের খেতে জৈববস্তু দেওয়ার জন্য চিরায়ত উৎসগুলি ছিল অরণ্য ও সাধারণের তৃণভূমি (Common grassland) । জঙ্গলের গাছ–পাতা থেকে পাওয়া সবুজ সার সরাসরি খেতে ব্যবহার করা হত। আবার অরণ্য ও গোচরণভূমির গাছ–পাতাও গবাদি পশু খাওয়ার ফলে তা গোবর হিসাবে চাষজমির উর্বরতা ফিরিয়ে দিত। কিন্তু বনভূমির নিধন বা পরিবেষ্টন (enclosure) ও সাধারণের গোচারণ ভূমির (common grazing land) অবনমনের (degradation) ফলে গোখাদ্য ও সবুজসারের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে।

জৈবসার ও জমিতে প্রাকৃতিক কম্পোস্ট সার

জৈবসার (পশু–পাখির বর্জ্য...) হল বহু শত যৌগের জটিল মিশ্রণ। এগুলির মধ্যে ৩০–৪০টি মৌল রয়েছে যেগুলি পুষ্টি ও অণু–পুষ্টি (micro-nutrient) আকারে গাছেদের প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের সার, যেমন গোবর, ছাগল ও মুরগির মল ইত্যাদি মৌলিক উপাদানগুলি উন্মুক্ত হয়ে গাছেদের কাছে পৌঁছায় মাটিতে বাস করা বিভিন্ন জীব ও অণুজীবদের পাচন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। এইসব মাটির জীব ও অণুজীব বেশি খাবার পেলে সংখ্যায়ও বেশি বাড়ে। সেই অনুসারে তাদের মাটিকে কনডিশনিং বা প্রস্তুত করার কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে মাটিতে ভেদ্যতা (Porosity), বায়ু চলাচলের ক্ষমতা (aeration) এবং জল বা জলীয় বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতাও (moisture-holding capacity) বৃদ্ধি পায়।

একটি প্রাকৃতিক বনভূমি বা বাগিচা খামারে সমস্ত জৈব বস্তু (পাতা, ডালপালা ইত্যাদি) যেগুলি শুকনো হয়ে মাটিতে পড়ে — সেসব কিছুই পাখি ও জীবজন্তুর মল সহ মাটিতে একীভূত হয়ে প্রাকৃতিক খেতে (on site) কম্পোস্ট সারে পরিণত হয়। যেহেতু বিভিন্ন জৈব বস্তুর কঠোরতা (hardiness) ভিন্ন, তাই পচতেও বিভিন্ন সময় লাগে। মাটির অবস্থা ও তাতে উপস্থিত জৈব উপাদানগুলির তুলনামূলক পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে পরম্পরাগতভাবে (successively) যেমন যেমন প্রয়োজন সেরকম অণুজীবগুলি দেখা যায়। জৈব পদার্থগুলি থেকে পুষ্টিগুলি ধীরে ধীরে নির্গত হয় আর তাই দীর্ঘ সময় জুড়ে সুষম মাত্রায় পাওয়া যায়।[১৭]

মাটির ব্যাক্টেরিয়া তাদের খাদ্যের জোগানকে যখন খেয়ে শেষ করে ফেলে, তারা বিশাল সংখ্যায় মারা যেতে পারে অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। মাটির জৈব প্রক্রিয়াগুলি মন্দীভূত হয় যতক্ষণ না উদ্ভিদ বা প্রাণীর

উৎস থেকে মাটি আবার খাদ্যের যোগান পায় ... এবং এইভাবে জৈব মাটি একটি স্ব-পরিচালিত ব্যবস্থা — যেন এক সংগঠিত সম্প্রদায় খাদ্যের জোগান অনুযায়ী তার অসংখ্য জীবদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে, যতক্ষণ না বহিরাগত শক্তির দ্বারা তারা বিব্রত না হয়।

ফুকুওকা মহাশয়ের মতো ভাস্কর সাভেও ফসলের অবশেষ ও অন্যান্য জৈব বর্জ্য থেকে আলাদাভাবে কম্পোস্ট সার তৈরি করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন যে বেশিরভাগ খামারের পরিস্থিতিতেই খামারের জৈব-পদার্থকে সেখানেই (in-situ) প্রাকৃতিকভাবে কম্পোস্টে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটির ওপর নির্ভর করাই কাম্য। কিন্তু যদি কম্পোস্ট অন্য জায়গায় তৈরি করা হয় এবং তারপর জমিতে স্থানান্তরিত করা হয়, তাহলে মাটির কোটি কোটি অণুজীব ও কেঁচোর অনেক গুটিও মারা যেতে পারে। তাই যতটা সম্ভব এটিকে এড়িয়ে যেতে হবে।

খেতে (in-situ) প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় কম্পোস্ট সার তৈরি হয় অত্যন্ত সহজ ও কার্যকরভাবে, বিশেষ করে যে গাছেরা বড়ো হয়ে উঠেছে তাদের সার সরবরাহের জন্য। অবশ্য অপ্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে — যেমন শহরে কংক্রিটের জঙ্গলে অথবা যেখানে মাটি বিষাক্ত রাসায়নিকের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছে — সেখানে কম্পোস্ট সার বানানোর জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা বাধ্যতামূলক হতে পারে।

প্রাকৃতিক কেঁচো সার

মানুষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এমন মাঠ-ঘাট ও জঙ্গলে প্রাকৃতিক ভাবেই কেঁচোর উপস্থিতি দেখা যায়। কেঁচোদের রক্ষা ও পুনরুৎপাদিত করতে যা দরকার তা হল মাটির ওপরে ঘন ডালপালা ও শুকনো পাতার আচ্ছাদন এবং মাটিতে একটা স্যাঁতসেঁতে (damp) ভাব। খেতে কেঁচো সার তৈরি হয় প্রাকৃতিক ভাবেই এবং এর জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত কোনো আলাদা জায়গার দরকার পড়ে না এবং সেখানে কেঁচো সার প্রস্তুত হবার পর তা গাছেদের ব্যবহারের জন্য খেতে স্থানান্তরিত করার কোনো প্রয়োজন হয় না।

শ্রী মোহন দেশপাণ্ডে একজন জৈবচাষি। তিনি বলেন, [১৯] এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানিক ও মুক্ত কেঁচো যে সার তৈরি করে আশপাশের নির্দিষ্ট গাছেদের সরবরাহ করে তা বিশেষত সেই গাছেদের জন্য প্রস্তুত এবং গ্রহণকারী গাছেদের পক্ষে সেই সার বিশেষভাবে উপযুক্ত। বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে যদি ধরা যায় সবেদা গাছের নিচে কেঁচোরা সবেদা গাছের পাতার আবর্জনা খেয়ে বেড়ে উঠে গাছের গোড়ায়



প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় ঝাড়ুদাররা

“সমস্ত জীবিত বস্তুই এক সীমাহীন খাদ্যশৃঙ্খলে অঙ্গীভূত হয়ে আছে ,.. “সবাই কোনো কিছু খেয়ে বেঁচে থাকে এবং অন্য কারোর দ্বারা ভুক্ত (fed) হয়। প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র তাই একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল অসংখ্য জীবগুলির মধ্যে এক অবিশ্বাস্য জটিল শৃঙ্খলাবদ্ধ বিন্যাস — – যেখানে কেউ বাকিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারে না, কেউ শুধুমাত্র মরেই শেষ হয়ে যায় না।’’

অণুজীবদের ধন্যবাদ, যে তারা প্রাণী ও উদ্ভিদের —– সকলের অবশেষকে খেয়ে ফেলে এবং ভূতলকে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর রাখে। যদি জন্তুরা মারা যাওয়ার পর তাদের শবদেহ না পচেই (decompose) থেকে যেত, তাহলে শীঘ্রই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অসহ্য হয়ে উঠত। জনসাধারণ অণুজীবদের এই কর্মকাণ্ড গুরুত্ব দিয়ে দেখে না। কিন্তু এই বিশ্বে এর থেকে কোনো বৃহত্তর নাটক আর নেই। সর্বাপেক্ষা অগ্রসর বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানার নকশাগুলি (designs) প্রকৃতিতে উর্বরাশক্তির

পুনর্চক্রাকরণের (recycling) অসীম বিস্তৃত প্রক্রিয়াগুলির তুলনায় যেন শিশুর খেলা ... কারখানার অ্যাসেম্বলি লাইনে যেভাবে কাজগুলি (assembly-line-operations) চালান হয়, তেমনি অসংখ্য জীবও ক্রমাগত পুনর্চক্রাকরণের জন্য জৈব পদার্থগুলিকে ভাঙে (dismantle,) সংশ্লেষিত উপাদানগুলিকে বিশ্লিষ্ট করে (decompose), পচায় (rot) এবং গাঁজলায় (ferment)। একটি শবকে সম্পূর্ণভাবে মাটিতে ফিরিয়ে দিতে কোটি কোটি অণুজীব একের পর এক পালা করে আবির্ভূত হয় এবং কোনো মানুষ অথবা পশুর শেষকৃত্য সম্পন্ন করে।

জৈব বর্জ্যকে ভাঙার প্রশ্নে (অন্তত গ্রামাঞ্চলে) অণুজীবীয় (microbial) ও উৎসেচকীয় (`enzymatic`) পদ্ধতিগুলি নিয়ে তিলকে তাল করার কোনো অর্থ হয় না। উপকারি অণুজীবদের পৃথক (isolating) করে 'গাঁজিয়ে তোলার সহায়ক' কিছু দিয়ে জৈব বর্জ্যের ভিতরে ভাইরাস অনুপ্রবেশ করানোর (অর্থাৎ টীকাদান বা inoculation) সমস্যাকে ডেকে আনার কোনো প্রয়োজন নেই। যেটা সাধারণত দরকার সেটা হল মুরগি খামার থেকে এক মুঠো মুরগির মল অথবা একতাল গোবর জৈব বর্জ্যের ওপর ফেলে তার সাথে কিছুটা মাটি ঢেলে খড় বা শুকনো পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা। এর ফলে আপনা–আপনিই প্রাকৃতিক ও ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু বদল দেখা যাবে ...

"মানুষের পক্ষে প্রকৃতিকে বদলে দেবার এই আবেগটিকে সংযত করতে হবে। তার উচিত একটু থমকে দাঁড়িয়ে ভাবা যে এই প্রচেষ্টাগুলির কি কোনো প্রয়োজন আছে বা থাকলেও তা কতটা বাঞ্ছনীয়। যদি কোনো এক ধরনের (Type) অণুজীবের বৃদ্ধি ঘটে কিছুটা বেশি, সেটাই সমস্ত কিছুর সাম্যকে ভেঙে দিতে পারে ..."। সৌভাগ্যজনকভাবে প্রকৃতিতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতি একসাথে বাস করে এবং নিজ নিজ যেমন প্রয়োজন তেমনি নিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পায়। খুব বেশি বাড়ে না আবার তাদের খুব অভাবও ঘটে না —— এই স্ব–পরিচালন ব্যবস্থা কীভাবে ক্রিয়াশীল থাকে তা বিশাল এক রহস্য!"

—— মাসানুকু ফুকুওকা
কৃষির প্রাকৃতিক পথ (The Way of
Natural Farming) থেকে গৃহীত[১৮]

যে মল (সার) নির্গত করে তার পুষ্টি দিয়ে গাছটি সালোকসংশ্লেষে নতুন পাতা তৈরি করে। দেশজ, স্থানীয় কেঁচোরা দীর্ঘ সময় জুড়ে স্থানীয় পরিস্থিতির সাথে আরও ভালোভাবে খাপ খাওয়ানোয় অভ্যস্ত হয়। বিদেশি/বিজাতীয় পরিবেশে বাস্তুতন্ত্রে সার তৈরি অন্য এক ইতিহাস নিয়ে নতুন এক আবদ্ধ (captive) প্রমিত (standardised) পরিবেশে বিদেশি পোকাদের প্রজননে এইসব সুস্পষ্ট সুবিধাগুলি পাওয়া সম্ভব নয়।

দেশপাণ্ডে আরও বলেন, "একটি বড়ো গাছের নিচের মাটি নানান অণুজীব — ব্যাক্টেরিয়া, কেঁচো এবং বিভিন্ন পোকাদের গুটি ইত্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধ। একটি খামারের প্রতি একরে প্রায় ১০ কেজি করে এইরকম মাটি যদি ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে মুক্ত এই জীবগুলির 'শুরুর জনসংখ্যা' (`starter population`) দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে মাটিকে সমৃদ্ধ করে তুলবে। এটি অঙ্গার যা মাটিতে মহাজাগতিক শক্তির (cosmic energy) পুনরুজ্জী–বনের বীজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।''

এরপর যেটা দরকার সেটা হল মাটির জীবদের (কেঁচো, ব্যাকটেরিয়া ...) পছন্দসই পরিবেশে (অর্থাৎ ছায়াযুক্ত, আর্দ্র, বায়ু চলাচলের উপযুক্ত) খাদ্যের যোগান দেওয়া। স্বভাবত তারা বর্জ্যগুলি যে উপাদানে সৃষ্ট, সেইসব উপাদানে ভেঙে ফেলে। জৈব পদার্থকে কম্পোস্ট সারে পরিণত করতে এর



বট গাছ তার ঝুলন্ত মূলেরা।

থেকে অন্য কোনো জটিল প্রক্রিয়ার সত্যিকারের কোনো প্রয়োজন নেই। কল্পবৃক্ষে, যেখানকার মাটি ইতিমধ্যেই বিশাল সংখ্যক কেঁচোয় সমৃদ্ধ, সেখানে ভাস্কর সাভে তাঁর পরিণত ফলের গাছগুলির জন্য সেচ খাদের (irrigation trenches) ধার বরাবর বিভিন্ন জায়গায় খামারে প্রাপ্ত জৈব বর্জ্য স্রেফ স্তূপীকৃত করে রাখেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, "যখন এইরকম কোনো জৈব পদার্থ জ্যান্ত মাটির সংস্পর্শে আসে, তৎক্ষণাৎ একগুচ্ছ অণুজীব ও মাটিতে বাস করা ক্ষুদ্র জীবরা জড়ো হয়। শীঘ্রই সেখানে বহুসংখ্যক কেঁচোও জড়ো হয়। তারা খাবার গ্রহণ করার পর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সমস্ত মাটি জুড়ে পুষ্টি সমৃদ্ধ মল ছড়িয়ে দেয়। তা করতে গিয়ে তারা এই মাটিতে বেড়ে ওঠা অতি সূক্ষ্ম মূলতন্তুকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে ধীরে ধীরে কর্ষণ করে।"

অমৃত পানি ও পঞ্চগব্য

কিছুটা অঙ্গারা বা সমৃদ্ধ সজীব মাটি (যাতে কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপকারি অণুজীব রয়েছে) খামারের মাটিতে ছড়িয়ে দেবার পর অমৃত পানি (বা 'মধুজল') ছিটিয়ে অণুজীব ও কেঁচোদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করা যায়। অমৃত পানি হল এক দেশজ পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা জল যা মাটির জীবরা আনন্দের সাথে গ্রহণ করে।

সুভাষ শর্মার রেসিপি বা প্রণালী সহজেই অনুসরণ করা যায়। প্রণালীটি এই রকম : একটি ২০০ লিটার ড্রামে দেশি গরুর ৪০–৫০ কেজি তাজা গোবর ভরুন। এরপর ৪–৫ লিটার দেশি গোমূত্র ও ২০০ গ্রাম কালো চিটে গুড় (black molasses) ঢালুন। এবার ড্রামে জল ভরুন এমনভাবে যাতে ড্রামের ওপরের দিকে ২–৩ ইঞ্চি ফাঁক থাকে। ড্রামের ভিতরে উপাদানগুলিকে ১০ দিন ধরে গাঁজলাতে (ferment) দিন। প্রতিদিন ভিতরের মিশ্রণটিকে লাঠি জাতীয় কিছু দিয়ে বেশ ভালো করে নাড়াতে হবে কিছুক্ষণ। তারপর ১০ দিন পর, দুই সারি ফসলের মাঝে এই মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহার করার আগেও মিশ্রণটিকে ভালভাবে নেড়ে নিতে হবে।[২০]

দীপক সাচদে, প্রীতি পাটিল ও অন্যান্যদের দ্বারা প্রসারিত ন্যাচুইকো (natueco) পদ্ধতি অনুযায়ী অমৃতজল প্রস্তুত প্রণালীও বেশ সহজ। ১ কিলো তাজা গোবর, ১ লিটার গোমূত্র ও ৫০ গ্রাম জৈব কালো চিটে গুড় (organic black jaggery) মেশান। এই দ্রবণটি ৩ দিন ধরে গাঁজলান এবং দিনে ২–৩ বার নাড়ান। প্রতি সময়েই ঘড়ির কাঁটার দিকে ১২ বার এবং ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ১২ বার নাড়ান। চতুর্থ দিনে এই ঘন

দ্রবণ বিপুল সংখ্যক উপকারি জীবাণুতে ভরে যাবে যা মাঠে দেওয়া যায়। তবে তা দেবার আগে এই দ্রবণ দশগুণ জল ঢেলে লঘু করে নিতে হবে।[২১]

মোহন দেশপাণ্ডে তার প্রণালীটি তৈরী করেছেন প্রাচীন ঋষি পরাশরের লেখা নির্দেশ অনুযায়ী। এটি কিছুটা বিস্তৃত ও খরচ সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে ১৫ কেজি তাজা গোবর ও গোমূত্র ২০০ লিটার জলে গুলে তাতে ১ কেজি গরুর ঘি বা গলানো মাখন, আধ কিলো মধু (চিটে গুড়ের বদলে) মেশানো হয়। যাতে মাটির জীবেরা চমৎকার এক খাবারের লোভে দলে দলে জড়ো হয়ে খায় আর বংশ বিস্তার করে।[২২] দেশপাণ্ডে বীজকে শোধন করার জন্য অঙ্গারা ও অমৃত পানি —— এই দুটিই ব্যবহারের সুপারিশ করেছেন।

দেশপাণ্ডে জৈব গোখাদ্যে পুষ্ট স্বাস্থ্যবান দেশি গরুর মূত্র ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, "এইরকম মূত্রের সাথে আধুনিক চাষির জার্সি গরুর মূত্রের তুলনা করুন। চারদিন ধরে দু-ধরনের মূত্র ভিন্ন বোতলে রেখে লক্ষ্য করুন। স্বাস্থ্যবান দেশি গরুর মূত্রে দৃশ্যত কোনো পরিবর্তন দেখা যাবে না। কিন্তু জার্সি গরুর মূত্রকে বহু ভাসমান কণা সহ একটি কুৎসিত-দর্শন তরল বলে মনে হবে।" দেশপাণ্ডে আরও বলেন, "রপ্তানি বাজারে দেশি গোমূত্রের চাহিদা দিনে দিনে বাড়ছে। যা দিয়ে কমটী (Comtea) প্রস্তুত করা হয়। পরিহাসের বিষয় হল যে এই দ্রব্যটি আবার এদেশে আমদানি করা হয় বেশি দামে দিয়ে!"

ভারতের বহু জায়গায় বিশেষত দক্ষিণে কৃষকরা পঞ্চগব্য বানানোর জন্য তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের দেশজ প্রণালী অনুসরণ করে। গোবর, গোমূত্র, ঘোল এবং ঘি (যা মাখনকে গরম করে পাওয়া যায়) ইত্যাদির মিশ্রণ থেকে তারা পঞ্চগব্য তৈরি করে। কিছু কৃষক এগুলির সাথে নিম, করঞ্জ, রুই ইত্যাদি গাছের পাতা —— যা স্থানীয় অঞ্চলে পাওয়া যায় —— মিশিয়ে থাকে। ভাস্কর সাভে একটি বিশেষ ফর্মূলার পরামর্শ দেন যেটি মারীপোকার সম্ভাব্য বিস্তারে বাধা দেয়। ফর্মূলাটি ১৯৭ পৃষ্ঠায় পঞ্চগব্য : ভাস্কর সাভের রেসিপি ——এই শিরোনামে আলোচিত হয়েছে।

একথা আরও অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে জমিতে (in-situ) মাটির জৈবজীবনকে পুনরুৎপাদিত করার জন্য অমৃত পানি বা পঞ্চগব্য ব্যবহারের ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে মাটিতে স্থানীয় আবহাওয়া (micro-climate) সৃষ্টির শর্তাবলী বা অবস্থা মাটির জীবদের পক্ষে কতটা অনুকূল তার ওপর। মাটি যদি বহুস্তরের ঘন গাছ-পালার ছায়ায় ঢাকা থাকে, মাটির ওপরে যদি থাকে ঘাস-পাতার ঘন আস্তরণ (mulch,) মাটিতে যদি থাকে

শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদ (leguminous plants) ও সবুজ সার — তাহলে এসমস্ত কিছু সুবিধাজনক পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি করতে সাহায্য করে।

কখন জৈব সার ব্যবহার করতে হবে

স্বল্পমেয়াদি মাঠ–ফসলের জন্য গোবর, আবর্জনা ইত্যাদি তাজা জৈব বর্জ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে কখন এগুলি ব্যবহার করা উচিত। জৈব বর্জ্য পচন বা আদি উপাদানগুলিতে বিশ্লিষ্ট (decompose) হওয়ার প্রক্রিয়ায় অণুজীবগুলি গাঁজলানোর (ferment) ফলে মাটির তাপমাত্রা এমনকী ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছাড়িয়ে যেতে পারে। এতে ফসল জ্বলে যেতে পারে। তাই তাজা, ভিজে গোবরের গাঁজলানোর প্রক্রিয়া কিছুটা কমে এলে, তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে এলে ১০–১৫ দিন পর তা রোপিত গাছের গোড়ায় দিতে হবে। অন্যথায় তা চারা পোঁতার ২–৩ সপ্তাহ আগে মাটিতে দেওয়া যেতে পারে।

আবার এটাও মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে মাটিতে, বিশেষত যে মাটিতে ভালো জল নিকাশ হয় না — সেখানে জৈবসার ও বর্জ্য দিতে হবে বর্ষা তীব্রতায় পৌঁছানোর অন্তত ৪৫ দিন আগে। এতে ভূতল জলে সম্পৃক্ত হওয়ার আগেই মাটির জীবেরা আবির্ভূত হয়ে জৈবসার বা বর্জ্যের জৈব–পদার্থগুলিকে পচিয়ে তাদের উপাদানগুলিতে ভেঙে ফেলার কাজটা সম্পন্ন করার সময় ও সুযোগ পাবে। কিন্তু মাটি যদি খুব শুকনো থাকে সেক্ষেত্রে শুকনো বর্জ্যের পচনে গতি আনবার জন্য কিছুটা জল দেবার দরকার হয়।

বিভিন্ন জৈব–বর্জ্য ও তাদের উর্বরতাশক্তির তুলনামূলক গুণাবলী

বিভিন্ন ধরনের জৈবসার ও বর্জ্য পদার্থগুলি তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উপযোগী। গরুর গোবর উপকারি জীবাণুতে পরিপূর্ণ এবং তাই তা ভালো মাটি প্রস্তুতকারক (soil conditioner). গোবর ‘মাটি–কে’ শরীরে (body) বাড়ায় এবং মাটিতে বায়ু চলাচলের (aeration) উন্নতি ঘটায়। এটি ভারতে সবচেয়ে সাধারণভাবে ব্যবহৃত সার। আর মাটির জীবদের বিশেষ পছন্দের। অবশ্য গোবরে তুলনামূলকভাবে নাইট্রোজেনের অভাব আছে। নাইট্রোজেন আবার গবাদি পশুদের মূত্রে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। নাইট্রোজেন জোগান দেওয়া ছাড়াও গোমূত্রের অন্যান্য মূল্যবান গুণ রয়েছে যেগুলি মারীপোকা ও অপকারি জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি রোধ করে।

পাখিদের আলাদাভাবে কোনো শক্ত (solid) রেচন বস্তু বা মূত্র হয় না।

তারা রেচক হিসাবে একটা আঠালো চট্‌চটে পদার্থ ত্যাগ করে। মুরগি ও হাঁসের এই রকম বর্জ্যসার সমৃদ্ধ। সেগুলিতে অন্যান্য অনেক পুষ্টি আছে যা গোবরে নেই। কিন্তু এরা গোবরের মতো মাটির শরীর বৃদ্ধি করতে পারে না এবং মাটিতে বায়ু চলাচল ও জলধারণ ক্ষমতারও বৃদ্ধি করতে পারে না।

বিভিন্ন ধরনের জৈব বর্জ্যে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ থাকে বিভিন্ন ঘনত্বে। শুকনো কার্বন-পূর্ণ বর্জ্য যাতে প্রচুর রয়েছে (যেমন খড়, পাতা) — এদের মধ্যে নাইট্রোজেনের অভাব থাকলেও এরা মাটির ভৌত অবস্থার উন্নতি ঘটায়। তাই মাটিতে বিভিন্ন ধরনের জৈব জিনিস যেমন পাতা, রান্নাঘরের আবর্জনা ইত্যাদি ঢালা যায়।

বিভিন্ন জৈবসার থেকে জৈববস্তুরা বিভিন্ন হারে নির্গত হয়। উদাহরণ স্বরূপ ভাস্কর সাভে বলেন, দিভেলি খোল (দিভেলা বা পিষ্ট রেড়ির বীজের আঁশযুক্ত অবশেষ) এবং মুরগি ও অন্যান্য পাখিদের মল, তাদের পুষ্টিগুলি বেশ দ্রুত নির্গত করে। ফলে স্বল্পমেয়াদি ফসল যেমন শাকসবজি, দানাশস্যের ক্ষেত্রে এগুলি ব্যবহারে আগ্রাধিকার দেওয়া হয়। নিম খোল ব্যবহার করলে পুষ্টি নির্গমন হয় ধীরে। কিন্তু নিম খোল মারীপোকা ও ক্ষতিকারক জীবাণুগুলির প্রসার নিয়ন্ত্রণে রাখে। বাস্তব অনুশীলনে কোন জৈব বস্তু জোগান দেওয়া হবে তা কত দ্রুত পাওয়া যায় সেটাই নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। অবশ্য যদি মুরগির মলের মতো অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সার প্রয়োগ করা হয়, তাহলে অতি দ্রুত ও অতি বেশি মাত্রায় নাইট্রোজেন জোগান দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে গাছের অপ্রাকৃতিক বৃদ্ধি ঘটতে পারে, ফলে পাতার (ফলনের নয়) অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হতে পারে, যা আবার মারীপোকাদের আকৃষ্ট করতে পারে।

প্রকৃতি প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন ও অন্যান্য পুষ্টির জোগান দেয়

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে বিভিন্ন ডাল ফসলের শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদের (leguminous plants) মূলের গোটে (nodules) বসবাসকারী রাইজোবিয়ার মতো বিশেষ ধরনের জীবাণুদের কার্যকলাপে বাতাসের নাইট্রোজেন মাটিতে এসে মেশে, গাছ থেকে ঝোলা শুট দেখলেই শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদদের চিনতে পারা যায়। এদের মূলে বাল্বের মতো গোট বা নোডিউল থাকে যেগুলি টিপলে একটি বাদামি হলুদ রস বের হয়। মাটিতে হামা দিয়ে চলা উদ্ভিদ ও দেওয়াল বা গাছ-গাছালির ওপর বেয়ে ওঠা উদ্ভিদদের (creepers and climbers) মধ্যে ত্রিপত্র (তিনটি করে পাতা একসাথে থাকে) বিশিষ্ট

প্রজাতিগুলি হল শুঁটি জাতীয়। বীনের বিভিন্ন প্রজাতিগুলি এই ধরনের উদ্ভিদ।

কোনো শুঁটি গাছের বীজ অংকুরিত হলে মাটিতে অসংখ্য জীবাণুর আবির্ভাব ঘটে। এগুলি পরে কেঁচোর মতো আরও জটিল জীবের আগমনের ক্ষেত্র তৈরি করে। একারণেই দেশজ শুঁটি গাছ পুঁতলে তা অবনমিত জমিকে (degraded land) দ্রুত পুনরুজ্জীবিত হতে সাহায্য করে।

বিভিন্ন ধরনের বীন বা ডালের মতো নাইট্রোজেন সরবরাহকারী শুঁটি–ফসল ঐতিহ্যগতভাবে শাকসবজির মতো নাইট্রোজেন ভোক্তা (consumer) ফসলের সাথে রোপণ করা হয়। অথবা বর্ষায় ধান চাষের পর বর্ষা পরবর্তী আবর্তন (rotation) ফসল হিসাবে তাদের রোপণ করা হয়।

কয়েক ধরনের ফার্ন, কয়েক ধরনের অ্যালগি (উদাহরণ স্বরূপ 'নীল–সবুজ অ্যালগি) এবং অ্যাজোটোব্যাক্টার, ক্লসট্রিডিয়ামের মতো মুক্তভাবে বসবাসকারী ব্যাক্টেরিয়ারা রাইজোবিয়ার মতো মাটিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধ (fixation) করার ন্যায় কাজ করে থাকে। তাজা জৈব বস্তু থেকে বিশ্লিষ্টকারী (decomposer) ব্যাক্টেরিয়ার প্রভাবে যে নাইট্রোজেন নির্গত হয়, তাছাড়াও এই ঘটনা ঘটে। বিদ্যুৎ ও বৃষ্টির দ্বারাও বাতাস থেকে নাইট্রোজেন ধুয়ে গিয়ে মাটিতে মেশে। এইভাবে প্রতি বছরে প্রতি হেক্টরে মাটি প্রায় ১০ কেজি নাইট্রোজেন পায়। যদিও অঞ্চলে অঞ্চলে এর তারতম্য ঘটে। তাই মাটিতে নাইট্রোজেনের জোগান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রকৃতি যথেষ্ট সুবিবেচকের মতো কাজ করে।

উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও কণা মৌলগুলি (trace elements) হিউমাস বা উদ্ভিজ্জসার তৈরির প্রক্রিয়ায় মাটির উপরিভাগে (top-soil) প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। মাটির নিচের অংশেও (sub soil) বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মাটির নিচের স্তরে বিভিন্ন ধরনের পাথরের দীর্ঘদিন ধরে ক্ষয়ের ফলে এগুলি পাওয়া যায়। মূলের শীর্ষগুলি থেকে কার্বনিক অ্যাসিড নিঃসৃত হওয়ার ফলে পাথরের ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়। বাতাসের ভাসমান জলকণা চুঁইয়ে মাটিতে প্রবেশ করার ফলে খনিজগুলি দ্রবীভূত হয়ে একটি মাটির দ্রবণে পরিবর্তিত হয়। মাটির গভীরে প্রবেশ করা মূলেরা এর পর বিরাট দৈত্যাকার পাম্পের মতো কাজ করে এগুলিকে মাটির ওপরে ভূতলে নিয়ে আসে।

কল্পবৃক্ষে জৈব বস্তুর জোগান

যে বিপুল পরিমাণ জীবভর (biomass) বিক্রিত খাবার হিসাবে কল্পবৃক্ষ

থেকে বেরিয়ে যায়, তার তুলনায় অতীতে যে জৈব বস্তুর জোগান দেওয়া হয়েছিল তা অতি অল্প। (এখন এটি শূন্যের কাছাকাছি) উদাহরণ স্বরূপ পূর্বে প্রতি বছর নিকটবর্তী উমেরগ্রাম টাউন থেকে ৫০ গাড়ি (গরুর) বা আনুমানিক তিন টন মিউনিসিপ্যাল বর্জ্য এনে কল্পবৃক্ষে ফেলা হত। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে আবর্জনায় অবাছাই প্লাস্টিক উপাদান বেড়ে যাওয়ায় প্রায় দু–বছর আগে শহর থেকে এই জৈব বস্তুর জোগান দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

এছাড়া ১৯৭০–এর দশকের শুরুতে/মাঝামাঝি নাগাদ প্রতি এক বছর অন্তর প্রতিবেশী এক গ্রামের মুরগি খামার থেকে পোলট্রি সার নিয়ে আসা হত। নিকটবর্তী একটি আয়ুর্বেদিক কারখানা থেকেও (যেখানে গাছ–গাছালি থেকে ঔষধ বানানো হত) জৈব বর্জ্যও সহজে পাওয়া যেত, ১৯৮০–র দশকের শেষ দিকে পর্যন্ত। এই হার্বাল বর্জ্য (সাধারণত সুগন্ধীযুক্ত) তখন বিনা পয়সায় পাওয়া যেত এবং কারখানার মালিকরা তাদের আবর্জনা পরিস্কার হচ্ছে ভেবে খুশি হত। এখন ভাস্করভাইয়ের কাছে শিখে অন্য চাষিরা এই বর্জ্য চাওয়ায় বাজারে এর বেশ দাম হয়েছে।

অতীতে বাইরে থেকে দেওয়া এই জোগান ছাড়াও খামার থেকে পাওয়া জৈব বর্জ্য, যেমন মানুষের মল, পায়খানার সাথে যুক্ত বায়ো–গ্যাস প্লান্টের গাদ (slurry) ইত্যাদি চক্রাকারে খামারের মাটিতে পড়ে। খামারে দুটো গরু,



খামারের পায়খানার (ডানদিকে) পেছনে বায়ো–গ্যাস প্ল্যান্ট (বাঁদিকে) এই বায়ো–গ্যাস প্ল্যান্টে মানুষ ও পশু উভয়ের বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।

একটা বলদ ও দুটো বাছুরের গোবরের অনেকটা অংশ থেকে রান্নার জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদন করা হয়। এরপর পুষ্টিতে সমৃদ্ধ গাদ খামারে ব্যবহার করা হয় —— যা কেঁচোরা তৃপ্তি করে খায়।

এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে কল্পবৃক্ষ থেকে প্রতিবছর বেশ একটা বড়ো পরিমাণে ফল ও কয়েক হাজার নারকেল চারা বিক্রি হওয়া সত্ত্বেও এই বাগিচায় উচ্চমাত্রায় জীবভর তৈরি হয় —— যেমন তৈরি হয় একটি প্রাকৃতিক অরণ্যে। এর ফলে খামারে মাটির উৎপাদনশীলতা ফিরিয়ে আনতে তা নিশ্চিতভাবে সাহায্য করে।

আচ্ছাদন

উমেরগ্রামে সাংভি খামার গড়ে উঠেছে ভাস্কর সাভের নির্দেশনায় ও তাঁর ছোটো ছেলে সুরেশের তত্ত্বাবধানে। সেখানে স্থানীয় এক ছোটো ডেয়ারি মালিক আগাছা ও ঘাস কেটে গরুর গাড়ি করে বয়ে নিয়ে যেত। পাঁচ গাড়ি ঘাস কেটে নিয়ে গেলে বিনিময়ে সে এক গাড়ি গোবর ফেরত দিত। এই গোবর, গাছ পোঁতার জন্য নতুন কাটা গর্তে আর কিছুটা মাঠ–ফসলের জন্য ব্যবহার করা হত।

এই বিনিময়ের ফলে যদিও যথেষ্ট শ্রম বাঁচিয়ে ঘনীভূত উর্বরতার ব্যবস্থা করা যেত, তবুও এটি সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকিহীন ছিল না। কারণ যথেচ্ছভাবে আগাছা ও ঘাস কাটার সময় খেয়াল রাখতে হয় যে প্রয়োজনীয় গাছও নির্বিচারে কাটা পড়তে পারে। একটি সুবিধাজনক স্থানীয় আবহাওয়া (micro-climate) তৈরি করা গাছের স্বাস্থ্যের এক প্রয়োজনীয় শর্ত। সেই প্রেক্ষিতে আগাছা ও ঘাস–পাতা —— জীবিত বা কাটা —— আচ্ছাদন হিসাবে মাটিকে অনেকটা এলাকা জুড়ে ঢেকে রাখতে পারে এবং এদের সম ওজনের গোবর যতটা এলাকার মাটিকে সুরক্ষা দিতে পারে তার থেকে বেশি এলাকার মাটিকে এরা সুরক্ষা দিতে পারে।

যেখানে বর্ষায় কল্পবৃক্ষে বিভিন্ন আগাছা ও ঘাস এত বেশি বাড়ে যে ঘন গাছ–পাতায় পথঘাট ঢেকে যায় এবং তাদের ভিতর দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় না। কখনও আবার খাদগুলিও (trenches) ঘন গাছ–পাতায় ঢেকে যায়। এইরকম আগাছাদের প্রয়োজন অনুসারে বছরে এক/দুই বার কেটে মাটিতে আচ্ছাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভাস্কর ভাইয়ের বড়ো ছেলে নরেশের দ্বারা প্রতিপালিত একটু কম উর্বর সোনালি খামারে শুখা মাসগুলিতে যখন মাটিকে ঢেকে রাখার জন্য গাছ–পাতার অভাব দেখা দেয়, আচ্ছাদনের কাজটির বেশি প্রয়োজন হয়। তখন



প্রকৃতি কখনই কোন মাটিকে উলঙ্গ রাখে না!

ছোটো গাছগুলির (ছায়ার) ছাতার (canopy) বাইরে থাকা আগাছাদের ছাঁটা হয় এবং সেগুলি দিয়ে গাছের মূল কাণ্ডের কয়েক ইঞ্চি দূর থেকে সরাসরি ছাতার নিচের মাটির ওপরে অন্তত ২–৩ ইঞ্চি পুরু আচ্ছাদন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। এর ফলে অতিরিক্ত ছায়ায় গাছের মূলগুলি এবং মূল অঞ্চলে (root zone) বসবাসকারী মাটির জীবরা আলো ও তাপ থেকে সুরক্ষিত হয়। এই আচ্ছাদন পরবর্তীকালে মাটির জীবদের পাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়ে মাটিতে মিশে গাছের পুষ্টিতে রূপান্তরিত হয়।

তাই এইভাবে মাটির জীব ও অণুজীবদের জন্য একটা চমৎকার পরিবেশের সৃষ্টি করে আচ্ছাদন। মাটি অণু–জীবদের প্রচুর খাবারের জোগান দেয় যাতে তারা বিকশিত হয়ে সংখ্যায় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। এই জীবরা মাটি খনন করে এবং সুড়ঙ্গ তৈরি করে যার ফলে মাটির ভেদ্যতা (Porosity) বৃদ্ধি পায়। এটি ঘটে সক্রিয় মূল অঞ্চলের ডগার দিকে, যেখানে ভেদ্যতার প্রয়োজন বেশি। এর ফলে মাটি আর্দ্রতা শোষণ করতে পারে ভালো ভাবে আর সেকারণেই বর্ষায় ভারী বর্ষণের পর অতিরিক্ত জল নিকাশিও হতে পারে সহজভাবে। এতে মাটিতে বায়ু চলাচলও (aeration) হয় খুব ভালো —— যা গাছের মূল ও মাটির জীবদের —— উভয়েরই ভীষণভাবে প্রয়োজন। শুখা মাসগুলিতে সমস্ত আচ্ছাদিত অঞ্চলের মাটি ভালোভাবে ঢেকে থাকার জন্য সেখানে বাষ্পীভবনের কারণে জলের ক্ষয়ও হয় কম। ফলে সেচের

প্রয়োজনীয়তাও কমে যায় অনেকাংশে।

মাটির স্তরীকরণ বা মিশ্রণ

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত কল্পবৃক্ষ খামারের ঠিক বাইরের এক পুকুর থেকে পলি তুলে গরুর গাড়ি করে খামারে নিয়ে আসা হোত। এই পলি আসলে আশপাশের জমির উপরিবিভাগের (top soil) উর্বর মাটি যা বর্ষায় বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়ে পুকুরে পড়ে।

ফেব্রুয়ারি মাসে যেই পুকুরটা শুকোতে শুরু করত, তখনই এই পলি বা পাঁক সংগ্রহের কাজ শুরু হত। যখন খামারের কাজের লোকদের মধ্যে এক জোড়া একটু ফাঁকা থাকত, তখনই তারা গরুর গাড়িতে পাঁক তুলে আনার কাজ করত। এইভাবে কল্পবৃক্ষের মাটিতে বছরে প্রায় ১০–১২ টন পাক জড়ো করা হত। মাটির পক্ষে এই পলি বা পাঁক খুব উপযোগী আর এর খরচও (প্রধানত শ্রমিকের খরচ) ন্যূনতম। পাঁক তোলার ফলে পুকুরও নাব্যতা পেত, তার জলধারণ ক্ষমতাও বাড়ত এবং প্রতিবেশী গ্রামবাসীদের সুবিধা হত।

ঐতিহ্যগত কৃষিতে পুকুর, জলাশয়ের নিচ থেকে এবং শুকিয়ে যাওয়া ঝরনা ও নদীখাত থেকে পলি তুলে এনে ব্যবহার করাকে খুব দাম দেওয়া হত। ভারতীয় কৃষির ওপর রিপোর্ট ১৮৯৩ — শীর্ষক প্রতিবেদনে ভোয়েলকার বলেছেন, "দেখা গেছে যখনই পলি পাওয়া যেত, রায়ত (চাষি) তখন সাধারণ সারকে মূল্যই দিত না, অথবা তা সংরক্ষণে কোনো ঝক্কি নিত না। ... বারবার সার দিয়ে যে ফল পাওয়া যেত না, একবার পলি দিলেই তা পাওয়া যেত, কারণ পলিতে বেশি সার থাকে (খনিজ পুষ্টি)।"[২৩]

দূর্ভাগ্যজনকভাবে রাসায়নিক চাষের প্রসারের সাথে সাথে পলির এই বিরাট মূল্য সম্পর্কে বোধ হারিয়ে গেছে। অসংখ্য জলাধার, পুকুর, পাঁকে ভরে গেছে। এমনকী তাদের জল ধারণ ক্ষমতা ফুরিয়ে গেলেও স্থানীয় জনসাধারণের ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মজে যাওয়া পুকুর, জলাশয়কে পাঁক মুক্ত করতে কোনো মাথা ব্যথাই নেই।

ভাস্কর সাভে বলেন, "সম পরিমাণ সারের বদলে মাটি ও পলি নিয়ে আসায় অর্ধেক খরচে দ্বিগুণ সুবিধা পাওয়া যায়।" তিনি আরও বলেন যে খামারের আদি মাটির সাথে গাড়িতে বয়ে আনা মাটি মেশালে মাটিতে একটি নতুন স্তরের সৃষ্টি হয় যাতে বেশি বাতাস চলাচল করে, যা মাটির জৈব–জীবনের পুনরুজ্জীবনের সহায়ক। মাটির এই সীমারেখা অঞ্চলে (যেখানে নতুন মাটি ফেলা হয়) মাটির দু–ধরনের বাস্তুতন্ত্রের সুফল পাওয়া যায়।

উদ্ভিদের জন্য খনিজ মৌলগুলিরও জোগান পাওয়া যায়।

যে খামারে ধান ছাড়া অন্যান্য ফসল ফলে, সেখানকার মাটি যদি খুব চটচটে কাদায় ভরা হয়, তাহলে যেখানে মাটিতে জলনিকাশ হয় খুব ভালো সেখানকার কিছুটা মাটি এই কাদা মাটিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ পাহাড়–পর্বতের পাদদেশের মাটি অথবা বন্ধ্যা পতিত জমির মাটির নিচের স্তর থেকে মোরাম নিয়েও সেখানে ঢালা যেতে পারে। এতে মাটিতে বায়ু চলাচল ভালো হয় এবং গাছের মূলগুলি ও কেঁচো সহ মাটির অন্যান্য জীবরা পর্যাপ্ত অক্সিজেন পেয়ে উপকৃত হয়।

অন্যদিকে যে মাটিতে জল নিকাশের মাত্রা খুব বেশি সেখানকার মাটির জলধারণ ক্ষমতা খুব কম। ফলে সেই মাটিতে কাদা বা পলির জোগান দিলে তার জলধারণ ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ ভাস্করভাইয়ের ছেলেদের তত্ত্বাবধানে সাংভি খামারে ও সোনালি খামারে যখন চাষবাস শুরু করা হল, তখন সেখানকার মাটি ছিল অত্যন্ত জলনিকাশি। একারণে সেখানে বৃক্ষ রোপণের সময় গর্তের নিচের স্তরে পুকুরের পাঁক–মাটি দেওয়া হয়েছিল। এতে গাছে বার বার জল দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কমে গিয়েছিল।

কোনো জলাশয়ের নিচে পাঁকের উপরিস্তর জলের ভিতর দিয়ে ফিল্টার হওয়া সূর্যালোক পায় আর তাই সেই মাটির উর্বরতা বেশি। এই মাটি জৈব–জীবনকে আরও ভালো ভাবে লালন করতে পারে। আর এই মাটিতে শেষ পর্যন্ত জলাশয়ের সমস্ত উদ্ভিদ ও জীবের রেচন পদার্থ ও মৃতদেহ জমা হয়।

মলিসন তাঁর ''টেক্সট বুক অফ ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার' নামক বইয়ে লিখেছেন, ''ধানের খেত থেকে গরুর গাড়িতে কাদা বয়ে নিয়ে এসে প্রায়শই বালি জমিতে ফেলা হয় দুই ইঞ্চি পুরু করে যাতে আখ ও অন্যান্য সেচ দেওয়া বাগান–ফসলের জন্য মাটি উপযোগী হয়ে ওঠে।''[২৪]

ভোয়েলকার মাটি মেশানোর অন্য এক উদাহরণ দিয়েছেন, তিনি বলেন, ''সারা মাদ্রাজ জুড়ে ও কোয়েম্বাটরে আমি দেখেছি মাটি মেশানো চলছে — একরকম হালকা লাল মাটি ভারী ও কালো মাটির সঙ্গে মেশানো হচ্ছে।''[২৫] (ইতিমধ্যেই বেড়ে ওঠা বৃক্ষ–ফসলের ক্ষেত্রে এই নতুন স্তরের মাটি আরও যথোপযুক্ত। বয়ে আনা মাটি কোনো রকম কর্ষণ না করেই মা–মাটির ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়।)

ভাস্কর সাভে যখন প্রথম উদ্যান কৃষি শুরু করলেন, বর্ষায় নিচু ধানজমিতে জল জমে থাকা এড়াতে জমিকে উঁচু করার দরকার বোধ হল। তখনই তিনি বাইরে থেকে মাটি নিয়ে এসে ফেলার কথা ভাবলেন। তিনি ঠিক করলেন যে খেপে খেপে বছরে এক বা দুই একর জমির মাটি

উঁচু করবেন। এর জন্য তিনি খামারের পাশে ইতিমধ্যেই বিদ্যমান এক গ্রাম–সমাজের পুকুর খনন করলেন এবং তার নাব্যতা বাড়ালেন নিজের খরচে। অবশ্য এর অনেক পরে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে শুধুমাত্র ভালো নিকাশি মাটির সুবিধার থেকেও এতে তিনি অনেক বেশি উপকৃত হয়েছেন।

সাভে তাই পরামর্শ দেন যে হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন যে কোনো মাটি —— শুধুমাত্র যে মাটি রাসায়নিক দ্বারা দূষিত হয়নি —— এমন মাটি মা–মাটির ওপর ছড়িয়ে দিলেই লাভ পাওয়া যাবে। এতে মাটির উর্বরতা শক্তি ও ভৌত অবস্থার উন্নতি হবে। অবশ্য যেন তেন প্রকারেণ বা স্বার্থপরতার সাথে তা করা যাবে না, যে এলাকার মাটিতে ইতিমধ্যেই গাছের বৃদ্ধি হয় উল্লেখযোগ্যভাবে, সেখানকার মাটির ক্ষতি করে তা করা যাবে না। পূর্বে আশপাশের অঞ্চলে —— সেখানকার অকর্ষিত জমি থেকে উর্বর উপরিতলের মাটি (top soil) বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়ে নাবাল জমিতে জড়ো হত। এইভাবে বৃষ্টি বিধৌত পলি নাবাল কৃষিজমিতে উর্বরতা ফিরিয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর তা হয় কোনো মনুষ্য শ্রম ছাড়াই। (বর্ষা মন্থর হয়ে এলে বা চলে গেলে বনভূমি তার মাটিতে বৃষ্টির জমা জল ধীরে ধীরে ছেড়ে দিত।) নদী–বদ্বীপগুলিতে জমির উর্বরতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল প্রতি বছরে উজান বেয়ে নদীর জলে বয়ে আসা জমির উপরিতলের মাটি (top-soil).

চমকে ওঠার মতো ভূমিক্ষয়ের মূল্য

বর্তমানে ভারতে বর্ষা তীব্র হলে নদীগুলি ফুঁসে ওঠে। তখন অনেক নদীর জলের রঙ হয় ঘন বাদামি বা লাল। এই রঙ তারা পায় নদীর উচ্চ–উপত্যকা অঞ্চলে বৃষ্টির তোড়ে বিপুল পরিমাণ উপরিতলের মাটি ধুয়ে বয়ে আসার কারণে। এই ক্ষয়ে যাওয়া মাটি সমুদ্রে গিয়ে মেশে, যেখান থেকে তা আর কোনোদিন ফিরিয়ে আনার উপায় থাকে না। এই ধুয়ে যাওয়া মাটির এক সামান্য অংশ বদ্বীপগুলিতে জমা হয়। আর যতটা মাটি নদীখাতে জমা হয় তা নদীখাতের জলধারণ ক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে ভারী বর্ষণের সময় সেই জল উপচে বাঁধ ছাপিয়ে বন্যা পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তোলে।

ইতিমধ্যেই কয়েক দশক আগে ভারতের ষষ্ঠ যোজনায় এই মন্তব্য নথিভুক্ত হয়েছে যে বৃষ্টি ও বাতাসের দ্বারা ১৫০ মিলিয়ন হেক্টর (১ কোটি ৫০ লক্ষ হেক্টর) জমি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[২৬] বর্তমান পরিমাণ সম্ভবত ২ কোটি হেক্টরের কাছাকাছি হবে।[২৭]

দি গায়া এটলাস অব প্লানেট ম্যানেজমেন্ট[২৮] ১৯৮৪ সালে হিসাব কষে দেখেছে যে সমগ্র এশিয়া প্রতি বছর ২৫ বিলিয়ন টন (২৫ শত কোটি)

উপরিতলের মাটি হারাচ্ছে। কাছেই আমাদেরই ঘরে দি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ জানিয়েছে যে মহারাষ্ট্র রাজ্যে ৭০%-এর বেশি জমি ভূমিক্ষয়ের দ্বারা বিভিন্ন মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তার মধ্যে ৩২% জমি এত বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে সেখানে আর কৃষিকাজ করা যায় না।[২৯]

বৃক্ষহীন অরক্ষিত ঢালু জমিতে বিশেষত কঙ্কন অঞ্চলের মতো বেশি বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে এক বর্ষাতেই প্রতি হেক্টর জমিতে ১০০ টন মাটি ক্ষয়ে যেতে পারে। ঢালু জমিতে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ত্বরণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষয়ে যাওয়া মাটি দুরন্ত ভরবেগে ঢালে গড়িয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে গতিবেগ নিছক দ্বিগুণ হলেই স্থানচ্যুত মাটি কণাগুলির ৬৪ গুণ মাটি (কণা) নিচে গড়িয়ে পড়তে পারে এবং জলের প্লাবনে বয়ে যেতে পারে।[৩০]

আইসিএআর-এর দ্য ন্যাশনাল ব্যুরো অফ সয়েল সার্ভে-র দুইজন ডিরেক্টর ডাঃ মূর্তি ও ডঃ হিরেকেরুর (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) দুঃখ করে বলেছিলেন যে, "যদি এই হারে ক্ষয় চলতে দেওয়া হয়, তাহলে এমন হতে'ই পারে যে ভবিষ্যতে মাটি এবং জলের সংরক্ষণ ও নির্বাহের (management) বদলে মাটি পুনরুদ্ধারের কাজই হয়ে দাঁড়াবে একমাত্র কাজ।[৩১]

ভারতের ভূতপূর্ব জলসম্পদ মন্ত্রী বি বি ভোরার মতে ১৯৮৫[৩২] সালে এদেশে শুধুমাত্র জলপ্রবাহের ফলে ক্ষয়ে যাওয়া মাটির পরিমাণ ছিল বছরে ১২,০০০ মিলিয়ন টন। বর্তমানে মাত্রাটা সম্ভবত ১৫,০০০ মিলিয়ন টন ছড়িয়ে গেছে। নিছক একটা ধারণা পাওয়ার জন্য যদি ১ কেজি উপরিতলের মাটির (top soil) দাম ধরা হয় ১০ পয়সা অথবা ১ সেন্টের পাঁচ ভাগের এক ভাগ (যদিও নির্মাণকাজে যে প্রাণহীন বালি ব্যবহৃত হয় তার দাম এর চেয়েও বেশি), তাহলে সে ক্ষয়ের দাম হবে বছরে ১৫০,০০০ কোটি টাকা, যার কাছে আমাদের জাতীয় বাজেট ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির ব্যালান্স সীট হবে হাস্যকর।

যেহেতু উপরিতলের মাটির ক্ষয় বলতে বোঝায় আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের চিরস্থায়ী ক্ষতি, সেহেতু আর একটু সংবেদনশীল মূল্যায়ন করে যদি এরকম এক কেজি মাটির দাম ধরা হয় প্রতি কেজিতে ১ টাকা (অথবা বড়ো জোর ২ সেন্ট), তাহলে আমরা প্রতি বছর ভূমি-পুঁজি হারাচ্ছি এক ভয়ংকর মাত্রায় —— ১৫ লক্ষ কোটি টাকা বা ৩৫০ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু আমাদের নীতি নির্ধারকদের এই ধিক্কারধ্বনি দ্বিতীয়বার শোনার মতো কোনো মানসিকতা আছে বলে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি?

মাটি সংরক্ষণ ও চাষ

গাছ–গাছালি দিয়ে ঢেকে রাখা, বিশেষত বৃক্ষ সহ বহু স্তরের গাছ–গাছালিই হল মাটির ক্ষয় নিবারণ অথবা সবচেয়ে কমিয়ে আনার সর্বোত্তম উপায়। কারণ গাছ–পাতার বিভিন্ন স্তর ও বর্জ্য পাতারা মাটিকে ভারী বর্ষণের আঘাত থেকে রক্ষা করে। আবার জমিতে গাছের মূলেরা মাটিকে বেঁধে রাখে। মাটির জীবরা যে আঠাল হিউমাস বা উদ্ভিজ্জসার তৈরি করে তাও এই মাটি আঁকড়ে ধরে থাকতে সাহায্য করে। হিউমাসে ভরা মাটি আরও ভালো জল শোষণ করে। ফলে বয়ে যাওয়া বৃষ্টির জল পার্শ্ববর্তী ঢালে ধেয়ে গিয়ে বেশি ভরবেগের সাথে বিপুল মাত্রায় উপরিতলের মাটিকে (top soil) খুবলে নিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ার বদলে বৃষ্টির জলের অনেকটা আনুভূমিকভাবে (vertically) মাটিতে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলিকে ভরিয়ে তোলে।

ডঃ মূর্তি ও ডঃ হিরেকেরুরের মতে মাটির আবহাওয়া ও ঢালের বিভিন্ন অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী বয়ে যাওয়া জল (run-off) ও মাটির ক্ষয়ের যে তথ্যাবলী পাওয়া গেছে তা থেকে এটা পরিষ্কার যে জমি যদি প্রাকৃতিক আবরণে ঢাকা থাকে এবং মাটি যদি কোনোভাবে আলোড়িত না হয় তাহলে বয়ে–যাওয়া জল ও ভূমিক্ষয় হয় সবচেয়ে কম। কিন্তু ঘাস–পাতার আবরণ সরে গেলে এবং জমিতে লাঙল দিলে (বিশেষত রাসায়নিক পদ্ধতিতে দু–একধরনের শস্য চাষে) মাটির ক্ষয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। আর তা যদি খুব ঢালু জমি হয় এবং যেখানে ভারী বৃষ্টিপাত হয়, তাহলে মাটির ক্ষয় এমনি শতগুণও (১০,০০০%) হতে পারে।

ভূমিতে গাছ–পাতা দিয়ে আবরণের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন ছাড়াও সহজ, ছোটো ছোটো মাটির কাজ (earth works) — যেমন সীমারেখায় বাঁধ (contour bunding) সীমারেখায় খাদ (contour trench), অগভীর অর্ধচন্দ্রাকৃতির জলাধার, জলে ক্ষয়প্রাপ্ত খাদ বোজানো (gully plugs) , ছোটো পাথর এবং মাটির চেক ড্যাম (check-dams) — ইত্যাদির (খনন ও নির্মাণের) দ্বারা উঁচু অঞ্চল থেকে স্থানচ্যুত উপরিতলের মাটির প্রবাহকে বন্ধ করতে পারে। এগুলি করলে যথেষ্ট পরিমাণ জলে–বয়ে–যাওয়া (run-off) আটকানো যাবে ফলে বেশি জল চুঁইয়ে মাটির অভ্যন্তরের জলাধারগুলিকে ভরিয়ে তুলবে।

বর্ষার শেষে ক্ষয়ে যাওয়া উপরিতলের মাটি যা মাটির কাজের (earth works) পাদদেশে এসে জমা হয় — তা তুলে যেখানে ফসল ফলে সেখানে ফেলা যেতে পারে। যেখানে কোনো চাষ–বাস হয় না সেখানে যে অঞ্চলে

পলি জমা পড়ে আটকে আছে (`silt traps`) সেখানে গাছ পোঁতা যেতে পারে। তেমনি স্থানচ্যুত উপরিতলের মাটি যা জলাধারগুলি বা চোঁয়ানো জলের পুকুরের (ঢেউ খেলানো জমির নিচু অঞ্চলে তৈরি করা) তলদেশে জমা হয়, তা কৃষিকাজের জন্য লাভজনকভাবে 'চাষ' করা যায়। এতে জলাধারগুলির পুরোনো জল–ধারণক্ষমতা ফিরে আসে।

অবহেলিত সমস্যা জমে জমে যেমন বিরাট আকার ধারণ করে, তেমনি সমস্যা সমাধানের কার্যকলাপগুলির থেকে শৃঙ্খল বিক্রিয়ার মতো নানাবিধ সুবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তুতান্ত্রিক বোধের ভয়াবহ অভাব এবং যার ফলে যে কপট ও ক্ষতিকারক পথে প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় ঘটে তা মোকাবিলার ইচ্ছার অভাবই হল এই সভ্যতার আত্মহত্যার প্রবণতার উৎস, আমরা যার মুখোমুখি হয়েছি এই একবিংশ শতাব্দীতে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম কৃষিমন্ত্রী কে এম মুন্সী যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা মেনে চলার প্রয়োজনী আজকের মতো আগে কখনও ঘটেনি। পাঁচ দশক আগে তিনি বারংবার গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন : মাটির পুষ্টিচক্র ও জলচক্রকে পুনরুদ্ধার করাই হল আমাদের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ যার মোকাবিলা করেই আমরা এদেশ ও তার জনসাধণের মঙ্গলের স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে পারি।

আমাদের মাটি ও ভূজল —– এদের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন করতে এবং আবহাওয়ার বদলকে আটকাতে সবচেয়ে সক্ষম হল আমাদের প্রাকৃতিক বনভূমি এবং জৈব পদ্ধতিতে মিশ্র বৃক্ষ–ফসল ফলানোর ব্যবস্থা, ভাস্কর সাভে ও তাঁর পরিবার যেমনটা করে থাকেন।

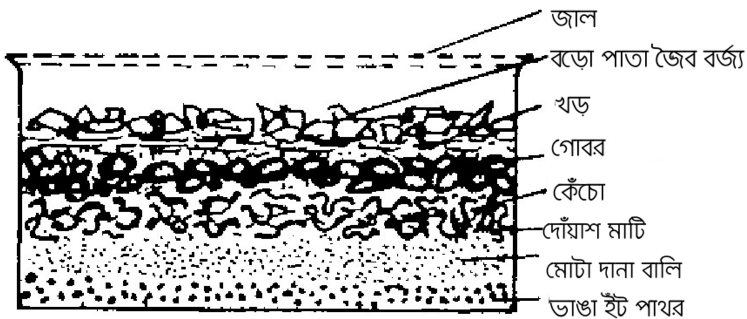


কল্পবৃক্ষ

শহরে গৃহের জৈবসার থেকে কেঁচো সার প্রস্তুত করা

যদিও বিকেন্দ্রীকৃত কৃষিজমিতে (in-situ) *কেঁচো–সার তৈরি করাই হল খামারের জন্য আদর্শ উপায়, কিন্তু কিছু অপ্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে যেমন শহরের ক্ষেত্রে — একটি নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে সুবিধাজনকভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কেঁচো–সার প্রস্তুত করা যেতে পারে। অধ্যাপক সুলতান ইসমাইল লিখেছেন যে এটা করা যেতে পারে কোনো খোলা আবর্জনার স্তূপে, মাটির গর্তে, সিমেন্টের ট্যাঙ্কে বা বস্তা দিয়ে ঘেরা কাঠের বাক্সে অথবা অন্য যে কোনো সুবিধাজনক ব্যবস্থায়, আরও ভালো হয় যদি তা হয় কোনো গাছের ছায়ায়, কিন্তু জল জমে যেতে পারে এমন এলাকার বাইরে। একাজে বিশেষভাবে যেগুলি দেখতে হবে সেগুলি হল জায়গাটিতে ১। অন্ধকারাচ্ছন্নতা, ২। স্যাঁতসেঁতে ভাব, ৩। বায়ুচলাচল, ৪। নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ, ৫। পর্যাপ্ত জৈব বস্তুর জোগান বজায় রাখতে হবে। ৬। এই জৈব বস্তুতে কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেঁচো এবং/তাদের গুটি থাকতে হবে।*

ইসমাইল বলেন যে স্থানীয় অঞ্চলে পাওয়া যায় এমন কেঁচোই বাছা উচিত, অতিরিক্ত আর্দ্রতা বের করে দেওয়ার জন্য ভালো নিকাশি–যুক্ত মাটিই সংগ্রহ করতে হবে। কেঁচো–সার তৈরির ক্ষেত্রটির নিচের স্তরে থাকে ১ বা ২ ইঞ্চি পুরু ভাঙা ইঁট/মাটির পাত্র বা নুড়ি (এবং/অথবা ধীরে ধীরে পচে এমন শুকনো ডালপালা বা আঁশ দ্রব্য)। সবার ওপরের জায়গাটা ভরে রাখবার জন্য থাকে মোটা দানার বালি। যদি কেঁচো–সার তৈরি করতে কোনো পাত্র ব্যবহার করা হয় (যেমন, কোনো ছাদে বা ব্যালকনিতে), তাহলে তার নিচের দিকে বেশ কিছু ছিদ্র রাখতে হবে যাতে করে অতিরিক্ত জলকণা বেড়িয়ে যেতে পারে।



সুলতান ইসমাইল–এর লেখা বই `The Earthworm Book' থেকে

সবচেয়ে নিচের নিকাশি স্তরে (drainage layer) *থাকতে হবে ৬–৮ ইঞ্চি*

পুরু দোঁয়াশ মাটি। (কেঁচো বা তাদের গুটি স্থানীয় অঞ্চলের কোনো বট, বুনো ডুমুর বা তেঁতুল গাছের গোড়া থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।) শুরুতে মাটির স্তরে কয়েক ডেলা গোবর দিতে হবে। এর ওপরে ৪–৬ ইঞ্চি খড়/পাতা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ওপরের খড়ের/পাতার শুকনো স্তর যথেষ্ট পরিমাণে কার্বন জাতীয় বস্তুর জোগান দেয় যা রান্নাঘরের ভিজে বর্জ্যগুলিতে যে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন থাকে তার সাথে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে সার সৃষ্টি করে।

১০–১৫ দিন অপেক্ষা করার পর যখন কেঁচোরা এই পরিবেশে একটু থিতু হতে পারে, তখন সেখানে প্রথমবার রান্নাঘরের বর্জ্য ঢালা হয়, যাকে কেঁচোরা সারে পরিণত করে। ওপরের স্তরে খড় তুলে তার নিচে এই বর্জ্য ঢালা হয়। এই বর্জ্য প্রতিদিন গড়ে ১ ইঞ্চি পুরু করে খড়ের তলায় যোগ করা যায়, অথবা ২ দিন অন্তর ২ ইঞ্চি পুরু করে তা দেওয়া যেতে পারে। পচনের সময় জৈব বস্তুর আয়তন কমতে থাকে। আয়তন কমে কমে এই জৈব বস্তু একফুট নিচে নামার জন্য এক মাসের বেশি সময় লেগে যায়।

যদি জৈব বস্তুর আয়তন হয় খুব বেশি, বিশেষত কার্বন–জাতীয় বস্তুতে ভরা, যেমন পাতা ও অন্যান্য আঁশ জাতীয় জিনিস যা কেঁচো–সারে পরিণত করতে হবে, তাহলে এগুলিকে আর্দ্র অবস্থায় খোলা গর্তে দু–সপ্তাহ রেখে তারপর ভার্মি–স্থলে (vermi-site) *ঢালতে হবে। এটা করা হয় এই কারণে যাতে জৈব বস্তুগুলির পচন হয়। অন্যথায়, ভার্মি–গর্তে এই রকমের বর্জ্য–বস্তু প্রতিদিন যেন গড়ে এক বা দুই ইঞ্চির (পুরু) বেশি দেওয়া না হয়।*

বাগানের কাঁটা (fork) *বেলচা দিয়ে মাঝে মাঝে এই জৈব বস্তু পাল্টে দিলে তাতে বায়ু চলাচল ভালো হয়, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পচনের সময় নিঃসৃত গ্যাস বেরিয়ে যায় যাতে করে আরও ভালোভাবে ও দ্রুতগতিতে পচন প্রক্রিয়া চলতে পারে। সাধারণত এই সার তৈরির প্রক্রিয়ায় কোনো দুর্গন্ধ থাকে না, কারণ এই প্রক্রিয়ায় কোনো অ্যামোনিয়া নির্গত হয় না।*

সাধারণভাবে সার তৈরির ক্ষেত্রে পচন প্রক্রিয়ার ফলে তাপমাত্রা ৬০ ডিগ্রিতে পৌছাতে পারে। কিন্তু একটু নজর রাখলেই কেঁচো–সার তৈরির প্রক্রিয়ায় ভার্মি–গর্তে/পাত্রে তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রির বেশি হয় না। জৈব বর্জ্যে মাংস ও হাড় থাকলে পচন প্রক্রিয়া ঘটে দ্রুততর। কিন্তু যেহেতু এগুলি দেওয়ার ফলে তাপমাত্রা বাড়তে পারে খুব বেশি, তাই সচরাচর এগুলি সার তৈরির জায়গায় যোগ করা হয় না।

কেঁচোরা তেঁতো, অম্লকারী ও টক জাতীয় জিনিস পছন্দ করে না। এগুলি পচনও হয় আরও ধীরে। যেই পচন শুরু হয় জৈব বস্তু বাদামি বা কালো রঙে বদলে যায়। এ প্রক্রিয়া সাধারণত সম্পন্ন হয় ২–৩ মাসে অথবা তার কিছুটা আগে। কেঁচো–সারকে ব্যবহার করার জন্য সরিয়ে নেওয়ার আগে ওপরের

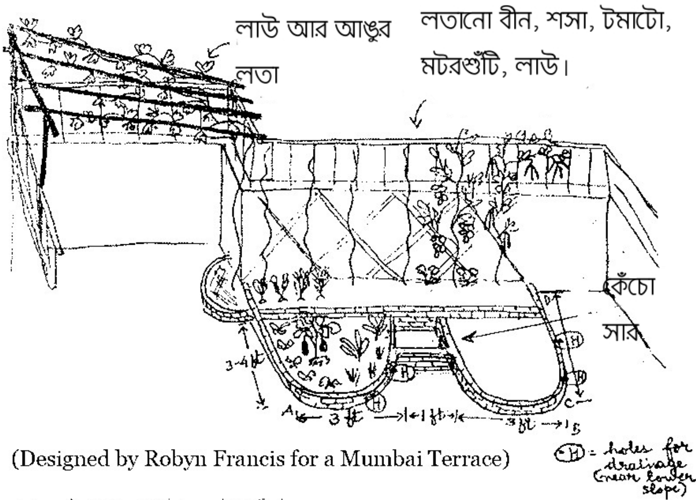
স্তরগুলি যাতে শুকিয়ে যায় তার জন্য এক বা দুই সপ্তাহ সময় দেওয়া উচিত যাতে কেঁচোরা আরও গভীর স্তরে নেমে যেতে পারে। সেখানে তারা অপেক্ষায় থাকে যাতে পরের ব্যাচের জৈব বস্তু জমা পড়লে উঠে এসে তাদের সারে পরিণত করার কাজ পুনরায় শুরু করতে পারে। কেঁচো-সারের প্রথম উৎপাদন সাধারণত কম মাত্রায় হয়। কিন্তু পরে এই উৎপাদন ৬ থেকে ৮ গুণ বাড়তে পারে।

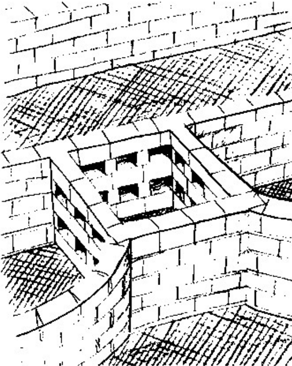
খাদক প্রাণীরা যেমন পাখি, ইঁদুর, ছুঁচো, গিরগিটি, কুনোব্যাঙ ইত্যাদি যারা কেঁচো খায় তাদের আক্রমণের প্রভাব এড়াতে গেলে ভার্মি-পিটকে তারের কোনো পাত্রে (তারের জালে) ভালোভাবে ঘিরে রাখতে হবে, যাতে করে বায়ু চলাচলের কোনো অভাব হবে না। তবে এতে খরচ একটু বাড়বে। অধ্যাপক সুলতান ইসমাইলের লেখা থেকে পরিমার্জিত (বিশেষত তাঁর লেখা এবং আদার ইন্ডিয়া প্রেস, ২০০৫ দ্বারা প্রকাশিত 'দ্য আর্থওয়ার্ম বুক' বইটি দেখুন।)



ল্যাম্পিটো মৌরিটি, সচরাচর দেখা যায় এমন কেঁচোদের একটি বিশিষ্ট প্রজাতি — বৈচিত্রময় মাটি ও পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে।

ছোটো সংহত বাগান পরিকল্পনা এবং কেঁচো সার ইউনিট





Detail of the vermi-compost unit in the middle with hollow brickwork allowing free passage of the worms and nutrients, shown here without soil or compost.

(ওপরে) মুম্বই-এর একটি ছাদ বাগানের জন্য রবীন ফ্রান্সিস দ্বারা তৈরি ডিজাইন। (নিচে) কেঁচো সার ইউনিটের পুঙ্খনাপুঙ্খ নকশা। মাঝে আছে ইঁটের কাজ যাতে কেঁচো ও পুষ্টি চলাচলের পথ থাকে। এখানে মাটি ও কম্পোস্ট ছাড়া দেখানো হয়েছে।

টীকা এবং উল্লেখিত গ্রন্থাদি

১। `Origins`, an etymological dictionary of Modern English, Eric Partridge, Greenwich House, 1983, pg.208

২। মোহন দেশপান্ডে, একজন পোড়খাওয়া জৈবচাষি, বিষয়টিকে নির্দেশ করে বলেন যে "রাসায়নিক চাষের ফলন নির্ভর করে এই পদ্ধতি মাটিতে বর্তমান জীবদের শবদেহের কতটা ভর সৃষ্টি করতে পারে তার ওপর। রাসায়নিকরা মাটির জীবও অণুজীবদের হত্যা করে এবং তারা নিজ নিজ আদি উপাদানে ভেঙে গিয়ে মাটিতে মেশে। এভাবে মাটির জৈব জীবনকে ধ্বংস করার ফলে গাছেরা জমি (in-situ) থেকেই খনিজের যোগান পায় —যার মাত্রাটা রাসায়নিক প্রয়োগে পাওয়া খনিজের মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। এর ফলে গাছেরা শুরুতে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রতি বছরেই এইরকম অসংখ্য মাটির জীব ও অণূজীবদের মৃত্যুর পরে একটা সময় আসে যখন মাটিতে জীবও ও অণূজীবরা নিশ্চিহ্ন হয় এবং রাসায়নিকরা তাদের কার্যকারীতা হারায় এবং অনুৎপাদকনশীল হয়ে পড়ে। সার্বজনীনভাবে বিশেষত ক্রান্তীয় অঞ্চলে এই রিপোর্টই পাওয়া যায়।''

৩। বি.বি.ভোরা তার লেখা "Land and Wastes''-এ INTACH, 1985, pg.15 ডঃ সুধীর সেনের ``Resource Literacy`` র কথা উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক শ্রীপাদ দাভোলকার আবার ``bio-resource illiteracy`` শব্দ–বন্ধটি বেশি পছন্দ করেন। (Ref `Nuturing Nature`, Earthcare Books, 19998, pg61) । প্রকৃতির বদান্যতাকে কিভাবে সংকীর্ণ অর্থনৈতিক স্বার্থে পরিচালিত করা যায় এই আধুনিক ঝোঁক এখন অত্যেন্ত শক্তিশালী। কিন্তু বৃহৎ অর্থে `re-source` মানে হল re-visit` অর্থাৎ উৎসে ফিরে যাওয়া। আর জীবনের বীজতো নিহিত থাকে জীবনেই।

৪। Bill Mollison, a permaculture design conducted by him and Robyn Francis in Hyderabad, 1987

৫। `An Agricultural Testament` by Sir Albert Howard, Indian edition, Earthcare Books, 2007, pg.14.

৬। `Tending the Earth` by Winin Pereira, 1993, Earthcare Books, 2007,pg.198. Reprinted in 2007.

৭। Dr. Richard S. Cooper, MD, Pedro Ordunez, MD and others, `Cardiovascular Disease and Associated Risk Factors in Cuba`, American Journal of Public Health, January 2006, vol.96, No.1, pp.94-101.

৮। City Farming by Dr R.T.Doshi.

৯। Cyclostyled monograph on `City Farming` by Prof Sripad Dabholkar, দাভোলকর হলেন প্রয়োগ পরিবার আন্দোলনের পরীক্ষ–

কদের নেটওয়ার্ক সূচনাকারীও প্রেরণাদাতা। এই আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে ঢেউ তুলেছিল, বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে। নাসিক জেলার 'আঙুর বিপ্লব' তার কাছে বহুলাংশে ঋণী। দাভোলকার আবার `planty for All` গ্রন্থের প্রণেতা। এই বইয়ে তার কৃষি সংক্রান্ত `Natu-eco` দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে (দেখুব পৃষ্ঠা ২৮৬)

১০। www.cityfarmer.info/about/; htttp://urbanhomeste-ad.org/; http://cityfarmer.org/; www.urbanleavesinindia-.com/urban leaves blog/site

১১। Ref. Dr S.N. Ghosh, `Organic Farming` pg.5, Samvard-han, 1984.

১২। কয়েক বছর আগে মুম্বায়ের সংবাদপত্রগুলিতে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল এই মর্মে যে মুম্বাই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন শহরের ৩ কিমি দূরে সমুদ্রের ধারে একটি জায়গায় বর্জ্য ফেলবার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের কাছে একটি ৫০০ কোটি টাকার প্রকল্পের প্রস্তাব দিয়েছে।

১৩। প্যারেলাল এফ.এইচ.কিংকে উদ্ধৃত করেছেন তার লেখা `Towards New Horizons`, pg.51-52, Navajivan Pub. House, 1959. সাম্প্রতিককালে মুম্বাইকে যে আর একটি সাংহাইয়ে পরিণত করার কথাবার্তা চলছে সেই প্রেক্ষিতে শহরের বর্জ্য হল একটা দিক যা (মুম্বায়ে এক শহুরে কৃষি আন্দোলন বিকশিত করার সাথে সাথে) সাংহাইয়ের জৈববর্জ্য নির্বাহের (management) ইতিহাস থেকে শিখে মুম্বাইয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে (বিকেন্দ্রীকৃত) পদ্ধতিতে অনুসরণ করা যেতে পারে।

১৪। সাম্প্রতিক বছর গুলিতে পাঞ্জাবে ক্ষেতি বীরাসত মিশনের প্রেরণায় ও সমর্থনে একটি জন আন্দোলন বিকশিত হচ্ছে, উদ্দেশ্য জৈব ও সুস্থায়ী (Sustainable) কৃষিতে ফেরা। তারা জৈব বস্তু পুড়িয়ে ফেলার বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন করছেন এবং তার বদলে বর্জ্য দিয়ে সার বানানো ও মাটিতে আচ্ছাদন সৃষ্টির পরামর্শ দিচ্ছেন।

১৫। Quoted in Indian Agriculture at the Turn of the Cen-tury`, Readings from the PPST Bulletin, Madras.

১৬। `Export of De-oiled Meals`, reported in The Economic Times, May 14, 1993.

১৭। Dr SN Ghosh, ` Organic Farming`, pg.30, published by Samvardhan, 1984. see also `Regenerating the Soil --From agronomy to Agrology` by Claude Bourguignon, translated from the French by Bernard Declercq, Other India Press, 2005.

১৮। `The Natural Way of Farming` by Masanobu Fukuoka,

pg.229-31, Japan Publications, 1985.
১৯। Mohan Deshpande at a gathering on natural farming in Bidada, Kutchh, 1994.
২০। Subhas Sharma, during the Gujrat Organic Farming Yatra, May 2005, at its meeting in Saurashtra.
২১। Preeti Patil at a City farming workshop at the Maharashtra Nature Park in Mahim, Mumbai in 2009.
২২। অমৃত পানী তৈরির এই প্রাচীন ফরমূলাটি দিয়েছিলেন মোহন দেশপান্ডে, বিদাদা, কচ্চ, ১৯৯৪–এ প্রাকৃতিক কৃষির ওপর একটি জমায়েতে।
২৩। `Indian Agriculture at the Turn of the Century`, Readings from the PPST Bulletin, pg.75.
২৪। পূর্বে উল্লেখিত
২৫। পূর্বে উল্লেখিত
২৬। B.B. Vohra, `Land and Water`, 1985 pg.4 Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH). এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে এই লেখকেরই লেখা Land and Water MAnagement Problems in India`, 2nd edition, Dept of Personnel and Administrative Reforms, Govt. of India, 1982.
২৭। In the book, `Soil and Water Conservation Research in India` (ICAR, 1993), the author, V V Dhruva Narayana (then Director, of the `Central Soil and Water Research and Training Institute`) তার মুখবন্ধে বলেছেন যে ভারতে আনুমানিক ১৭৫ মিলিয়ন হেক্টর জমি নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের প্রায় সবটাই ভয়ংকর ভূমিক্ষয়ের শিকার হয়েছে, এই অবস্থাটা গত ১৭ বছরে প্রায় নিশ্চিতভাবে আরো খারাপ হয়েছে।
২৮। `The Gaia Atlas of Planet Managemant`, ed. Norman Myers, Pan, 1984, pg.40.
২৯। `Handbook of Agriculture`, pg.121, Indian Council of Agricultural Research, 1987.
৩০। Op cit, pp.126, 128.
৩১। Op cit., pg.123.
৩২। B.B. Vohra, op cit., pp.5-6.